Sahihaqeedah.com

Sunni-encyclopedia.blogspot.com

PDF by (Masum Billah Sunny)

(FBO)

ইসলাম আল্লাহু আকবর এহ্ছান

ঈমান

আলহাজ্ব খাজা মিয়া ভাইজান মোজাদ্দেদী ও আলহাজ্ব খাজা মেঝু ভাইজান মোজাদ্দেদী সাহেবেদ্বয়ের অনুমতিক্রমেঃ-

ফতুয়ায়ে বিশ্ব ওলী (রাঃ)

সম্পাদনায়

মুফ্তী মাওলানা আলাউদ্দিন জেহাদী

মৌলভীবাজার

তানজিলা প্রকাশনী

বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রকাশক :
তানজিলা ইসলাম

স্বত্ব :
লেখক কর্তৃক সর্ব স্বত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশকাল :
ফেব্রুয়ারি ২০১২

বর্ণবিন্যাস :
আহম্মদ হোসাইন

প্রচ্ছদ :
নজরুল ইসলাম

মুদ্রণে :
লাকী এন্টারপ্রাইজ

মূল্য : ১২০টাকা মাত্র

আল্লাহু আকবার

ইসলাম ঈমান এহ্ছান

পরম করুণাময় আল্লাহর নামে শুরু করছি এবং তাঁরই দরবারে শুকরিয়া প্রশংসা জ্ঞাপন করছি। দুরুদ ও ছালাম প্রেরণ করছি বিশ্ব নবী হুজুর পুর নুর (দঃ) এর উপর।
কদমবুছি আরজ করছি জামানার মহা ঈমাম, দয়াল-দরধী মুরশীদ, বিশ্বওলী খাজাবাবা ফরিদপূরী (কু: ছে: আ:) ছাহেবের পূত-পবিত্র কদম মোবারকে। আরোও কদমবুছি আরজ করছি মুসলীম বিশ্বের মহান দুই নেতা, কেবলাজান হুজুরের জেসমানী ও রুহানী আওলাতদ্বয়, আমাদের পরম শ্রদ্ধেয়, পীরজাদা আলহাজ্ব খাজা মিয়া ভাইজান মোজাদ্দেদী ছাহেব ও পীরজাদা আলহাজ্ব খাজা মেঝু ভাইজান মোজাদ্দেদী ছাহেবদ্বয়ের পবিত্র কদম মোবারকে। কদমবুছি জানাই জাকের পার্টির প্রথম কো-চেয়ারম্যান, শ্রদ্ধেয় খাজা মিয়া চাচাজান মোজাদ্দেদী এবং জাকের পার্টির দ্বিতীয় কো-চেয়ারম্যান শ্রদ্ধেয় খাজা মেঝু চাচাজান মোজাদ্দেদী ছাহেবদ্বয়ের পবিত্র কদম মোবারকে।
বিনয়ের সাথে জানাচ্ছি যে, দীর্ঘদিন যাবৎ জাকের ভাই-বোনদের মধ্যে এরকম একটি কিতাবের চাহিদা লক্ষ করছি। কারন কিছু অজ্ঞ লোক আছে যারা জাকেরান ভাই-বোনদেরকে বিভিন্ন প্রশ্ন করেন ও দলিল চান, এমনকি বিশ্বওলী খাজাবাবা ফরিদপুরী (রাঃ) কেবলাজানের পবিত্র নছিহত শরীফের হাদিস সমূহ নিয়ে বলে থাকে যে "জাল হাদিস, হাদিস নয় ও কোন কিতাবে এই হাদিস নেই ইত্যাদি।" তাই আমি এই কিতাবখানা প্রায় ১২ লক্ষাধিক টাকার কিতাবের রেফারেন্স তথা দলিলের দ্বারা লিখে বিশ্বওলী খাজাবাবা ফরিদপুরী (রাঃ) এর আওলাতদ্বয় আলহাজ্ব খাজা মিয়া ভাইজান মোজাদ্দেদী ও আলহাজ্ব খাজা মেঝু ভাইজান মোজাদ্দেদী ছাহেবের সমীপে পেশ করি। আলহাজ্ব মিয়া ভাইজান মোজাদ্দেদী কিতাবখানা দীর্ঘদিন পরিক্ষা-নিরিক্ষা করেন এবং মেঝু ভাইজান মোজাদ্দেদী ছাহেবের কদমে পেশ করেন। খাজা মেঝু ভাইজান মোজাদ্দেদী ছাহেব কিতাবখানা দেখে খুবই খুশি হয়ে প্রকাশ তথা কিতাব আকারে বের করার নির্দেশ দেন। তাই এই মিসকীন ভাইজানদ্বয়ের হুকুম মাথায় নিয়ে কিতাবখানা বের করেছি। তাজিমান ও সম্মানার্থে কিতাবটির নাম রেখেছি "ফতুয়ায়ে বিশ্বওলী (রা:)"। এরুপ অনেক কিতাব রয়েছে যে, লেখক সম্মানার্থে পীরের নামে কিতাবের নাম রেখেছেন, যেমন: "এনদাদুল ফতুয়া" এ কিতাবটি লিখেছেন মাওলানা আশরাফ আলী থানভী সাহেব কিন্তু নাম দিয়েছেন আপন পীরের নামে। "তাফছিরে মাজহারী" কিতাবের লেখক আল্লামা ছানাউল্লাহ পানিপতি (রঃ) কিন্তু নামকরণ করেছেন আপন পীরের নামে। "ফতুয়ায়ে আলমগীরি" এই কিতাবের লেখক ৭০০ জন আলিম কিন্তু নামকরণ করেছেন দেশের বাদশার নামে।
ছাপার ক্ষেত্রে কিতাবটুকু যতখানি সম্ভব নির্ভুল করার চেষ্টা করেছি। তথাপিও ভুল থাকতে পারে ইহাই স্বাভাবিক। মহৎ পাঠকগণ অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি ক্ষমা-দৃষ্টিতে দেখবেন- ইহা কামনা করি। ভুল-ত্রুটি যা রয়েছে তা মুদ্রণজনিত ও অনিচ্ছাকৃত। দৃষ্টি আকর্ষণ করলে আগামী সংস্করণে ত্রুটি সংশোধন করা হবে। সকলের মঙ্গল ও শুভ কামনায় -ইতি।

মোঃ আলাউদ্দিন জেহাদী
মৌলভীবাজার

সূচিপত্র

কুরআন সুন্নাহর দৃষ্টিতে রাসূলে পাক (স)-এর ইলমে গায়েব	৫-২৭
কুরআন সুন্নাহর দৃষ্টিতে পীর মুরিদে	২৮-৪৩
কুরআন সুন্নাহর দৃষ্টিতে রাসূলে পাক (স) নূরের তৈরি	৪৪-৬৬
কুরআন সুন্নাহর দৃষ্টিতে নবী ওলীগণের শাফায়াত	৬৬-৬৯
কুরআন সুন্নাহর দৃষ্টিতে আল্লাহর ওলীগণের অন্তর্দৃষ্টি	৬৯-৭৫
কুরআন সুন্নাহর দৃষ্টিতে নবী-রাসূলগণ ও ওলীগণের অছিলা	৭৫-৮৫
কুরআন সুন্নাহর দৃষ্টিতে পবিত্র শবেবরাত	৮৫-৯৬
ইসলামি শরীয়তের দৃষ্টিতে কদমবুছি	৯৬-৯৯
ইসলামি শরীয়তের দৃষ্টিতে গরু-ছাগল ও উট নজরানা ও হাদিয়া	১০০-১০৪
কুরআন সুন্নাহর দৃষ্টিতে বাবা কম্ব শ্রেণী	১০৪-১০৭
ইসলামি শরীয়তের দৃষ্টিতে নেক বান্দাগণের কবরকে রওজাবলা	১০৭-১১৩
তারাবি নামাজের জামাত	১১৪-১১৯
কুরআন সুন্নাহর দৃষ্টিতে মাজার জিয়ারত	১১৯-১৩৩
কুরআন সুন্নাহর দৃষ্টিতে নবী ও ওলীগণ জিন্দা	১৩৩-১৪০
কুরআন সুন্নাহর দৃষ্টিতে ছামা ও দমের যিকির	১৪০-১৫৬
পবিত্র নছীহত শরীফের হাদিসসমূহের কিতাবিহাওলা	১৫৬-১৮৮
তথ্যসূত্র	১৮৯-১৯২

* কুরআন-সুন্নাহ এর দৃষ্টিতে ঃ

*রাসূলে পাক (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) এর ইলমে গায়েবঃ

*সৃষ্টি জগতের শ্রেষ্ঠ নবী. করুণার আধার, রহমাতুল্লিল আলামিন, হুজুরে পাক (ছাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) কে মহা মালিক আল্লাহপাক ইলমে গায়েব দান করেছেন। আমাদের আকিদা হল আল্লাহপাক মহাজ্ঞানী তাঁর জ্ঞানের কোন তুলনা বা মেছাল নেই, অসীম ক্ষমতার মালিক। ان الغيب قسمان অর্থাৎ গায়েব ২ প্রকার যথা (১) গায়বে জাতি, (২) গায়বে আতায়ী। যেমনঃ তাফছির বায়ছাবী ও জালালাইনে এই আয়াতের তাফছিরে উল্লেখ আছেঃ قول جمهور المفسرين ان الغيب هو الذى يكون غائبا عن الحسة অর্থাৎ, অধিকাংশ মোফাচ্ছিরীন গণের অভিমত হলঃ গায়েব দ্বারা অদৃশ্য বিষয়কে বুঝানো হয়েছে যা ইন্দ্রিয় সমূহ দ্বারা উপলব্ধি করা যায়না (বায়দ্বাবী, ১ম খন্ড:; জালালাইন; কবীর শরিফ, ১ম খন্ড)।

তাফছিরে রুহুল বয়ানে উল্লেখ আছেঃ وهو ما غاب عن الحس والعقل *গায়েব হল এমন জিনিস যা ইন্দ্রি সমূহ ও আকল দ্বারা উপলব্ধি যারা যায়না (রুহুল বয়ান-১ম খন্ড)।

* প্রকারভেদ ঃ

*গায়েবের প্রকারের ব্যাপারে উল্লেখ আছেঃ وهو قسمان قسم لا دليل عليه ...وقسم نصب عليه دليل *অর্থাৎ, গায়েব ২ প্রকার, এক প্রকার হল যার কেন দলিল বা প্রমান নেই। আরেক প্রকার হল যার দলিল আছে (তাফছিরে রুহুল বয়ান, ১ম খন্ড)।

*অন্য জায়গায় উল্লেখ আছেঃ هذا ينقسم الى ما عليه دليل الى ما لا دليل عليه অর্থাৎ, গায়েব ২ প্রকার, এক প্রকার হল যার দলিল প্রমান আছে, আরোকটির নেই (তাফছিরে কবীর শরিফ, ১ম খন্ড)।

*এক প্রকার গায়েব আল্লাহ ছারা কেও জানেনা, ঐ ধরনের গায়েবের নাম গায়েবে জাতি। *অপর প্রকার গায়েব আল্লাহ যাদের জানিয়ে দেন তারা জানেন ইহার নাম গায়েবে আতায়ী।

*যেই গায়েব আল্লাহ ছাড়া কেউ জানেনা এই ব্যাপারে, পবিত্র কোরআনে উল্লেখ আছে। ولو كنت اعلم الغيب অথবা لا اعلم الغيب অথবা و عنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ইত্যাদি এসব আয়াত। আর যে সব গায়েব নবী (ছাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) কে জানানো হয়েছে এই ব্যাপারে পবিত্র কোরআনে উল্লেখ আছে, فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول *অর্থাৎ, আল্লাহ কারোও কাছে গায়েব প্রকাশ করেন না, তবে তার রাসূল গণের কাছে ব্যতিত (সুরা জ্বিন, ২৬ নং আয়াত)।

*এই আয়াত দ্বারা সরাসরি প্রমান, আল্লাহ তাঁর রাসূল গনের কাছে (কারন رسل শব্দটি নাকেরা তাই এর আওতায় সকল নবীগণ এসে যায়)

গায়েব প্রকাশ করেন। সুতরাং, রাসূলে পাক (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) হলেন সকল নবী গনের সর্দার, তিনি গায়েব জানবেন নাত কে জানবেন?

*এই আয়াতের ব্যাপারে আল্লামা শাহ আঃ আজিজ মোহাদ্দেস দেহলভী (রঃ) [যিনি মুজতাহিদ্ ছিলেন] বলেনঃ আল্লাহ খাছ গায়েব কারোও কাছে প্রকাশ করেন না, তবে তার প্রিয় রাসূল গনের কাছে প্রকাশ করেন, যেমনঃ মুহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) এর কাছে গায়েব প্রকাশ করেছেন (তাফছিরে আজিজি, ১ম খন্ড)।

*অপর জায়গায় উল্লেখ আছে ঃ الا من يصطفيه لرسالته و نبوته فيظهر على من يشاءمن الغيب অর্থাৎ, যাদের কে আল্লাহ নবুয়ত ও রিসালত দান করেছেন তাদের কাছে গায়েব প্রকাশ করেন (তাফছিরে খাজেন, ৪র্থ খন্ড, ৩৫৩ পৃ:)।

*অপর তাফছিরে উল্লেখ আছেঃ قال ابن الشيخ انه تعالى لا يطلع على الغيب الذى يختص به تعالى علمه الا لمرتضى الذى يكون رسوله ومالا يختص به يطلع عليه غير الرسول *অর্থাৎ, ইবনে শায়েখ বলেন: আল্লাহ তার মনোনীত রাসূল ব্যতিত কারোও কাছে খাচ গায়েব প্রকাশ করেন না (তাফছিরে রুহুল বয়ান, ১০ম খন্ড, ২৩৩ পৃ:)।

*এই ব্যাপারে অপর আয়াতে মহান আল্লাহ বর্ণনা করেনঃ- ما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبى من رسله من يشاء *অর্থাৎ, ইহা আল্লাহর শান নয় যে, তোমাদের ইলমে গায়েব দান করবেন, তবে হ্যাঁ! রাসূল গনের মধ্যে যাকে খুশি তাকে তিনি ইলমে গায়েব দান করেন।

*এই আয়াতের তাফছিরে আল্লামা কাজী নাছিরুদ্দিন বায়দ্বাবী (রঃ) বর্ণনা করেন ঃ- ولكن الله يجتبى من رسلته من يشاء فيوحى الله و يخبره ببعض المغيبات او ينصب له ما يدل عليه *অর্থাৎ, কিন্তু তিনি তার রাসূল গণের মধ্যে যাদেরকে ইচ্ছা করেন তাদেরকে আংশিক গায়েব দান করেন (তাফছিরে বায়দ্বাবী শরিফ, ১ম খন্ড)।

*উক্ত আয়াতে তাফছিরে অন্যত্র উল্লেখ আছেঃ يعنى الا من يصطفيه لرسالته ونبوته فيظهره على ما يشاء من الغيب *অর্থাৎ, কিন্তু আল্লাহ তা'লা রাসুল গণের মধ্যে যাদের খুশি মনোনীত করেন এবং আংশিক গায়েব দান করেন (তাফছিরে খাজেন, ৪র্থ খন্ড, ৩৫৩ পৃ:)।

*এ ব্যাপারে আরোও তাফছির উল্লেখ আছে যা ঈমাম ফখরুদ্দিন রাজী (রাঃ) বর্ননা করেনঃ فاما معرفة ذلك على سبيل الاعلام من الغيب فهو من خواص الانبياء *অর্থাৎ, খোদা প্রদত্ত ওহী ও ইলহাম দ্বারা গায়েব জেনে নেওয়া নবী গনের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য (তাফছিরে কবির, ১ম খন্ড; জুমুল)।

*আল্লামা ঈমাম জালালুদ্দিন ছিয়ুতী (রাঃ) [যিনি মুজতাহিদ্ ছিলেন] বলেনঃ المعنى لكن الله يختبى ان يصطفى من رسلة من يشاء فيطلعه على الغيب *অর্থাৎ, আল্লাহ তা'লা রাসূল গনের যাকে ইচ্ছা করেন মনোনীত করেন অতঃপর তাকে ইলমে গায়েব দান করেন (তাফছিরে জালালাইন)।

*আল্লামা ঈমাম ইসমাইল হাক্কী (রঃ) বলেনঃ وما لا يختص به يطلع عليه غير الرسول اما بتوسط الانبياء .... *অথঃ কেননা রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) এর মাধ্যম ব্যতিত কারোও নিকট গায়েব ও গোপন রহস্যাদী প্রকাশ পায়না (তাফছিরে রুহুল বয়ান, ১০ম খন্ড, ২৩৩ পৃ:)।

*সুতরাং, বুঝাগেল আল্লাহ যাকে খুশি তাকে, বিশেষ করে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) কে ইলমে গায়েব দান করেছেন। যারা বলে থাকেন নবী করিম (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) গায়েব জানেনা, তাদের এই মত ভ্রান্ত বলে প্রমানিত হল। কারন আল্লাহ বলেছেন: নবীজিকে আমি গায়েব দান করি আর ওহাবীরা বলে নবী গায়েব জানেনা।

#পবিত্র কোরআনে অপর জায়গায় আল্লাহ তা'লা ইরশাদ করেনঃ وعلمك ما لم تكن تعلم *অর্থাৎ, আপনার যা কিছু অজানা ছিল তা শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। এই আয়াতে একটি শব্দ রয়েছে (ما) (যা) উসূলের ভাষায় বলা হয় (عام) বা ব্যাপক বা সীমাহীন। *অর্থাৎ, যা হিসাব ও গণনার বাহিরে। সুতরাং, আল্লাহ পাক নবী করিম (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) কে যত কিছু অজানা ছিল (তার পরিমান কতটুকু তা আল্লাহ ছাড়া কেও বলেতে পারেনা) সব কিছু শিক্ষা দিয়েছেন বা জানিয়ে দিয়েছেন।

*ঈমাম ফখরুদ্দিন রাজী (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ انزل الله عليك الكتاب والحكمة واطلعك على اسرارهما ووافقك على حقاءقهما *অর্থাৎ, আল্লাহ আপনার উপর পবিত্র কোরআন ও হিকমত নাজিল করেছেন, উহাদের গুপ্ত ভেদ সমূহ উৎভাসিত করেছেন এবং উহাদের হেকমত সমূহ আপনাকে অবহিত করেছেন (তাফছিরে কবির)।

*এই ব্যাপারে তাফছিরে আরোও উল্লেখ আছেঃ علمك من علم الغيب ما لم تكن تعلم وقيل معناه علمك من خفيات الامور واطلعك على ضمائر القلوب وعلمك من احوال المنافقين وكيدهم *অর্থাৎ, আপনাকে ইলমে গায়েবের অন্তর্ভূক্ত সব কিছু শিক্ষা দিয়েছেন যা আপনার অজানা ছিল। কেউ কেউ বলেন: আপনাকে গোপন রহস্য অন্তরে লুকাইত বিষয় ও মোনাফেকদের ধোকাবাজী ও ভাওতাবাজী সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে (তাফছিরে খাজেন, ১ম খন্ড, ৪২৬ পৃ:)।

*অন্য জায়গায় আরোও বর্নিত আছেঃ من امور الدين والسرائع او من خفيات الامور وضمائر القلوب *অর্থাৎ, দ্বীন-শরিয়তের বিষয় সমূহ,

গোপনীয় বিষয়াদী ও মানুষের অন্তরে গোপনীয় ভেদ আপনাকে শিখিয়ে দিয়েছেন (তাফছিরে মাদারেক)।

*তাফছিরে হুসাইনিয়াতে বলা হয়েছে ঃ এই ইলিম হল ঐ ইলিম যা অতীতে হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও যা যা হবে সব নবী (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) কে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।

#পবিত্র কোরআনে আরোও বর্ণনা আছে ঃ ما فرطنا فى الكتاب من شئ *অর্থাৎ, এই কিতাবে কোন কিছুই বাদ পরেনি।

*এই আয়াতের ব্যাখায় উল্লেখ আছেঃ ان القران مشتمد على جميع الاحوال *অর্থাৎ, পবিত্র কোরআন মজিদে সমস্ত অবস্থার বিবরণ রয়েছে (তাফছিরে খাজেন)।

*অন্যত্র বলা আছেঃ اى ما فوطنا فى الكتاب ذكر احد من الخلق لكن لا يبصر ذكره فى الكتاب الا المؤيدون بانوار المعرفة *অর্থাৎ, এই কিতাবে সৃষ্টি কুলের কোন কিছুর-ই বাদ রাখা হয়নি, কিন্তু মারেফতের আলোকে মদদ সৃষ্ট ব্যক্তি ছারা ইহা কারো দৃষ্টি গোচর হয়না (তাফছিরে আরাইছুল বয়ান)।

*আর রহমান সুরাতে আল্লাহ বলেন ঃ الرحمن علم القران خلق الانسان علمه البيان *অর্থাৎ, তিনি দয়াময় যিনি আপনাকে কোরআন শিক্ষা দিয়েছেন।

*সুতরাং, বুঝাগেল কোরআনের সকল গোপন ও মারেফাতের বিষয় আল্লাহ নবী করিম (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) কে শিক্ষা দিয়েছেন যেহেতু কোরআনে এসব জ্ঞান বিদ্যমান রয়েছে।

*পবিত্র কোরআনে কি কি এলেম আছে তার ব্যাপারে আল্লাহ বলেনঃ وما من غيبة ما فى السموات والارض الا فى كتاب مبين *অর্থাৎ, আসমান জমিনে যত ইলমে গায়েব আছে সব এই কিতাবে রয়েছে (علم القران) আর সেই কোরআন আল্লাহ তাঁর হাবিবকে শিক্ষা দিয়েছেন। অর্থাৎ, আসমান জমিনের সমস্থ গায়েব সম্বলীত কোরআন আল্লাহ তাঁর হাবিবকে শিক্ষা দিয়েছেন।

মহান আল্লাহ আরোও বলেনঃ الرحمن علم القران خلق الانسان علمه البيان *অর্থাৎ, তিনি 'ইনসান' সৃষ্টি করেছেন এবং বয়ান শিক্ষা দিয়েছেন (সূরা আর রহমান, ৩-৪ নং আয়াত)।

*এই আয়াতের তাফছিরে উল্লেখ আছেঃ اراد بالانسان محمدا صلى الله عليه وسلم البيان يعنى بيان ما كان وما يكن *অর্থাৎ, আল্লাহ 'ইনছান' তথা তাঁর বন্ধু মুহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) কে সৃষ্টি করেছেন এবং অতীতে যা হয়েছে ও ভবিষ্যতে যা হবে সব শিক্ষা দিয়েছেন (তাফছিরে খাজেন, ৪র্থ খন্ড, ২২৫ পৃ:; তাফছিরে হুছাইনি, তাফছিরে মায়ালেমুত্তানঝিল, ৫ম খন্ড, ১৬৮ পৃ:)।

*অতীতে যা হয়েছে তাও গায়েব এবং ভবিষ্যতে যা হবে তাও গায়েব আর ঐ সকল গায়েব আল্লাহ তাঁর বন্ধুকে শিক্ষা দিয়েছেন।

*এই ব্যাপারে আরোও উল্লেখ আছেঃ البيان (ص) اراد بالانسان محمدا يعنى بيان ما كان وما يكن *অর্থাৎ, 'ইনসান' দ্বারা মুরাদ হল মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) আর তাকে অতীত বর্তমান সব শিক্ষা দিয়েছেন (তাফছিরে খাজেন, ৪র্থ খন্ড, ২২৫ পৃ:)।

*এজন্যই হাদিস শরিফে উল্লেখ আছেঃ يخبركم بما مضى وما بعضكم *অর্থাৎ, বাঘটি বলতেছে মদিনায় এমন একজন লোক এসেছে যে অতীত-বর্তমান খবর দিচ্ছে (শরহে সুন্নাহ, মেসকাত, ৫৪১ পৃ:; মুসনাদে আহমদ; আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া, ১ম খন্ড, ৩১৯ পৃ:; মেরকাত) বর্ণনাটি সহি।

মহান আল্লাহ আরোও বলেনঃ وما هو على الغيب بضنين *অর্থাৎ, তিনি (নবীজি) গায়েব প্রকাশ করতে কৃপনতা করেন না (সূরা তাকবীর, ২৩ নং আয়াত)। যদি গায়েব নাই জানতেন তাহলে প্রকাশ করেন কিভাবে?

*এই ব্যাপারে তাফছিরে উল্লেখ আছেঃ انه عليه السلام ياتى علم الغيب فلا يبخل به عليكم بل يخبركم به *অর্থাৎ, নবী করিম (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) নিকট ইলমে গায়েব এসেছে তা প্রকাশ করতে তিনি কৃপনতা করেন না বরং তিনি তার সংবাদ দিয়েদেন (তাফছিরে খাজেন শরিফ, ৪র্থ খন্ড, ৩৯৯ পৃ:)।

#দলিলঃ انه عليه السلام ياتى علم الغيب فلا يبخل به عليكم بل يعلمكم به *অর্থঃ নিশ্চয় তাঁর কাছে এলমে গায়েব আসে, তিনি এই গায়েব তোমাদের কাছে প্রকাশ করতে কৃপনতা করেন না, বরং তিনি তা শিখিয়েদেন (তাফছিরে মায়ালেমু তানজিল, ৫ম খন্ড, ৩২৯ পৃ:)।

#হযরত খিজির (আঃ) এর ব্যাপারে উল্লেখ আছেঃ وعلمنه ملدنا علما *অর্থাৎ আমি তাকে (খিজিরকে) ইলমে লাদুন্নি শিক্ষা দিয়েছি (সূরা কাহাফ, ৬৫ নং আয়াত)।

*এই আয়াতের তাফছিরে উল্লেখ আছেঃ اى مما يختص نباعه لا يعلم الا بتوفيقنا وهو علم الغيب *আমি খিজির (আঃ) কে এমন কিছু শিখিয়ে দিয়েছে যা আমি-ই অবগত, আমি না জানালে কেউ ইহা জানতে পারেনা আর ইহা হইল ইলমে গায়েব (তাফছিরে বায়দাবী)।

*এই ব্যাপারে তাফছিরে ইবনে জরীর তাবারীতে হজরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ননা করেনঃ عن ابن عباس قال لن تستطيع معى صبرا كان رجلا يعلم علم الغيب قد علم ذلك *অর্থাৎ, খিজির (আঃ) এলমে গায়েব অবগত ছিলেন (তাবারী শরিফ, ১৫তম খন্ড, ২৮০ পৃ:)।

*এ ব্যাপারে আরোও উল্লেখ আছে ঃ هو علم الغيوب والاخبار عنها باذنه تعالى كما ذهب اليه ابن عباس খিজির (আঃ) কে যে জ্ঞান দান করা

হয়েছিল তা ছিল ইলমে গায়েব যা খোদার ইচ্ছা ছাড়া কেউ জানেনা ইহাই ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর মত (তাফছিরে রুহুল বয়ান, ৫ম খন্ড, ৩০৯ পৃ:)।

*তাফছিরে মাদারেকে উল্লেখ আছেঃ يعنى الاخبار بالغيوب قيل العلم اللدنى ما حصل للعبد بطريق الالهام *অর্থাৎ, তাকে গায়েব বিষয়াদী সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে (তাফছিরে মাদারেক)।

*তাফছিরে আরোও উল্লেখ আছেঃ اى علم الباطن الهاما *অর্থাৎ, ইহা ইলমে বাতিন যা ইলহাম দ্বারা লাভ করা হয় (তাফছিরে খাজেন, ৩য় খন্ড, ১৭১ পৃ:)।

*সুতরাং, হজরত খিজির (আঃ) যদি ইলমে বাতিন বা ইলমে গায়িব জানতে পারে, তাহলে আমাদের নবী (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) [যেই নবী না হলে খিজির (আঃ)ও সৃষ্টি হইতেন না] কেন জানবেন না?

#হজরত ঈসা (আঃ) এর ব্যাপারে পবিত্র কোরআনে বর্ণিত আছেঃ وانبئكم بما تا كلون وما تدخرون فى بيوتكم *অর্থাৎ, আমি তোমাদের বলে দিতে পারি তোমাদের ঘরে কি সঞ্চয় করেছ এবং কি আহার করেছ (আল কোরআন)।

ইহাও কিন্তু ইলমে গায়িব কেননা ঘরে যা সঞ্চয় করেছে, সেগুলো কিন্তু ঈসা (আঃ) এর পঞ্চম ইন্দ্রিয়ের বাহিরে। আর যা পাঁচ ইন্দ্রিয়ের বাহিরের জিনিসই গায়েব। ঈসা (আঃ) যদি গায়েব জানতে পারেন, তাহলে আমাদের নবী (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) যিনি ঈসা (আঃ) এরও নবী তিনি কেন গায়েব জানবেন না ?

*অপর আয়াতে আল্লাহ তা'লা বলেনঃ فاوحى الى عبده ما اوحى *অর্থাৎ, অতঃপর বান্দার প্রতি যা ওহী করার তা ওহী করলেন (সূরা নজম)। এই আয়াতে ও (ما) 'মা' শব্দটি আছে, যা উসূলের ভাষায় (عام) তথা ব্যাপকতার প্রতি নির্দেশ করে। অর্থাৎ, যার কোন সীমানা নির্ধারিন থাকে না।

*সুতরাং, আল্লাহ তাঁর হাবীব নবী করিম (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) কে যত কিছু শিক্ষা দেয়ার বা ওহী করার (এর সীমা কত টুকু আল্লাহ-ই ভাল জানেন) তা শিক্ষা দিলেন।

*এই ব্যাপারে আল্লামা শেখ আব্দুল হক্ব মোহাদ্দিসে দেহলভী (রঃ) বলেনঃ- মহান আল্লাহ তাঁর হাবীবকে যত জ্ঞান, মারেফত, বুযুর্গী, সম্মান ইত্যাদি দান করার তা মেরাজের রাত্রে (ما) [হরফের দ্বারা বুঝা যায়] তা দান করলেন (মাদারেজুন্নবুয়ত, ১ম খন্ড)।

*সুতরাং, পবিত্র কোরআনের দ্বারা বুঝা যায়, মহা মালিক রব্বুল ইজ্জাত আল্লাহ পাক তাঁর হাবীবকে ইলমে গায়েব, ইলমে মারফত, ইলমে বাতেন, তথা যত ধরনের জ্ঞান দরকার সব-ই শিক্ষা দিয়েনে। ইহা অস্বীকার করার কোন জো বা রাস্তা নেই। অস্বীকার করলে কোরআন কেই অস্বীকার করা হল।

*পবিত্র হাদিসের দৃষ্টিতে ইলমে গায়েবঃ

*এবার আমরা জানব পবিত্র হাদিস শরিফে নবী করিম (ছাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) এর ইলমে গায়েব তথা বাতেনী জ্ঞান সম্পর্কে। হজরত উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত নবী করিম (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) এর হাদিস ঃ

#দলিলঃ عن عمر رضى الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما فاخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل اهل الجنة منازلهم واهل النار منازلهم *অর্থঃ হজরত উমর (রাঃ) বলেন, রাসূল পাক (ছাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) আমাদের মাঝে দাড়ালেন, অতঃপর নবী (ছাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) আমাদের জানিয়েছেন সৃষ্টি জগতের আদি থেকে, এমন কি- কে কে জান্নাতে যাবে তাদের নিজ নিজ মনজিল ও কে কে জাহান্নামে যাবে তাদের নিজ নিজ মনজিল সম্পর্কে নবীজি বলে গেছেন (বুখারী শরিফ, ১ম জি: ৪৫৩ পৃ:; মেসকাত, ৫০৬ পৃ:; আবু দাউদ; মুসনাদে আহমদ, ৩৮৫/৫; মেরকাত শরহে মেসকাত, ১০ম খন্ড, ৩৬৬ পৃ:; তাফছিরে রুহুল বয়ান; আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া, ১ম খন্ড)।

*এই হাদিস দ্বারা প্রমান নবী করিম (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) সৃষ্টির আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত সব জানেন এবং জান্নাতী ও জাহান্নামীদেরকেও তিনি চিনেন

#দলিলঃ عن عمرو بن اخطب الانصارى قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفجر وصعيد على المنبر فخطب نا حتى حضرت الظهر فنزل فصل ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر ثم نزل فصلى ثم صعد المنبر حتى غربت الشمس فاخبرنا بما هو كائن الى يوم القيمة *অর্থাৎ, হজরত আমর ইবনুল আখতাব (রাঃ) বলেন, আমরা একদিন রাসূল (ছাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) এর সাথে ফজরের নামাজ আদায় করলাম, অতঃপর তিনি মিম্বরে দাড়ালেন এবং বয়ান করা শুরু করলেন এমনকি জোহরের সময় হয়ে গেল। অতঃপর নামলেন ও জোহর নামাজ আদায় করলেন অতঃপর আবার মিম্বরে দাড়ালেন এবং বয়ান করা শুরু করলেন এমনকি আছরের সময় হয়ে গেল। অতঃপর নামলেন ও নামাজ আদায় করলেন আবার মিম্বরে দাড়ালেন ও বয়ান শুরু করলেন এমনকি সূর্য্য অস্ত চলে গেল। নবী করিম (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) আমাদের জানিয়েছেন কেয়ামত পর্যন্ত যা যা হবে সব কিছু (সহি মুসলীম; মেসকাত, ৫৪৩ পৃ:; আবুদাউদ, ১ম জি:; মেরকাত শরহে মেসকাত, ১১ তম খন্ড, ৮০ পৃ:; মুসনাদে আহমদ, ৩৩১/৫; আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া, ১ম খন্ড; মেরআতুল মানাজিহ)।

*সুতরাং, প্রমান হল কেয়ামত পর্যন্ত যা যা হবে তাও নবীজি (ছাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) জানেন।

#দলিলঃ হজরত হুজায়ফা (রাঃ) বর্ণনা করেনঃ- عن حذيفة قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما ما ترك شيئا يكون فى مقام ذلك الى قيام الساعة *অর্থাৎ, হুজুর (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) কিয়ামত পর্যন্ত যা যা হবে সব কিছুর খবর দিয়েছেন কোন কিছু বাদ রেখে যান নি (বুখারী শরিফ, ১ম খন্ড; মুসলীম শরিফ, আবু দাউদ; হাকেম শরিফ, ৮ম খন্ড, ৩০০৬ পৃঃ; তিরমিজি শরিফ; মুসনাদে আহমদ; মেসকাত, ৪৬১ পৃঃ; মেরকাত, ১০ম খন্ড, ৩ পৃঃ; আশিয়াতুল লুমআত) সনদ সহি।

#দলিলঃ হযরত ছাওবান (রাঃ) হতে বর্ণিত আছেঃ عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى زوى لي الارض فرايت شارقها و مغاربها *অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহ আমার সামনে সারাটা দুনিয়া আমার সামনে তুলে ধরেছেন দুনিয়ার পূর্ব থেকে পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত আমি দেখি (সহি মুসলীম শরিফ; ইবনে মাজাহ, ২৯২ পৃঃ; মুসনাদে আহমদ; আবু দাউদ শরিফ, ৫৮৪ পৃঃ; তিরমিজি শরিফ, ১ম জিঃ; বাইহাকী দালায়েলুন্নবুয়ত, ৪র্থ খন্ড, ২৭৮ পৃঃ; তাফছিরে রুহুল বয়ান, মেসকাত শরিফ, ৫১২ পৃঃ; মেরকাত শরহে মেসকাত, ১০ম খন্ড, ৪২৯ পৃঃ; মেরআতুল মানাজিহ)।

*সুতরাং, পৃথিবীর সকল কর্ম কান্ড নবীজি (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) দেখতেছেন।

[বিঃ দ্রঃ বাক্যের শুরুতে ان অথবা ان থাকলে ماضى (মাজি) এর মায়ানা সর্বকালীন হয়ে যায়, যেমনঃ ان الذين امنوا এখানে امنوا শব্দটি (মাজি) কিন্তু এর মায়ানা শুধু ماضى অতিত কালে হবেনা বরং সর্বকালে হবে]

#দলিলঃ ان الله تالى قد رفع لي الدنيا فانا انظر اليها والى ما هو كائن فيها الى يوم القيمة كانما انظر الى كفى هذه *অর্থাৎ, রাসূলে করিম (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) নিশ্চয় আল্লাহ আমার সামনে পৃথিবী তুলে ধরেছেন ফলে আমি পৃথিবীকে দেখছি এবং কেয়ামত পর্যন্ত যা যা হবে সব কিছু আমি আমার হাতের তালুর মত দেখি (দারে কুতনী; তাবারানী- সহি সনদে; শরহে মায়োহেবুল্লাদুন্নিয়া; বায়হাক্বী)।

*ইহা নবী (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) এর হাদিস, যা দ্বারা কেয়ামত পর্যন্ত সকল গায়েবী এলেম নবীজির জানা। এখন কেউ যদি নবীর কথাও না মানে সেই বলতে পারবে যে নবী দেখেনা বা গায়েব জানেনা।

#দলিলঃ عن عبد الرحمن بن عاءش قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رايت ربى عز و جل فى احسن صورة قال فيم يختصم

الملاالاعلى قلت انت اعلم قال فوضع كفه بين كفى فوجدت بردها بين ثدي فعلمت ما فى السموات والارض *অর্থাৎ, নবী (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) বলেনঃ আমি আমার রবকে উত্তম সূরতে দেখেছি, তিনি তাঁর দুই কুতরতী হাঁত আমার দুই কাঁধে রাখলেন ফলে আমি ঠান্ডা অনুভব করলাম অতঃপর আসমান ও জমিনে যত এলেম আছে আমি জেনে গেলাম (মুসনাদে আহমদ; তাফছিরে ইবনে কাছির, ৪র্থ খন্ড, ২৯৫ পৃঃ; দারেমী তাঁর সুনানে; ঈমাম তিরমিজি তা'লিক রুপে বর্ণনা করেছেন; মেসকাত শরিফ, ৬৯ পৃঃ; মেরকাত, ২য় খন্ড, ৩৯৯ পৃঃ; আশিয়াতুল লুমআত; তাফছিরে কবীর শরিফ, ১ম খন্ড, ১২৭ পৃঃ; তাফছিরে দূর্রে মানছুর) হাদিসটি সহি।

#দলিলঃ হজরত আবু যর গিফারী (রাঃ) হতে বর্নিতঃ لقد تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يحرك طائر جناحيه الا ذكر لنا منه علما *অর্থাৎ, সাহাবীরা বলেন, নবী (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) আমাদের এমনি ভাবে অবহিত করেছেন যে, একটা পাখির ডানা নড়ার কথাও পর্যন্ত বাদ দেননি (মুসনাদে আহমদ, সহি সনদে)।

#দলিলঃ হযরত হুজায়ফা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ عن حذيفة قال ....ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم قاءد فتنة الى ان تنقضى الدنيا يبلغ من معه ثلثماءة فصاعدا الا قد سماه لنا باسمه واسم ابيه واسم قبيلته *অর্থাৎ, হুজুর (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) কেয়ামত পর্যন্ত কোন ফিতনা কারীদের কথা বাদ দেননি, যাদের সংখ্যা ৩০০ শত কিংবা ততোধিক। এমন কি তাদের নাম, তাদের বাপ-দাদাদের নাম ও তাদের গোত্রের নাম পর্যন্ত আমাদেরকে বলেগেছেন (আবুদাউদ শরিফঃ ৫৮২ পৃঃ, মেসকাত শরিফ, ৪৬৩ পৃঃ; মেরকাত, ১০ম খন্ড, ২০ পৃঃ; আশিয়াতুল লুমআত)।

*হাদিস দ্বারা প্রমানিত হয়ে গেল যে প্রিয় নবীজি (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) কেয়ামত পর্যন্ত সকল ফেতনা কারীদের কে চিনেন।

#দলিলঃ عن علي قال بعثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم وابا مرثد والزبير بن العوام وكلنا فارس وقال انطلقوا حتى تاتوا روضة خاخ فان بها امراة من المشرمين معها كتاب من حاطب الى فاتخناها فالتمسنا فلم تر كتابا فقلنا ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم لتخرجن الكتاب او لنجردنك فلما رات الجد اهوت الى حجزتها وهى محتجزة بكساء فاخرجته *অর্থঃ হজরত আলী (রাঃ) বর্ণনা করেনঃ রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) আমাকে যুবায়ের ইবনে আওয়াম ও মিকদাদ (রাঃ) কে প্রেরণ করলেন এবং তিনি বললেন যে, তোমরা মহিলাটির পিছনে ধাওয়া কর। মহিলাটিকে তোমরা 'রওজায়ে খাক' নামক স্থানে উটের উপর বসা অবস্থায় পাবে। তার নিকট একটি পত্র আছে। আমরা উট চালিয়ে দ্রূত গতীতে

মহিলাটির পশ্চাদ্ধাবন করলাম। 'রওজায়ে খাকে' তাকে পেলাম, এবং বললাম পত্রটি বের করে দাও। সে বলল আমার নিকট পত্র নেই। আমরা বললাম, হয় পত্র বের করে দাও নয় তোমাকে আমরা বিবস্ত্র করে ফেলব। পরিশেষে মহিলাটি তার চুলের খোপা হতে পত্রটি বের করল .....(সহি বুখারী ও মুসলীম; ইবনে মাজাহ; তাফছিরে ইড়ানে কাছির, ৪র্থ খন্ড, ৪১১ পৃ:; মুসনাদে আহমদ)।

*এই হাদিস দ্বারা প্রমান হয় ইসলামের দুশমন কোথায় কি অবস্থায় আছে ও থাকবে সব কিছুই তিনি দেখেন ও জানেন। যেমন ঐ মহিলার অবস্থান 'রওজায়ে খাকে' এবং তার নিকট পত্র আছে ও কোথায় বসা আছে সবই নবী পাক (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) জানতেন।

#দলিল ঃ وعن ام الفضل بنت الحارث .... تلد فاطمة ان شاء اللهى غلاما يكون فى حجرك * প্রিয় নবী (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) উম্মে ফজল (রাঃ) এর নিকট বলেছিলেন যে, ফাতেমার ঘরে এক জন পুত্র সন্তান হবে সে তোমার (উম্মে ফজলের) কোলেই পালিত হবে (মেসকাত শরিফ, ৫৭২ পৃ:; মেরকাত শরহে মেসকাত, ১১ তম খন্ড, ৩২৪ পৃ:; আশিয়াতুল লুমআত; বায়হাক্বী দালায়েলুন্নবুয়ত)।

*এই হাদিস দ্বারা প্রমান হয়ে যায় কার ঘরে সন্তান কি হবে তাও নবী করিম (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) কে আল্লাহ জানিয়ে দেন।

#দলিলঃ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت على امتى فى صورها فى الطين كما عرضت على ادم وعلمت من يؤمن بي ومن يكفر بي ....لاتسالونى عن شئ فيما بينكم وبين الساعة الا نبأتكم به فقام عبد الله بن حذافة السهمي فقال من ابي يا رسول الله فقال حذافة *রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) বলেন আমার সামনে আমার উম্মতের সূরত পেশ করা হয়েছে যেমনিভাবে আদম (আঃ) এর সামনে পেশ করা হয়েছিল। আমি জানি কে আমার প্রতি ঈমান আনবে ও কে আমার প্রতি কুফুরী করবে।.......তোমরা আমাকে জিজ্ঞাসা কর এখন থেকে কেয়ামত পর্যন্ত আমি বলে দিব। অতঃপর আব্দুল্লাহ ইবনে হুজায়ফা আছ ছাহাম (রাঃ) দাড়ালেন এবং বললেন ইয়া রাসূল্লাহ! আমার পিতা কে? নবীজি বললেন তোমার পিতা হুজায়ফা (তাফছিরে খাজেম শরিফ, ১ম খন্ড, ৩২৪ পৃ:)।

*এই হাদিস দ্বারা প্রমান হয় 'কারা ঈমানদার আর কারা বেঈমান' এই খবর নবী পাক (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) জানেন এবং সকলের সূরাত-চেহারা নবীজি চিনেন। পাশাপাশি কার পিতার কি নাম তাও নবীজি জানেন।

#দলিলঃ عن عائشة قالت بينا راس رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حجرى فى ليلة ضاحية اذ قلت يا رسول الله هل يكون لاحد من الحسنات

عدد نجوم السماء قال نعم عمر قلت فاين حسنات لبى بكر قال انما جميع حسنات عمر كحسنة واحدة من حسنات ابى بكر *অর্থঃ হজরাত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন, একদা এক চাঁদনী রাতে যখন রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) এর মাথা মোবারক আমার কোলে ছিল, তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূল্লাল্লাহ! আকাশে যতগুলি নক্ষত্র আছে এই পরিমান কারোও নেকী আছে কি? তিনি বললেন: হ্যাঁ হবে। উমরের নেকী এই পরিমান। আমি বললাম: তবে আবু বকরের নেকী কোথায়? তখন তিনি বললেন: উমরের সমস্থ নেকী আবু বকরের একটি নেকীর সমান (মেসকাত, ৫৬০ পৃ:; মেরকাত, ১১ তম খন্ড, ২১৭ পৃ:; রাজিন শরিফ; মেরআতুল মানাজিহ)।

*এই হাদিস দ্বারা প্রমান হয় উম্মতের আমল নামায় কতগুলো নেকী আছে তাও প্রিয় নবীজি (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) জানেন।

#দলিলঃ غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما من الايام فقال خطيبا فقال سلونى فانكم لا تسالونى عن شيء الا انبأتكم به فقام اليه رجل من قريش من بنى سهم يقال له عبد الله بن حذافة فقال يا رسول الله من ابى؟ قال ابوك فلان وفى رواى قيل يا رسول الله اين مدخلى؟ قال فى النار *অর্থঃ একদা আল্লাহর নবী (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) রাগান্বিত হয়ে বলতে লাগলেন আমাকে জিজ্ঞাসা কর, আমাকে জিজ্ঞাসা কর। কুরাইশের 'বনী ছাহম' গোত্রের একলোক দাড়ালেন যাকে আব্দুল্লাহ ইবনে হুজায়ফা বলা হয়, সে নবী (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) কে বললেন: হে আল্লাহর রাসূল আমার পিতা কে? নবীজি বললেন: তোমার পিতা 'অমুক' অন্য রেওয়াতে আছে জিজ্ঞাসা করলেন পরকালে আমার স্থান কোথায়? নবীজি বললেন: জাহান্নামে (তাফছিরে তাবারী, ৭ম খন্ড, ৮৯ পৃ:; বুখারী শরিফ, ১ম খন্ড, ২০ পৃ:; ফাতহুল বারী)।

*এই হাদিস দ্বারা বুজা যায়, নবী করিম (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) 'কে জান্নাতে যাবে আর কে জাহান্নামে যাবে' এই খবরও জানেন, এবং 'কার পিতার নাম কি' তাও জানেন। কারন আব্দুল্লাহ নামক সাহাবীর পিতা কে এ নিয়ে তৎকালিন লোকেরা সমালোচনা করতেন এবং কেউ জানতেন না তাঁর পিতা কে কারন তাঁর 'মা' মৃত ছিল। আল্লাহর নবী বলেদিলেন তোমার

#দলিলঃ ان جبريل عليه السلام نزل بقوله تعالى (كهيعص) فلما قال كاف قال النبى صلى الله عليه وسلم علمت فقال ها فقال علمت فقال يا فقال علمت فقال عين فقال علمت فقال صاد فقال علمت فقال جبريل كيف علمت ما لم اعلم؟ *অর্থঃ নিশ্চয় জিব্রাইল (আঃ) এই আয়াত (كهيعص) নিয়ে নবীজির কাছে নাজিল হল। যখন জিব্রাইল (আঃ) বললেন: 'ক্বাফ' নবীজি বললেন: ইহা আমি পূর্বেই জানি। অতঃপর জিব্রাইল (আঃ) বললেন:

'হা' নবীজি বললেন: ইহা আমি পূর্বেই জানি। জিব্রাইল বললেন: 'ইয়া', নবীজি বললেন: ইহা আমি পূর্বেই জানি। জিব্রাইল বললেন: 'আইন', নবীজি বললেন: ইহা পূর্বেই জানি। জিব্রাইল বললেন: 'চোয়াদ' নবীজি বললেন: ইহাও আমি পূর্বেই জানি। জিব্রাইল (আঃ) বললেন: আপনি এগুলো কিভাবে জানলেন? অথচ ইহা আমিই জানতাম না (তাফছিরে রুহুল বয়ান, ৫ম খন্ড, ৩৫৯ পৃ:; ১ম খন্ড, ৩৩ পৃ:)।

*এই হাদিস দ্বারা প্রমান হয়, প্রিয় নবীজি (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) যা জানেন তা ফেরেস্তা জিব্রাইল (আঃ) ও জানেনা।

#দলিলঃ عن سهل بن سعد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لاعطين هذه الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله و رسوله

*প্রিয় নবীজি (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) খায়বার যুদ্ধের আগের দিন বলতেছেন। আমি আগামীকাল এমন এক জনের হাতে এই পতাকা দিব যার হাঁতে খায়বারের বিজয়। তিনি এমন ব্যক্তি যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসে (মেসকাত শরিফ, ৫৬৩ পৃ:, সহি বুখারী; সহি মুসলীম; মুসনাদে আহমদ, ৩৩১/১; তিরমিজি, ইবনে মাজাহ; মেরকাত শরহে মেসকাত, ১১ তম খন্ড, ২৪৩ পৃ:; আশিয়াতুল লুমআত)।

*এই হাদিস দ্বারা প্রমান হয়ে যায়, আগামী কাল কি হবে তাও নবীজি জানেন এবং যুদ্ধ জয় হবে কিনা ও কার মাধ্যমে জয় হবে তাও নবী (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) জানেন।

#দালিলঃ عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال............ انس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا نصرع فلان غدا ووضع يده على الارض وهذا مصرع فلان غدا ووضع يده على الارض وهذا مصرع فلان غدا ووضع يده على الارض فقال والذى نفسى بيده ما جاوز احد منهم عن موضع يد رسول الله صلى الله عليه وسلم فامر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخذ بارجلهم فسحبوا فالقوا فى قليب بدر

*অর্থাৎ, হজরত আনাছ (রাঃ) বলেন, রাসূলে করিম (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) বললেন: (বদরের যুদ্ধের আগের দিন) মাঠে গিয়ে জমিনে হাত রেখে বললেন আগামী কাল এই জায়গায় ওমুক (ওতবা) মারা যাবে, এই জায়গায় অমুক (শায়রা) মারা যাবে, এই জায়গায় ওমুক (আবু জাহেল) মারা যাবে। আনাস (রাঃ) বলেন ঐ সত্ত্বার কসম! যা হাঁতে আমার প্রাণ, নবীজির হাঁত মোবারক যেখানে রেখেছেন ঠিক ঐ খান থেকেই, ঐ লোকের লাশ আমারা যুদ্ধের পরে টেনে টেনে নিয়েছিলাম (আবু দাউদ শরিফ, কিতাবুল জিহাদ ১ম জিঃ; মুসলীম শরিফ, ১ম জিঃ, মেসকাত শরিফ)।

*এই হাদিস দ্বারাও প্রমান হয়ে যায় নবীজি আগামীকালের খবর জানতেন কেননা বদরের যুদ্ধে আগের দিন নবী (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) যা যা বলেছিলেন, পরে তাই হয়েছে।

#দালিল ঃ عرضت على اعمال امتى حسنها و سيئها فوجدت محاسن اعمالها الاذى يماط عن الطريق

*প্রিয় নবীজি (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) বলেন: আমার সামনে উম্মতের ভালমন্দ সকল আমল সমূহ পেশ করা হয়েছে। এমনকি আমি তাদের নেক আমল সমূহের মধ্যে রাস্তা থেকে কংক্রিট সরাতেও দেখেছি (সহি মুসলীম, মেসকাত, ৬৯ পৃ:; মেরকাত শরহে মেসকাত, ২য় খন্ড, ৩৮৬ পৃ:; আশিয়াতুল লুমআত, মুসনাদে আহমদ, ১৭৮/৫; ইবনে মাজাহ, হা: নং ৩৬৮৩; সহি ইবনে খুজাইমা, ২য় খন্ড, ৫৬২ পৃ:; মেরআতুল মানাজিহ)।

#দালিলঃ عن انس النبى (ص) صعد احدا و ابو بكر و عمر و عثمان فرجف بهم فضربه برجله فقال اثبت احد فانما عليك نبى و صديق و شهيدان

*একদা প্রিয় নবীজি (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম), হজরত আবুবকর (রাঃ), হজরত উমর (রাঃ) ও হজরত উসমান (রাঃ) উহুদ পাঁহাড়ে অবস্থান করতেছিল। এমন সময় পাঁহাড় নড়ে উঠলে নবীজি ওহুদ পাঁহাড়কে পা দ্বারা আঘাত করে বললেন থাম! কারণ তোমার মাঝে একজন নবী, ১ জন সিদ্দিক ও ২ জন শহিদ আছে- (মেসকাত শরিফ, ৫৬৩ পৃ:; মেরকাত, ১১ তম খন্ড, ২৩৪ পৃ:; সহি বুখারী, মুসনাদে আহমদ, ১৬ তম খন্ড, ৪৭২ পৃ:; আবু দাউদ, তিরমিজি; মেরআতুল মানাজিহ)।

*এই হাদিস সহি, বলা যায় মানুষ শহিদ হবেন নাকি স্বাভাবিক ভাবে মৃত্যুবরণ করবে তাও নবী করিম (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) জানতেন। কারণ উমর ও উসমান (রাঃ) দুজনের মৃত্যুর বহু পূর্বেই নবীজি বলেছিলেন যে ২ জন শহিদ ও আবু বকর (রাঃ) কে সিদ্দিক বলেছেন। পরবর্তীতে তাঁরা দুজন শহিদ হয়েছেন এবং একজন স্বাভাবিক মৃত্যু বরন করেছেন।

#দলিলঃ عن ابى قتادة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمار حين يحفر الخندق فجعل يمسح راسه ويقول بوس ابن سمية الفئة الباغية

*অর্থাৎ, হজরত আবু-কাতাদা (রাঃ) হতে বর্ণিত, হজরত আম্মার যখন খন্দক যুদ্ধে পরিখা খনন করতেছিল, তখন রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) তাঁর মাথায় হাঁত বুলাইয়া বললেন, সুমাইয়ার পুত্রের উপর কত কঠিন সময় আগত, বিদ্রোহী দলটি তাকে হত্যা করবে (মুসলিম শরিফ; তিরমিজি শরিফ; মেসকাত শরিফ, ৫৩২ পৃ:; মেরকাত শরহে মেসকাত, ১১ তম খন্ড, ১৭ পৃ:; আশিয়াতুল লুমআত)।

*এই হাদিস দ্বারা বুঝা যায় মানুষ কিভাবে মারা যাবে তাও নবীজি জানেন, যেমন আম্মার ইবনে ইয়াছার (রাঃ) ইন্তেকালের পূর্বেই তাঁর শাহাদাতের খবর দিয়েছেন এবং তিনি কিভাবে মারা যাবেন তাও তিনি বলে গেছেন।।

#দালিলঃ وعن ابی یرة قال شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا فقال رسول الله لرجل ممن معه يدعى الاسلام هذا من اهل النار فلما حضر القتال قاتل الرجل من اشد القتال وكثرت به الجراح فجاء رجل فقال يا رسول الله اريت الذى تحدث انه من اهل النار قد قاتل فى سبيل الله من اشد القتال ...... *অর্থাৎ, যুদ্ধের ময়দানে একটি লোক প্রান-পন যুদ্ধ করছেন, একজন জিজ্ঞাসা করলে হুজুর ঐ লোকটি জান্নাতি নাকি জাহান্নামি? নবীজি বললেন জাহান্নামী, সবশেষে দেখাগেল লোকটি আত্মহত্যা করে মারা গেল (বুখারী, সহি মুসলীম; মুসনাদে আহমদ, ৩০৯/২; দারেমী শরিফ, ২য় খন্ড, ৩১৪ পৃ:; মেসকাত ৫৩৪ পৃ:; মেরকাত শরহে মেসকাত, ১১ তম খন্ড, ৩০ পৃ:; মেরআতুল মানাজিহ)।

*এই হাদিস দ্বারা প্রমাণ হয়, কে জান্নাতি ও জাহান্নামি তাও নবীজি মৃত্যুর আগেই জানেন, যেমন ঐ লোকটির ব্যাপারে মারা যাওয়ার আগেই বলেছিলেন।

#দলিলঃ عن ابن عمر قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة فقال يقتل هذا فيها مظلوما لعثمان *অর্থঃ হজরত ইবনে উমর (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলে করিম (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) ফেতনা সম্পর্কে আলোচনা করেন এবং উছমান (রাঃ) এর প্রতি ঈঙ্গিত করে বললেন: এই লোকটি উক্ত ফেতনায় মজলুম অবস্থায় শহিদ হবে (মেসকাত, ৫৬২ পৃ:; তিরমিজি; মেরকাত, ১১ তম খন্ড, ২২৯ পৃ:; মুসনাদে আহমদ, ১১৫/২; আশিয়াতুল লুমআত)।

*এই হাদিস দ্বারা প্রমান হয়, কে কোথায় কিভাবে মারা যাবে তাও প্রিয় নবীজি (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) জানেন।

#দালিলঃ وعن ابی ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انكم ستفتحون مصر وهى ارض يسمى فيها القراط فاذا فتحتموها فاحسنوا الى اهلها فان لها ذمة رحما او قال ذمة وصهرا *অর্থাৎ, নবীজি বলেন অচিরেই তোমরা মিশর জয় করবে। ইহা এমন একটি দেশ যেখানে কীরাত (মুদ্রার নাম) ব্যবহার হয়। তোমরা ইহা জয় করিলে তাদের সাথে ভাল ব্যবহার করিবে। কেননা তাদের সাথে সৌহাদ্য ও আত্মীয়তার অথবা বলেছেন সৌহাদ্য ও শশুরাত্বীয়তা সম্পর্ক রয়েছে। (সহি মুসলিম, মেসকাত ৫৩৯ পৃ:; মেরকাত, ১১ তম খন্ড, ৬০ পৃ:; মুসনাদে আহমদ; আশিয়াতুল লুমআত)।

*এই হাদিসে প্রমাণ হয় ভবিষ্যতে কি হবে তাও নবীজি জানেন কারণ মিশর জয় হয়েছিল উমর (রাঃ) এর যুগে এবং কোন্ দেশের মুদ্রার নাম কী তাও নবীজি জানেন।

#দালিলঃ عن ابی بكرة قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر الحسن بن علي على الى جنبه وهو يقبل على الناس مرة وعليه اخرى ويقول ان ابنى هذا سيد ولعل الله ان يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين *একদা নবী করিম (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) ইমাম হাসান (রাঃ) সাথে নিয়ে বসা ছিলেন, হঠাৎ নবীজি বললেন: আমার এই সাইয়েদ! নিশ্চয় আল্লাহ ঈমাম হাছানের মাধ্যমে দুটি বিরাট বাহিনীর মাঝে সমঝোতা করে দিবেন (সহি বুখারী, মেসকাত ৫৬৯ পৃ:; মেরকাত শরহে মেসকাত, ১১ তম খন্ড, ২৯৮ পৃ:; আবু দাউদ; নাসাঈ শরিফ; তিরমিজি শরিফ)।

*এই হাদিস দ্বারা বুঝা যায় মানুষ ভবিষ্যতে কি করবে তাও নবীজি জানেন, কারণ ইমাম হাছানের খেলাফত ৬ মাস চলার পরে তিনি মোয়াবিয়ার হাতে খেলাফত দিয়ে বিশাল দুটি বাহিনীর মাঝে সমঝোতা করেদেন,যে খবর নবী পূর্বেই দিয়েছেন। শুধুতাই নয় অন্য হাদিসে আরোও আছে?

#দালিলঃ عن انس بن الحارث قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان ابنى هذا يقتل بارض لها كربلا ..... *অর্থাৎ, নবীজি (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) বলেছেন: আমার এই আওলাদ! এমন এক স্থান শহিদ হবে যার নাম কারবালা। তোমরা যদি সেখানে উপস্থিত থাক তাহলে তাকে সাহায্য করবে- (বায়হাকী শরিফ- দালায়েলুন নবুয়ত)।

*সুতরাং, নবী করিম (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) ইমাম হুসাইন (রাঃ) এর শহিদ হওয়ার স্থান সম্পর্কে ও জানতেন!

#দালিলঃ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال امر امتى قاءما بالقسط حتى يمثله رجل من بنى امية يقال له يزيد *অর্থাৎ,প্রিয় নবীজি (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) বলেন: আমার পর উম্মতের মাঝে ন্যায় ও ইনসাফের মাধ্যমে খেলাফত চলবে। কিন্তু উমাইয়া গোত্রের একটি লোক তা নষ্ট করে দিবে, তার নাম 'ইয়াজিদ' (আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া)।

*এই ব্যাপারে আরোও অনেক হাদিস উল্লেখ করা যেতে পারে। শুধু বুঝবার জন্য এই হাদিস গুলো উল্লেখ করলাম, এখন কেউ যদি নবীর হাদিস এর ভিতরে আকিদা রাখতে চান তাহলে অবশ্যই বিশ্বাস করতে হবে নবী করিম (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) গায়েবের এলেম জানেন বা আল্লাহ দান করেছেন। যেমন নবীজি আরোও বলেছেন:

#দালিলঃ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علمت علم الاولين والاخرين *অর্থাৎ, আল্লাহ আমাকে আওয়াল থেকে আখের পর্যন্ত সব এলেম দান করেছেন (তাবারানী-হাসান সনদে)।

*ফকিহ্ ও মুজতাহিদ্ গণের ভাষ্যঃ

*আলামা শেখ আঃ হক্ব মোহাদ্দেছে দেহলভী (রঃ) বলেনঃ- আদম [(আঃ) হতে শিঙ্গায় ফুক দেওয়া পর্যন্ত সব কিছু নবী (ছাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) এর] সামনে উপস্থিত করা হয়, যাতে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সবকিছুই নবীজি জেনে নিয়েছেন – (মাদারেজুন্নবুয়ত, ১ম খণ্ড, পৃ: ১৪৪)

#আল্লামা ইমাম যুরকানী (রঃ) বলেনঃ অগণিত বর্ণনাকারীর সমর্থন পুষ্ট হাদিস সমূহের সমস্ত ভাবার্থে একথা বলা হয়েছে যে, গায়েব সম্পর্কে নবী পাক (ছাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) অবহিত। এই মাসালা সেসব আয়াতের পরিপন্থী নয়, যেগুলো দ্বারা বুঝানো হয় আলাহ ছারা কেউ গায়েব জানেন না। কেননা উক্ত আয়াতগুলো দ্বারা অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করা হয়েছে তাহলো মাধ্যম ছারা অর্জিত জ্ঞান। খোদা প্রদত্ত জ্ঞানের কথা পবিত্র কুরআনে উলেখ আছে। যেমনঃ الا من ارتضى من رسول

#আল্লামা ক্বাজী আয়্যায (রঃ) বর্ণনা করেনঃ خص الله تعالى به عليه السلام بالاطلاع على جميع مصالح الدنيا و الدين ومصالح امته امته وما كان فى الامم وما سيكون فى امته من النقير والقطير وعلى جميع ..... অর্থাৎ,আল্লাহ তাঁর নবীকে সতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী করে দ্বীন-দুনিয়ার সমস্থ মঙ্গলময় বিদায়ী জ্ঞান দান করেছেন। নিজ উম্মতের মঙ্গলজনক বিষয় আগের উম্মতের ঘটনাবলী। নিজ উম্মতের নগন্য থেকে নগন্যতর ঘটনা সম্পর্কেও তাঁকে জ্ঞান দান করেছেন, মারেফাতের সর্বত্র বিষয় দান করেছেন (শিফা শরিফ)।

#কাছিদায়ে বোর্দা শরিফে উলেখঃ আপনার বদান্যতায় দুনিয়া ও আখিরাতের অস্তিত্ব। লওহে মাহফুজও কলমের জ্ঞান আপনার জ্ঞানের বিদায়ংশ মাত্র!

#আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রঃ) বলেনঃ وكون علومهما من علومه عليه السلاو ان علومه تتنوع الى الكليات والجزيات وحقائق ومعارف وعلوارف تتعلق بالذات والصفات وعلومهما من علومه يكون مايكن نهرا من بحور علمه وحرفا من سطور علمه *অর্থাৎ, লওহে মাহফুজ ও কলমের জ্ঞানকে কিয়দাংশ বলা হয়েছে এজন্যই যে, নবী করিম (ছাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) এর জ্ঞানকে বিভিন্ন শাখায় ভাগ করা যেতে পারে। যেমন তাঁর জ্ঞান বস্তু বিষয়ের সামগ্রিক সত্ত্বা, মৌলিক সত্ত্বা খোদার পরিচিতি (শরহে কাছিদায়ে বোর্দা শরিফ)।

#আল্লামা ইমাম ইবনে হাজার মক্কী (রঃ) বলেনঃ لان الله تعالى اطلعه على العالم فعلم الاولين والاخرين وما كان وما يكن *অর্থাৎ, মহান আল্লাহ নবী করিম (ছাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) কে সমস্ত জগৎ সম্পর্কে অবহিত করেছেন। সুতরাং তিনি পূর্ববর্তী পরবর্তী যা কিছু আছে এবং যা কিছু হবে সব কিছুই জেনে নিয়েছেন- (আফদ্বালুন ক্বোরা)।

#ঈমাম কুস্তলানী (রঃ) বর্ণনা করেনঃ النبوة ما خوذة من النباء نباء শব্দটি نبوت بمعمى الخبر اى اطلعه الله على الغيب *অর্থাৎ, নবুয়ত শব্দ থেকে আগত। যার অর্থ খবর বা জ্ঞান। অর্থাৎ, মহান আল্লাহ তাঁকে গায়েবের এলেম অবহিত করেছেন।

#হযরত মোজাদ্দেদ আল্ফেছানী (রাঃ) বলেনঃ- যে জ্ঞান আল্লাহর জন্য বিশেষরূপে নির্ধারিত সে জ্ঞান কেবল বিশেষ রাসূলগণকে জ্ঞাত করা হয় (মাকতুবাত শরিফ, ১ম খণ্ড,৩১০ নং)।

বাহরুল উলুম মাওলানা আ: আলী লাখনভী (রঃ) বলেন: علمه علوما بعضها اختوى عليه القلم الاعلى وما استطاع على احاطتها اللوح الاوفى لم يلد الدهر مثله من الازل ولايلد الى الابد فليس له ممن فى السموت والارض كفوا احد *অর্থাৎ, আল্লাহ তা'লা নবী (ছাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) কে সেই সমস্ত বিষয়ের জ্ঞান দান করেছেন, যেগুলো সর্বোচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন বা কলমের আ'লার আওতায়-আসেনি। লওহে মাহফুজেও সেগুলো আয়ত্ব করতে পারেনি (মীর যাহেদ 'রেসালার' টিকার ভূমিকায়)।

#শরহে আকায়েদে নসফীতে উলেখ আছঃ بالجمة العلم بالغيل امر بقردبه الله تعالى لاسبيل اليه للعباد الا باعلام منه او الهام بطريق المعجزات او الكرامة

*অর্থাৎ, (ইলমে গায়েব) আয়ত্বকরা বান্দার পক্ষে সম্ভবনয়, যদি আল্লাহ ওহী বা এলহাম দ্বারা জানিয়েদেন বা মারাফত রূপে জানিয়েছেন তা ভিন্ন কথা-(শরহে আকায়েদে নছফী, ১৭৫ পৃ:)।

*সুতরাং, বুঝাগেল ইলমে গায়েব ওহি বা এলহামের মাধ্যমে আল্লাহ ইচ্ছা করলে জানান।

*অন্যত্র উলেখ আছে: فرض الحج سنة تسع وانما اخره عليه السلام لعشر لعذر مع عليه ببقاء حياته ليكمل التبليغ

*অর্থাৎ, হজ্ব ফরজ হয় নবম হিজরীতে, কিন্তু আদায় করেন নবী (ছাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) ১০ম হিজরীতে। তিনি ইহকালীন হায়াত সময় সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন বিধায় হজ্ব স্থগিত করেছেন (দূরুল মোখতার-কিতাবুল হজ্ব)।

*সুতরাং, বুঝা গেল নবীজি ভবিষ্যত জীবনের ব্যাপারেও জ্ঞান ছিলেন।

#হাজী এমদাদুলাহ মোহাজের মক্কী (রঃ) বলেনঃ- লোকে বলে করিম (ছাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) ও অলীগণ গায়েব জানেন না। আমি বলি সঠিক পথের পথিকগণ যে দিকে দৃষ্টিদেন, গায়েবী বিষয়াদী সম্পর্কে অবহিত হন। এই জ্ঞান আলাহ প্রদত্ত (শামায়েলে ইমদাদিয়া, পৃ: ১১০; আনোয়ারে গায়বিয়া, ২৫ পৃ:)।

#মাওলানা রশিদ আহমদ গাংগুহী বলেনঃ- নবীগণ সবসময় গায়েবী বিষয়াদী অবলোকন করেন। আল্লাহর সান্নিধ্যে উপস্থিত থাকেন, এজন্যই নবীজি বলেছেন: انی اری ما لا ترون *অর্থাৎ, আমি যা জানি তোমরা তা জাননা, এবং আমি যা দেখি তোমরা তা দেখ না (লাতায়েফে রশিদিয়া, ২৭ পৃ:)।

#মাওলানা আশরাফ আলী থানভী সাহেব বলেনঃ- শরিয়তে বর্ণিত আছে যে নবীগণ গায়েবী বিষয়াদী খবর দিয়ে থাকেন, আল্লাহ যদি তাঁর রাসূল ও অলীগণের মাঝে খুশি থাকে, তাকে গায়েব দান করেন।

#দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা আবুল কাসেম নানুতুবী সাহেব বলেন:- পূর্ববর্তী জ্ঞান এক ধরনের আর পরবর্তী জ্ঞান ভিন্ন ধরনের। কিন্তু উভয় প্রকার জ্ঞান আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) এর মধ্যে দান করা হয়েছে (তাহজিরুন্নাছ, ৪ পৃ:)।

*সুতরাং উপরোক্ত বর্ণনা গুলো দ্বারা এটি বুঝা যায় যে, মহান আল্লাহ পাক তার হাবীব রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) কে এবং তাঁর প্রিয় বান্দাদের যাকে খুশি তাকে ইলমে গায়েব দান করেন, এত কোন সন্দেহ নাই।

*আমাদের জানা দরকার যে সবচেয়ে বড় গায়েব হল "আল্লাহ" কারণ তিনি সর্বত্র বিরাজমান অথচ কেউ দেখে না। আর সেই সবচেয়ে "বড়" গায়েবের তথা আল্লাহকে ই যে দেখেছে তাঁর কাছে আর কিসের গায়েব থাকবে?

*প্রিয় নবীজির শিক্ষক হল সয়ং আল্লাহ। যা শিক্ষা দিলেন তা হল কিতাব ও বিশেষ জ্ঞান। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, আল্লাহ কি কামিল শিক্ষক নন? অথবা নবীজি কি উপযুক্ত শাগরীদ নন? সুতরাং, আল্লাহ কামিল শিক্ষক হয়ে উপযুক্ত শাগরীদ নবী (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) কে সব ধরনের জ্ঞানই দান করেছেন। যেমন বলা আছে: وعلمك ما لم تكن تعلم আপনি যা জানতেন না তা সব জানিয়ে দিয়েছি।

#শয়তান জানে পৃথিবীতে কাকে কোথায় ধোকা দিতে হবে, আর তা একই সময়। শয়তান যদি প্রতি মুহূর্তে সারা দুনিয়ার খবর রাখতে পারে তাহলে আমাদের নবীর ক্ষমতা কি শয়তানের চেয়ে কম? (নাওজুবিল্লাহ) অবশ্যই নবীর ক্ষমতা অনেক বেশী কারণ নবীজি (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) বলেছেন শয়তান আমাকে ধোকা দিতে আসার পর আমি তাকে (অর্থাৎ আমার শয়তানকে) ধরে মুসলমান করে ফেলেছি এজন্যই নবীজি বলেছেন: اسلام شيطانى আমার শয়তান মুসলমান হয়ে গেছে।

*অন্যদিকে 'নবী' শব্দের অর্থ 'খবরদাতা' যদি দ্বীনের খবর বুঝানো হয় তাহলে'ত সব মৌলভীরা নবী হয়ে যাবে কারণ তারাও দ্বীনের

দাওয়াত দেয়। আর যদি পার্থিব খবর হয় তাহলে সংবাদ পত্র, টিভি, রেডিও, তারবার্তা প্রেরণকারী সবাই নবী হয়ে যাবে। কারন তারাও খবর পরিবেশন করে। *সুতরাং, "নবী" শব্দের অর্থ হবে গায়েবের খবর দেনেওয়ালা।

*তাই অবশেষে বলা যায়, নবী করিম (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) আল্লাহ প্রদত্ত ইলমে গায়েব জানেন। একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল কেউ যদি বলে আলাহ গায়েব জানে, তাহলে বলব আল্লাহকে কে জানিয়েছে? কারন 'জানে' শব্দটি তখনই আসবে, যখন বুঝা যাবে অন্য কেউ জানিয়েছে। সুতরাং আল্লাহ গায়েব "জানে" শব্দটি না বলে বলতে হবে: আল্লাহ গায়েবের মালিক বা গায়েবের খাজিনা।

* কিছু আয়াতের বিশ্লেষণ ঃ

قل لا اقول لكم عندى خزائن الله ولا اعلم الغيب

*অর্থাৎ, হে নবী বলুন! আমি বলিনা যে, আমার কাছে আল্লাহর ধনভাণ্ডার রয়েছে এবং আমি এও বলিনা যে, আমি গায়েব জানি।

*পবিত্র কুরআনে কিছু আয়াতাংশ যেমনঃ ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير *অর্থাৎ, যদি আমি গায়েব জানতাম তাহলে আমার কল্যাণ নিয়ে নিতাম। لااعلم الغيب *অর্থাৎ, আমি গায়েব জানিনা।

*এই আয়াতগুলোর অর্থ হবে গায়েব 'জাতি' আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি গায়েব ২ প্রকার, যথাঃ- ১/ গায়েবে জাতি, ২/ গায়েবে আতায়ী। নবী করিম (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) গায়েবে জাতি জানেন না বরং গায়েবে আতায়ী তথা খোদা প্রদত্ত গায়েব জানেন। এসব আয়াতে গায়েবে জাতিকেই লক্ষ্য করে নাযিল হয়েছে। কেননা আমরা ইতিপূর্বে পবিত্র কুরআন দ্বারা-ই প্রমাণ করেছি নবীজিকে আল্লাহ গায়েব জানিয়ে দেন।

#তাফছিরে উল্লেখ আছে: قلت يحتمل ان يكن قاله تواضعا وادبا নবীজি (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) নম্রতা ও ভদ্রতা কারনে ই বলেছেন অথবা তিনি সমস্ত তথা 'গায়েবে জাতির মালিক নন' তা বলেছেন (তাফছিরে খাজেন, ২য় খন্ড, ২৮০ পৃ:)।

*অপর দিকে বলা হয়েছে: لا اقول لكم عندى خزائن الله আমি বলিনা যে, আমার কাছে আল্লাহর ধনভাণ্ডার আছে। এর অর্থ যে, আল্লাহ না দিলে কারোও কাছেই ধনভাণ্ডার থাকেনা। আর নবী (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) কে পথিবীর খাজিনা বা ধনভাণ্ডার দান করা হয়েছে, যেমন নবীজি বলেনঃ

#দলিলঃ اوتيت مفاتيح خزائن الارض *অর্থাৎ, আল্লাহ আমাকে পৃথিবীর ধনভাণ্ডারের চাবিকাটি দান করেছেন (বুখারী শরিফ, হা: নং

২৯৭৭; সহি মুসলীম; মেসকাত, ৫১২ পৃ:; মেরকাত, ১০ম খন্ড, ৪২৮ পৃ:; মুসনাদে আহমদ, ২৬৪/২; নাসাঈ তাঁর সুনানে, হা: নং ৩০৮৭; শিফা শরিফ, ২য় জি: ২১৮ পৃ:; মাওয়াহেবুল্লাদুন্নিয়া, ৪র্থ খন্ড, ৫১৩ পৃ:)

*আসমান জমিনে যত গায়েবী এলেম আছে সবই নবীজিকে দান করেছেন, যেমন আল্লাহ বলেন: الرحمن علم القران তিনি দয়াময় যিনি আপনাকে কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন (সূরা: আর রহমান)।

*সুতরাং, প্রমাণ হয়ে গেল, আসমান জমিনের সকল গায়েব সম্বলিত কিতাব তথা কুরআনকে আল্লাহ নবীজিকে শিক্ষা দিয়েছেন। কেননা পবিত্র কোরআনে আসমান জমীনের সকল গায়েব আছে, যেমনঃ وما من غيبة ما فى السموت والارض الا فى كتاب مبين *অর্থাৎ, আসমান জমীনের সকল গায়েব রয়েছে এই কিতাবে।

#অপর আয়াতে আল্লাহ পাক বলেনঃ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو *অর্থাৎ, তাঁরই নিকটে রয়েছে গায়েবের চাবিকাটি তিনি ছাড়া তা কেউ জানেনা। উক্ত আয়াতে একটি পয়েন্ট যে, مفاتح শব্দের বাংলার অর্থ 'চাবিকাটি' সুতরাং বুঝা গেল গায়েবের চাবি আছে, আর চাবি থাকার অন্যতম কারণ হল আল্লাহ যাকে খুশি তাকে চাবি দ্বারা খুলে গায়েবী এলেম দান করেন। যদি দান নাই করতেন তাহলে চাবি-ই রাখতেন না।

*যেমন অন্য জায়গায় বলেনঃ الا من ارتضى من رسول রাসূলদের যাদেরকে খুশি তাদেরকে গায়েবী এলেম দান করেন (সূরা জিন্ন: ২৬ নং আয়াত)।

*কেউ কেউ বলেছেন: গায়েব সম্পর্কিত বিরুধী যত আয়াত আছে তা সূরা জিনের ২৬ নং আয়াত দ্বারা মানসূক হয়ে গেছে। এই মতটি যুক্তিযুক্তও বটে কারণ বিরুধী আয়াতে সরাসরি নিষেধাজ্ঞা আর সূরা জিনে রাসূলগণের কথাও আনা হয়েছে। সুতরাং এরকম হওয়াও স্বাভাবিক যে, প্রথমে নবীজিকে ইলমে গায়েব দেওয়া হয়নি, তখন তিনি বলেছিল لا اعلم الغيب "আমি গায়েব জানিনা" আর যখন নাযিল হলঃ فلا يجهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسلا তখন ঐ সমস্থ নিষেধাজ্ঞাকে আয়াতগুলো রহিত বা মানছুক হয়ে গেছে। এর পরে মহান আলাহ তাঁর প্রিয় হাবীবকে সব ধরনের এলেম দ্বারা পুরস্কৃত করলেন এবং ঘোষণা করলেন: و علمك ما لم تكن تعلم *আপনি যা জানতেন না সব আপনাকে শিক্ষা দিয়েছি। এই আয়াতের তাফছিরে উল্লেখ আছেঃ و علمك من علم الغيب ما لم تكن تعلم *হাবিব! ইলমে গায়েবের যা আপনার অজানা ছিল আমি আপনাকে তা জানিয়ে দিয়েছি (তাফছিরে খাজেন, ১ম খন্ড, ৪২৬ পৃ:)।

*এই বিচারে: لا اعلم الغيب ;لا يعلم الا هو ঃ ইত্যাদি আয়াতগুলো সূরা জিনের ২৬ নং আয়াত এবং ما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبى من رسله من يشاء এই আয়াত দ্বারা রহিত করা হয়েছে অথবা যিয়াদা করা হয়েছে। প্রকাশ থাকে যে, আল্লাহ কুরআনের একটি হরফও অস্বীকার করার কোনো রাস্তা নেই। যদি কেউ অস্বীকার কিংবা সন্দেহ করে তাহলে সে শরিয়তের দৃষ্টিতে কাফির বলে গণ্য হবে।

ولا يحيطون بشئ من علمه الا بما شاء *অর্থাৎ, এরা আল্লাহর জ্ঞান ভাণ্ডার থেকে কিছু ই পায়না তবে তিনি যা ইচ্ছা তা ব্যতিত (আয়াতুল কুরসীর অংশ)।

এবং ما كان الله ليطلعكم على الغيب *অর্থাৎ, এটা আল্লাহর শান নয় যে, তোমাদের ইলমে গায়েব দান করবেন তবে: ولكن الله يجتبى من رسله من يشاء রাসূলগণের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তাকে ইলমে গায়েব দান করেন। সুতরাং আল্লাহর ইচ্ছায় রাসূলগণের মাঝে ইলমে গায়েব থাকতে পারে।

#পবিত্র কুরআনের সবগুলো আয়াতের প্রতি আমাদের ঈমান রাখতে হবে। ইলমে গায়েবের ২টি রাস্তা বিদ্যমান, ১/ গায়েব ২ প্রকার, (ক) জাতি, (খ) আতায়ী। জাতি গায়েব সম্পর্কে নাযিল হয়েছে: لا اعلم الغيب বা এরকম আয়াত সমূহ।

*আর আতায়ী গায়েব সম্পর্কে নাযিল হয়েছে الا من ارتضى من رسلا বা অন্য সকল আয়াতসমূহ। এই হিসাবে নবী করিম (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) আতায়ী গায়েব জানেন। ২/ নিষেধাজ্ঞা সূচক আয়াতগুলো الا من ارتضى من رسلا ইত্যাদি الكن الله يجتبى من رسله من يشاء এরূপ আয়াত দ্বারা হয় রহিত করা অথবা ঐ আয়াতের উপর যিয়াদা করে নবী-রাসূলগণের ইলমে গায়েব কে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

#এখানে আরেকটি বিষয় জানা দরকার যে, وما ادرى ما يفعل بى ولا بكم *অর্থাৎ, আমি জানিনা আমার সাথে ও তোমাদের সাথে কিরূপ ব্যবহার করা হবে। এই আয়াত দ্বারা কি বুজানো হয়েছে? এই আয়াত দ্বারা ওহাবীরা প্রমান করতে চান নবী নিজেই জানেনা নিজের সাথে কিরুপ ব্যাবহার করা হবে তাহলে তিনি গায়েব জানেন কিভাবে? অথচ তাদের জানা নেই এই আয়াত মানছুক বা রহিত যেমনঃ ইবনে আব্বাস (রাঃ) [যিনি নবীজির আপন চাচাত ভাই এবং রঈছুল মোফাছ্ছেরীন] ও হজরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) প্রমুখ সাহাবীরা বর্ণনা করেন: وما ادرى ما يفعل بى ولا بكم *এই আয়াতটিকে انا فتحنا لك... আয়াত দ্বারা রহিত করা হয়েছে (মোল্লা আঃ রহমান ইবনে মুহাম্মদ দামেশ্কী (রঃ) কৃত "রিসালায়ে নাছিক ও মানসুক; তাফসিরে কবির, তাফছিরে দুররে মানছুর, তাফছিরে আবু সাউদ ইত্যাদি)।

*সুতরাং আয়াতটি মানছুক বা রহিত, তাই রহিত কোন আয়াত দিয়ে দলিল দেওয়া মূর্খতা ছাড়া কিছু নয়। এছাড়াও প্রিয় নবীজি (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) বলেছেন, হাশরের দিন উম্মতদেরকে শাফায়াত করবেন এবং নবীজির সাথে কিরুপ ব্যবহার হবে তাও বলেছেন। নবীজিকে আল্লাহ 'মাকামে মাহমুদ' বা হাওজে কাওছার দান করবেন।

#তাফছিরে খাজেন শরিফে উলেখ আছে: لما نزلت هذه الاية فرح المشركون فقالوا واللات والعزى ما امرنا وامر محمد الا واحد وما له علينا من مزية وفضل যখন এই আয়াত নাযিল হল, তখন মুশরিকরা খুশিতে আত্মভোলা হয়ে বলতে লাগল তাহলেত আমাদের মাঝে ও মুহাম্মদের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই (তাহলে বুঝা গেল, নবীজির জ্ঞান কম একথা শুনে খুব খুশি হওয়া মুশরিকদের কাজ) তখন নাযিল হল فانزل الله عز وجل ليغفرلك الله ما تقدم من ذنبك.... *আল্লাহ আপনার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল উম্মতের গোনাহ হতে হেফাজত রাখবেন। فقالت الصحبة هنيئا لك يا نبى الله قد علمت ما يفعل بك فما ذا يفعل بنا তখন সাহাবীরা বললেন: হুজুর আপনাকে মুবারকবাদ! আপনিত জেনে গেলেন আপনার সঙ্গে কি ব্যবহার করা হবে। কিন্তু আমাদের কি গতি হবে? তখন নাযিল হল فانزل الله ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنت..... *অর্থাৎ, মুসলামান পুরুষ ও নারীদের (আল্লাহ) জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। এরপর নাযিল হয় وانزل وبشر المؤمنين بان لهم من الله فضلا كبيرا وهذا قول انس وقتادة وعكرمة قالوا انما هذا قبل ان يخبر بغفران ذنبه وانما اخبر بغفران ذنبه عام الحديبية فنسخ ذلك আপনি মু'মিনদের সুসংবাদ দেন তাঁদের জন্য রয়েছে বিশেষ মেহেরবাণী। হযরত আনাছ (রাঃ) ও কাতাদা (রাঃ), ইকরিমা (রাঃ), এই মত পোষণ করেছেন। তাঁরা সবাই একমত যে, আয়াতটি রহিত হয়েগেছে। (তাফছিরে খাজেন শরিফ)।

***এজন্যই বিশ্ব ওলী খাজা বাবা ফরিদপুরী (কুঃ ছেঃ আঃ) বলেছেন ঃ-

মো'মেন আলাহর নূরে দেখেন (সহি তিরমিজি) আর হযরত মাওলানা রুমী (রঃ) ছাহেব বলেন, যিনি আলাহর নূরে দেখেন, তিনি জাহিরী-বাতেনী সকল কিছুই দেখিতে পান (২২ নং বই, পৃঃ ৫৮)।

*তিনি খাজা এনায়েপুরী (রঃ) ব্যাপারে আরোও বলেন: তদীয় জ্ঞান ছিল আল্লাহ তা'লার নূর হইতে প্রাপ্ত, তাই পৃথিবী তথা সৃষ্টি জগতের সকল প্রকাশ্য ও গোপন বিষয়ে তাহার জ্ঞান ছিল (আমাদের তুলনায়) অসীম।

*সুতরাং প্রমান হয়ে গেল, রাসূলে করিম গায়েব জানেন আর তা হল গায়েবে আতায়ী।

*যেসকল ফকিহ্ ও মুজতাহিদগণ এ আকিদার পক্ষে ছিলেন:-

#ঈমামে আজম আবু হানিফা (রাঃ), [মুজতাহিদ],
#ঈমাম মালেক রব্বানী (রাঃ), [মুজতাহিদ্]
#আল্লামা ঈমাম ফখরুদ্দিন রাজী (রাঃ), [ফকিহ্];
#আল্লামা ঈমাম ইসমাঈল হাক্কী (রঃ), [ফকিহ্]
#ঈমাম আহমদ ইবনে মুহাম্মদ হাম্বলী (রাঃ), [মুজতাহিদ্];
#আল্লামা আবুল আলুছি বাগদাদী আল হানাফী- (রঃ), [ফকিহ্]
#আল্লামা শাহ ওয়ালীউল্লাহ মোহাদ্দেস দেহলভী (রঃ), [ফকিহ্];
আল্লামা শাহ আঃ আজিজ মোহাদ্দেছে দেহলভী (রঃ), [মুজতাহিদ্]
#আল্লামা শেখ আব্দুল হক্ব মোহাদ্দেছে দেহলভী (রঃ), [ফকিহ্];
আল্লামা ঈমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বোখারী (রাঃ), [মুজতাহিদ্]
আল্লামা ঈমাম আবু দাউদ (রঃ), [ফকিহ্];
আল্লামা ঈমাম জালালুদ্দিন ছিয়ূতী (রাঃ), [মুজতাহিদ্]
#ঈমাম তিরমিজি (রঃ), [ফকিহ্];
#আল্লামা ঈমাম ইবনে হাজর আসকালানী (রাঃ), [মুজতাহিদ্]
#আল্লামা ঈমাম মুসলীম (রঃ), [ফকিহ্];
হযরত মোজাদ্দেদ আলফেছানী (রাঃ), [মুজতাহিদ্]
#আল্লামা ঈমাম গাজ্জালী (রঃ), [ফকিহ্];
মাওলানা আঃ হাই লাখনভী (রঃ), [ফকিহ্]
#আল্লামা ঈমাম বায়হাকী (রঃ), [ফকিহ্];
আল্লামা ঈমাম বুচিরী (রঃ), [ফকিহ্]
#আল্লামা জালালুদ্দিন রুমী (রঃ), [ফকিহ্];
#ঈমাম বুরকারী (রঃ), [ফকিহ্]
আশরাফ আলী থানভী সাহেব;
#আল্লামা ঈমাম কুস্তলানী (রঃ), [ফকিহ্];
#মাওলানা রশিদ আহমদ গাংগুহী;
আল্লামা ক্বাজী আয়্যাজ (রঃ), [ফকিহ্];
#মাওলানা আবুল কাসেম নানুতুবী সাহেব,
#আল্লামা ইব্রাহিম বাজুরী (রঃ), [ফকিহ];
#মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী সাহেব, [আলিম];
#আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রঃ), [ফকিহ্];
#আল্লামা ঈমাম আহমদ রেজা খাঁ বেরলভী (রাঃ), [মুজতাহিদ্];
#আল্লামা আমজাদ আলী আজমী (রঃ), [ফকিহ্];
#আল্লামা আহমদ ইয়ার খান নঈমী (রঃ), [ফকিহ্];
#মাওলানা আবু বকর ফুরফুরাবী (রঃ), [ফকিহ্]
#মাওলানা নেছার আহমদ ছারছিনা (রঃ), [ফকিহ্]

#মাওলানা কেরামত আলী জৈনপুরী (রঃ), [আলিম]
#বিশ্ব ওলী খাজা বাবা ফরিদপুরী (কু: ছে: আ:), [মুজতাহিদ]।

*কুরআন-সুন্নাহ এর দৃষ্টিতেঃ
*পীর মুরিদীঃ

*'পীর' শব্দটি ফারসী শব্দ, যার বাংলা অর্থ হল 'বৃদ্ধ বা মুরব্বী'। পরিভাষায় বলা হয়, যিনি শরিয়ত, তরিকত, হাকিকত ও মারেফত (জাহেরী ও বাতেনী এলেম) এই ৪ বিদ্যার জ্ঞান অর্জন করতে করতে বৃদ্ধ হয়ে গেছেন অথবা এই ৪ বিদ্যার জ্ঞানে জ্ঞানী হয়ে গেছেন, তাকেই পীর বলে। পবিত্র কোরআনে এরকম লোককে 'মুর্শেদ ও হাদী' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বিশ্ব ওলী খাজাবাবা ফরিদপুরী (কুঃ ছেঃ আঃ) বলেন "যে বা যাহারা জ্ঞানের দুই ধারা তথা এলমে হুছুলী ও এলমে হুজুরীর পরিপূর্ণ জ্ঞান বৃদ্ধ তিনি বা তাহারাই পীরে কামেল হিসেবে পরিচিত (কামেল পীরের আবশ্যকতা, পৃঃ নং ৫৮)।

*সুতরাং, যাদের 'এলমে জাহের' ও 'এলমে বাতেন' এই দুই প্রকার এলেম অর্জন করতে পারবে তাঁরাই কামেল পীর। এজন্যে'ই ইসলামে দুই রকম এলেম বিদ্যমান। যেমন হাদিসে উল্লেখ আছেঃ

#দলিলঃ عن الحسن قال العلم علمان فعلم فى القلب فذاك علم النافع وعلم على اللسان فذاك حجة الله *অর্থাৎ, হজরত হাছান বছরী (রাঃ) বর্ণনা করেন, এলেম দুই প্রকার যথাঃ ক্বালবের এলেম যা উপকারী এলেম, এবং আরেকটি হল জিহ্বার এলেম যা আল্লাহর দলিল (মেসকাত শরিফ, এলেম অধ্যায়, ৩৭ পঃ; মেরকাত, ১ম খন্ড, ৪৭৮ পৃঃ; দারেমী শরিফ, ১ম খন্ড, ১১৪ পৃঃ; আশিয়াতুল লুমআত)।

#দলিলঃ عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم علمان فعلم فى القلب وذلك العلم النافع وعلم على اللسان فذلك حجة الله على ابن ادم *অর্থঃ হজরত জাবের (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) বলেছেনঃ এলেম দুই প্রকার, এক প্রকার এলেম হল ক্বাল্বের এলেম আর ইহাই উপকারী এলেম। আরেক প্রকার এলেম হল জিহ্বার এলেম যা আল্লাহ তা'লার দলিল (কানজুল উম্মাল, ১০ খন্ড, ৫৮ পৃঃ; মুছান্নাফে ইবনে আবী শায়বাহ; হাকেম)।

#দলিলঃ عن عبد بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم علمان فعلم فى القلب فذاك العلم النافع وعلم على اللسان فذاك حجة الله *অর্থাৎ, হজরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) বলেছেনঃ এলেম দুই প্রকার যথাঃ ক্বালবের এলম যা উপকারী এলেম, এবং আরেকটি জিহ্বার এলেম যা আল্লাহর দলিল (আত্তারগীব ওয়াত্তারহীব, মরফু সনদে)।

*এ ব্যাপারে আরোও উল্লেখ আছেঃ

#দলিলঃ عن ابى هريرة (رض) قال حفظت من الرسول الله صلى الله عليه وسلم وعائين فاما احدهما فبثثته واماالاخر فلوبثثته قطع هذا البلعوم *অর্থাৎ, হজরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) এর কাছ থেকে দুই প্রকার এলেম অর্জন করেছি, এক প্রকার এলেম আমি মানব সমাজে প্রচার করি, আরেক এলেম যদি আমি মানব সমাজে প্রচার করি তাহলে লোকেরা ধরে আমার কণ্ঠনালী কেটে ফেলবে (সহি বুখারী, ১ম খন্ড, ২২ পৃঃ; ফাতহুল বারী; উমদাদুল ক্বারী)।

*এই দুই প্রকার এলেম যার কাছে আছে তাঁকেই বলা হয় 'কামেল পীর'। আর কামেল পীরের কাছে যিনি বায়াত হন তাকে প্রচলিত ভাষায় বলা 'মুরিদ'। 'মুরিদ হওয়া' কথাটি পবিত্র কোরআনের ভাষায় হল 'বায়াত হওয়া'। সুতরাং, প্রচলিত 'পীর' হন কোরআনের ভাষায় 'মুর্শিদ'। আর মুর্শিদ বা পীর তিনিই হবেন যিনি খেলাফত প্রাপ্ত হন। অর্থাৎ, পর্যায়ক্রমে রাসূলে পাক (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) এর খলিফা হবেন। যেনে রাখা আবশ্যক যে, রাসূলে পাক (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) এর খলিফার নিকট বায়াত বা মুরিদ হওয়া ওয়াজিব।

*বায়াত হওয়ার অনেক দিক রয়েছে যেমন:
১/ যে কোন ভাল কাজ করা ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য,
২/ জেহাদের ময়দানে যুদ্ধ করার জন্য,
৩/ খোদা প্রাপ্তিত্ব জ্ঞান তথা বাতেনী জ্ঞান হাছিল করার জন্য ইত্যাদি।

*বিস্তারিতঃ

*১/ যে কোন ভাল কাজের জন্য ও মন্দ কাজ থেকে ফিরে থাকার জন্য সাহাবীগণ প্রিয় নবীজির কাছে বায়াত হয়েছেন। যেমন:

#দলিলঃ يا يها النبى اذا جاءك المؤمنت يبا يعنك على ان لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين... *অর্থাৎ, ওহে আমার নবী! যখন আপনার কাছে মু'মিন মহিলারা বায়াত হতে আসবে এই মর্মে যে, আল্লাহর সাথে শিরিক করবে না, চুরি করবে না, যিনা করবেনা......(সূরা মুমতাহিনা, ১২ নং আয়াত)।

#দলিলঃ ان عبد الله بن عمر قال كنا اذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما استطعتم *অর্থঃ হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) বলেছেন, আমরা যখন রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) এর নিকট তাঁর কথা শ্রবণ করব এবং মেনে চলব বলে বায়াত গ্রহন করতাম তখন তিনি বলতেন, তোমরা যা পার (মুয়াত্তায়ে ঈমাম মালেক, ৩৮৫ পৃঃ; মেসকাত, ৩১৯ পৃঃ; সহি বুখারী,

হাঃ নং ৭১৪৪; সহি মুসলীম; মুসনাদে আহমদ, ১৭/২; আবু দাউদ, হাঃ নং ২৬২৬; মেরকাত, ৭ম খন্ড, ২২৫ পৃঃ) সনদ সহি।

*সুতরাং যে কোন ভাল কাজের জন্য মন্দ কাজ থেকে দূরে থাকার জন্য বায়াত তথা মুরিদ হওয়া জায়েয।

*২/ জেহাদের ময়দানে যুদ্ধ করার জন্যও সাহাবীগণ প্রিয় নবীজির কাছে বায়াত হয়েছেন। যেমন:

#দলিলঃ عن انس بن مالك قال كان الانصار يوم الخندق تقول نحن الذين بايعوا محمد على الجهاد ما حيينا ابدا *অর্থাৎ, হজরত আনাছ (রাঃ) বলেন, আনছার লোকেরা বলতোঃ আমরা খন্দকের যুদ্ধের দিন নবী পাকের নিকট জিহাদের জন্য বায়াত গ্রহণ করেছি, যতদিন আমরা বেঁচে থাকব ততদিনের জন্য (সহি বুখারী শরিফ)।

*৩/ শরিয়ত, তরিকত, হাকিকত ও মারেফত তথা জাহেরী ও বাতেনী এই দুই বিদ্যা অর্জনের জন্য বায়াত হওয়াও ওয়াজিব। যেমনঃ

#দলিলঃ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم *অর্থঃ রাসূলে পাক (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) বলেছেন: এলেম অর্জন করা প্রত্যেক মুসলীম নর নারীর জন্য ফরজ (ইবনে মাজাহ, হাঃ নং ২২৪; বায়হাক্বী শুয়াইবুল ঈমান; মেসকাত শরিফ, ৩৪ পৃঃ; তাফছিরে মাজহারী, ৪র্থ খন্ড, ২৯৮ পৃঃ; 'ইবনে আদী' সহি সনদে; কানজুল উম্মাল, ১০ম খন্ড, ৬০ পৃঃ; মেরকাত, ১ম খন্ড, ৪৩৬ পৃঃ; মাসাবিহুছ সুন্নাহ, ১ম খন্ড, ৩৯ পৃঃ)।

*ঈমামে আজম তাঁর কিতাবে উল্লেখ করেনঃ عن عبد الله (رض) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل نسلم *অর্থঃ হজরত আব্দুল্লাহ (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) বলেনঃ এলেম অর্জন করা সকল মুসলমানের জন্য ফরজ (মুসনাদে ঈমামে আজম; ইবনে আদী; তাফছিরে মাজহারী, ৪র্থ খন্ড, ২৯৯ পৃঃ; জামেউছ ছাগীর, ২য় জিঃ ৩২৫ পৃঃ) সহি সনদে।

*দলিলঃ عن ابى هريرة (رض) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم *অর্থঃ হজরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলে করিম (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লিম) বলেছেন: এলেম অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরজ (মুসনাদে ঈমামে আজম; বায়হাক্বী; তাফছিরে মাজহারী, ৪র্থ খন্ড, ২৯৯ পৃঃ) সহি সনদে।

#দলিলঃ عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم *অর্থঃ হজরত আনাছ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লিম) বলেছেন: এলেম অর্জন করা প্রত্যেক

মুসলমানের জন্য ফরজ (তাবারানী 'আওছাতে' ২য় খন্ড, ৪৮ পৃঃ; কাশফুল খফা, হাঃ নং ১৬৬৫)।

*লক্ষ্য করুন, বলা হয়েছে এলেম অর্জন করা ফরজ, কিন্তু নির্দিষ্ট করে বলা হয়নি যে জাহেরী এলেম, নাকি বাতেনী এলেম। সুতরাং এই হাদিসে উভয় প্রকার এলেমই বুজানো হয়েছে, কারন علم শব্দটি مطلق /عام বা অনির্দিষ্ট। আর উভয় প্রকার এলেম অর্জন করা ফরজ।

#দলিলঃ واما العلم اللدنى الذي يسمون اهلها بالصوفية الكرام فهو فرض عين *অর্থাৎ, সূফী সাধকগণের মাধ্যমে আরেক প্রকার 'এলমে লাদুন্নীর' কথা শুনা যায় ইহা অর্জন করাও ফরজে আইন (তাফছিরে মাজহারী, ৪র্থ খন্ড, ২৯৯ পৃঃ)।

*সুতরাং জাহেরী বিদ্যার পাশাপাশি বাতেনী এলেম অর্জন করাও ফরজে আইন। জাহেরী এলেম অর্জনের জন্য যেমন উস্তাদ প্রয়োজন তেমনি বাতেনী বিদ্যা অর্জনের জন্যও ঐরকম জ্ঞানী তথা কামেল পীরের প্রয়োজন।

*কোন ফরজ কর্ম সম্পাদনের জন্য যদি কোন মাধ্যমের প্রয়োজন হয়, তাহলে ঐ মাধ্যমটিও ফরজ বলে স্বীকৃতি পায়। সুতরাং এলমে বাতেন হাছিলের জন্য কামেল পীরের প্রয়োজন তাই ঐ এলেম হাছিলের জন্য পীরের আনুগত্য করাও ফরজ। এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেনঃ

#দলিলঃ يا ايها الذين امنوا اطعوا الله واطعوا الرسول واولى الامر منكم *অর্থঃ হে ঈমানদার সকল! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর এবং ওলিল আমরগণের আনুগত্য কর (সূরা নিসা, ৫৯ নং আয়াত)।

*এই আয়াতে আল্লাহ ও রাসূলের সাথে আরেকটি সম্প্রদায়ের কথা আছে যারা হল 'ওলিল আমর, যাদের আনুগত্য করাও আল্লাহর নির্দেশ তথা ফরজ। এখন প্রশ্ন হল 'ওলিল আমর' কারা?

***ওলিল আমরের ব্যাখ্যায় তাফছিরের কিতাবে উল্লেখ আছেঃ**

#দলিলঃ قال ابن عباس و جابر رضى الله عنهم قال هم الفقهاء والعلماء *অর্থঃ রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) এর আপন চাচাত ভাই, রইছুল মোফাচ্ছেরীন ও বিশিষ্ট ফকিহ সাহাবী হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) এবং হজরত জাবের (রাঃ) বলেন: তাঁরা হল ফোক্বাহা ও উলামাগণ (তাফছিরে খাজেন, ১ম খন্ড, ৩৯ পৃঃ)।

*এখন, ফোকাহা হল মুজতাহিদ তবকার-ফকিহগণ। ঐ রকম ফকিহদের ৭টি তবকা রয়েছে, আর সকল তবকার ফকিহদের আনুগত্য করা (অবস্থা ভেদে) ফরজ।

*উলামা হল, যারা আল্লাহকে সর্বদা ভয় করেন। যেমন, আল্লাহ তা'লা বলেনঃ انما يخشى الله من عباده العلماء *অর্থঃ, নিশ্চয় উলামা বা আলিমগণই আল্লাহকে ভয় করেন (আল কোরআন)।

*এই আয়াতের তাফছিরে উল্লেখ আছেঃ عن ابن عباس رضى الله عنهما (انما يخشى الله من عباده العلماء) قال من يخشى الله فهو عالم *হজরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, এই আয়াতের তাফছির করে বলেন: যারা আল্লাহকে ভয় করে তাঁরাই আলিম (দারেমী শরিফ, ১ম খন্ড, ১০৮ পৃ:)।

*সুতরাং পবিত্র কোরআনের আয়াত দ্বারা প্রমান মুজতাহিদ্ তবকার ফকিহ্ ও তাক্বওয়াশীল আলিম তথা খোদাভীতু আলিমের অনুসরন করা ফরজ।

*এখন তাক্বওয়াশীল আলিম কারা ? এর জবাবে পবিত্র কোরআনে আরোও উল্লেখ আছেঃ

#দলিলঃ الا ان اولياء الله لاخوف عليهم ولهم يحزنون والذين امنوا وكانوا يتقون *অর্থঃ সাবধান! নিশ্চয় আল্লাহর ওলীগণের কোন ভয় নেই এবং তাঁরা চিন্তাগ্রস্থও হবেনা। আর তাঁরাই ঈমান এনেছে ও আল্লাহকে ভয় করে বা তাক্বওয়াশীল (সূরা ইউনূছ, ৬২-৬৩ নং আয়াত)।

*সুতরাং আল্লাহর ওলীগণই হল ঐ তাক্বওয়াশীল বা খোদাভীতু আলিম যারা আল্লাহকে ভয় করে। স্পষ্ট প্রমান হয়ে গেল, আল্লাহর ওলীগণই আল্লাহ্কে ভয় করে, আর যারা আল্লাহ্কে ভয় করে তাঁরাই আলিম। সুতরাং আল্লাহর ওলীগণই 'ওলীল আমরের' অন্তর্ভূক্ত। সুতরাং আল্লাহর ওলীগণ তথা কামেল পীরের অনুসরন করা ফরজ। অনুসরণের আরেক রুপ হল তাঁদের নিকট বায়াত বা মুরিদ হওয়া, তাঁদের দেখানো পথে চলা।

** يا يها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسلة *অর্থঃ হে ঈমানদার সকল! তোমরা আমাকে ভয় কর এবং আমার প্রতি ওছিলা তালাশ কর.....(সূরা মায়েদা, ৩৫ নং আয়াত)।

*এই আয়াতে আল্লাহর প্রতি ওছিলা তালাশ করার জন্য তাকিদ তথা হুকুম দেওয়া হয়েছে। এখন, ওছিলা কি? এ ব্যাপারে তাফছিরের দিকে নজর করা দরকার। লক্ষ্য করুন:

#দলিলঃ لا يحصل الا بالوسيلة- وهى علماء الحقيقة ومشايخ الطريقة *অর্থঃ আল্লাহকে উছিলা ব্যতিত হাছিল করা না। সেই উছিলা হল ওলামায়ে হাক্বিক্বী এবং ত্বরিকতের মাসায়েখগণ (তাফছিরে রুহুল বয়ান, ২য় খন্ড, ৪৫০ পৃ:; ক্বাউলুন জামিল)।

*সুতরাং, আল্লাহকে তালাশ করতে উছিলা হিসেবে ত্বরিকতের মাসায়েখগণের কাছে বায়াত হওয়া ওয়াজিব।

#দলিলঃ انه لا سبيل الى الله تعالى الا بمعلم يعلمنا معرفته ومرشد يرشدنا الى العلم به *অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহর প্রতি (বান্দার) কোন রাস্তা

নেই তবে তাঁর মারেফাত জানা ব্যতিত, আর মুর্শিদে কামেল এই মারেফাতের এলেম শিক্ষা দেন (তাফছিরে কবির শরিফ, ১১ তম খন্ড, ১৮৯ পৃ: উক্ত আয়াতের তাফছিরে)।

*সুতরাং খোদা তা'লার মারেফাত লাভ করতে হলে অবশ্যই মোর্শেদে কামেল প্রয়োজন।

*** اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيلة ايهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه (সূরা বনী ইসরাইল)।

*অর্থঃ ঐ মকবুল বান্দাগণ, মুর্তিপূজারীরা যাঁদের উপাসনা করছে, তাঁরা নিজেরাই স্বীয় প্রভূর নিকট উছিলা তালাশ করতেন যে, তাঁদের মধ্যে কে আল্লাহর নিকটবর্তী, তাঁর রহমতের প্রত্যাশী ও আল্লাহর আযাবকে ভয় করে (সূরা: বনী ইসরাইল, ৫৭ নং আয়াত)।

*এই আয়াত দ্বারা দিবালোকের ন্যায় প্রমান হয়ে যায়, পূর্বের যুগের নেক বান্দাগণও আল্লাহর নিকটবর্তী বান্দাদেরকে উছিলা হিসেবে অনুসরণ করতেন। কিন্তু দূর্ভাগ্যবশত কিছু সংখ্যক লোক, ঐ নেক বান্দাদেরকে পূজা করা শুরু করেছিল। আর এই কথাটাই আল্লাহ্ এভাবে বলছেন: কাফেররা যাদেরকে ইলাহ যেনে পূজা করছে, তাঁরাই তাঁদের মধ্যে নেক বান্দাদের উছিলা তালাশ করত, যারা আল্লাহর রহমতের প্রত্যাশী ছিল এবং আল্লাহর আযাবকে অধিক ভয় করতেন।

*এই আয়াতে যাঁরা নেক বান্দাগণকে উছিলা করতেন তাঁদেরকে তিরস্কৃত করা হয়নি কারন তাঁরা আল্লাহর রহমতের প্রত্যাশী ও আযাবের ভয়কারী বরং যারা নেক বান্দাদেরকে ইলাহ যেনে পূজা করত তাদেরকে তিরস্কৃত করা হয়েছে। কারন যাদেরকে ওছিলা ধরা হত তাঁরা হল: قال ابن عباس و مجاحد : وهم عيسى وامه وعزير والملائكة...... *অর্থাৎ, ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও মুজাহিদ (রঃ) বলেন: তাঁরা হল ঈসা (আঃ) এবং তাঁর সম্মানিতা মা বিবি মরিয়ম (আঃ), উজাইর (আঃ), ফেরেস্তারা .... (তাফছিরে মায়ালেমুত্তানজিল, ৩য় খন্ড, ২৯৪ পৃ:; তাফছিরে খাজেন শরিফ, ৩য় খন্ড, ১৩৪ পৃ:; তাফছিরে তাবারী শরিফ, ১৫ তম খন্ড, ১০৫ পৃ:)।

*সুতরাং যারা পূজা করত তারা তিরস্কৃত হবে, কিন্তু 'যাদেরকে' পূজা করা হত তাঁরা তিরস্কিত হবে না, কারন তাঁরা হল আল্লাহর নবী হজরত ঈসা (আঃ) ও তাঁর সম্মানিতা মা মরিয়ম (আঃ), হজরত উজাইর (আঃ) প্রমুখ নবীগণ ও ফেরেস্থাগণ। আর ঐ নবীগণই অন্য নবীদিরকে আল্লাহর প্রতি উছিলা করতেন। তাই বলা যায়, নেক বান্দাগণকে উছিলা হিসেবে অন্বেষণ করা পূর্বেও যুগের নেক বান্দাগণের (নবী-রাসূলগণের) সুন্নাত। যেমন আমাদের নবী পাক (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) দোয়া শিক্ষা দিয়েছেন:

#দলিলঃ اللهم انى اسالك بحق السائلين *অর্থাৎ, হে আল্লাহ! প্রার্থনা কারীদের (নবীগণের) উছিলায় তোমার কাছে প্রার্থনা করছি (বায়হাক্বী শরিফ,

তাফছিরে রুহুল মায়ানী, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৪১৯ পৃ:; ইবনে মাজাহ, হা: নং ৭৭৮; মুসনাদে আহমদ, হা: নং ১১১৭; মুছান্নাফে ইবনে আবী শায়বাহ, ২৯২০২ নং হা:; ইবনে জাইদ তাঁর মুসনাদে, হা: নং ২০৩১; মুসনাদে আবু নুয়াইম, ইবনে কাইয়ুম কৃত: যাদুল মায়াদ কিতাবে) হাদিসটি সহি।

*তাই আল্লাহর প্রিয় বান্দাগণকে উছিলা হিসেবে অন্বেষন করা আমাদের নবী এবং অন্য নবীগণের সুন্নাত।

*পবিত্র কোরআনের পরিপূর্ণ জ্ঞান অর্জন করতে হলে অবশ্যই কামেল মোর্শেদের কাছে বায়াত হতে হবে। কার পবিত্র কোরআনে দুই ধরণের এলেম রয়েছে, যেমন: قال رسول الله (ص) انزل القران سبعة احرف لكل اية منها ظهر وبطن *অর্থ: রাসূলে পাক (দঃ) বলেছেন: পবিত্র কোরআনসাত হরফে নাজিল হয়েছে আর প্রত্যেক আয়াতের দুটি দিক রয়েছে জাহিরী ও বাতিনী (মাসাবিহুছ সুন্নাহ, ১ম খন্ড, ৪১ পৃ:; মেসকাত শরিফ, ৩৫ পৃ:; শরহে সুন্নাহ; মেরকাত, ১ম খন্ড, ৪৫০ পৃ: তাবারানী তাঁর আওছাতে; মুসনাদে বাজ্জার শরিফ; জামেউছ ছাগীর, ১ম জি: ১৬৩ পৃ:)।

*পবিত্র কোরআনের জাহিরী জ্ঞান অর্জনের জন্যে যেমন মাদ্রাসায় গিয়ে উস্তাদের স্বরণাপন্য হতে হয়, তেমনিভাবে কোরআনের বাতিনী দিক অর্জনের জন্যে কামেল পীরের স্বরণাপন্য হতে হবে যেহেতু তাঁরা ঐ জ্ঞানে জ্ঞানী।

*সর্বোপরি আল্লাহর ওলীগণই সত্যবাদী (ছিদ্দীক) ও সঠিক পথের অনুসারী (ছালেহীন)। কারন চার শ্রেণীর লোক আল্লাহর নেয়ামত প্রাপ্ত যথা: فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبين والصدقين والشهداء والصلحين *অর্থাৎ নেয়ামত প্রাপ্ত হল নবীগণ, ছিদ্দীকগণ, শহীদগণ ও ছালেহীনগণ (সূরা নিছা: ৬৯)।

*পবিত্র কোরআনে আল্লাহ বলেন: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكنوا مع الصدقين *অর্থঃ হে ইমানদার সকল! তোমরা আমাকে ভয় কর, এবং সত্যবাদীদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাও (আল কোরআন)।

*সুতরাং হক্কানী ও কামেল পীরের কাছে সত্যবাদী হিসেবে (বায়াতের মাধ্যমে) তাঁদের অন্তর্ভূক্ত হওয়া আল্লাহ পাকের নির্দেশ।

*অপর আয়াতে আল্লাহ পাক বলেন: يا يتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلى فى عبادى وادخلى جنتى *অর্থঃ হে নফছে মোতমাইন্নাহ! তোমার রবের প্রতি ধাবমান হও, তিনি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট আছেন। সেই জন্যে আমার বিশিষ্ট বান্দাদের মধ্যে প্রবেশ কর, এবং জান্নাতে প্রবেশ কর (সূরা ফজর, ২৭-৩০)।

*এই আয়াতেও আল্লাহর বিশিষ্ট বান্দাগণের অন্তর্ভূক্ত হওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নেক বান্দাগণের অন্তর্ভূক্ত হতে হলে তাঁদের কাছে বায়াত একান্তই জরুরী।

*আল্লাহ পাক আরাও বলেন: فسئلوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون *অর্থঃ যে সব বিষয়ে তোমরা জাননা সেসব বিষয়ে আহ্‌লে জিকিরের কাছে জিজ্ঞাসা কর (আল কোরআন)।

*মারেফাতের ব্যাপারে যারা অজ্ঞ তারা অবশ্যই ঐ জ্ঞানের জন্য আহ্‌লে জিকিরের কাছে বায়াতের মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন করতে হবে। কেননা আল্লাহ বলেছেন 'যা জাননা তা জেনে নাও' এখন না জানার ভিতর এলমে মারেফাত অন্যতম। তাই, না জানা এলমে মারেফাত হাছিল করতে হলে ঐ জ্ঞানে জ্ঞানীদের কাছে জিজ্ঞাসা করতে হবে, ইহা আল্লাহর হুকুম। 'আহ্‌লে জিকির' তাঁরাই, যাদের দশ লতিফা জাগ্রত ও জিকির রত এবং তেত্রিশ কোটি লতিফার দ্বারা আল্লাহর জিকির জারি আছে।

*আরেক আয়াতে আল্লাহ বলেন: واتبع سبيل من اناب الى *অর্থঃ যে আমার দিকে রুজু তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ কর (আল কোরআন)।

*সুতরাং আল্লাহর ওলীগণই আল্লাহর দিকে রুজু, তাই তাঁদের অনুসরণ করা স্বয়ং আল্লাহর হুকুম।

***বায়াত না হওয়ার কুফলঃ**

*কামেল পীর তথা মুরশীদের আনুগত্য না করলে ও বায়াত না হইলে কি হবে তার জবাবে মহান আল্লাহ বলেন,

#দলিলঃ من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا *অর্থঃ আল্লাহ যাদেরকে পথ দেখান তারাই পথ পায় আর যাদেরকে পথভ্রষ্ট বা গোমরাহ করেন তারা কোন ওলীকে মুর্শিদ হিসেবে পাইবে না (সূরা কাহাফ, ১৭ নং আয়াত)।

*এই আয়াতে স্পষ্ট বলা হয়েছে যারা ওলীদেরকে মুর্শিদ হিসেবে ধরেনা তারা পথভ্রষ্ট ও গোমরাহ।

#দলিলঃ ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا *অর্থাৎ, আল্লাহ যাদেরকে গোমরাহ করেন তারা কোন ত্বরিকা বা রাস্তা খোজে পাবেনা (সূরা নিসা, ১৪৩ নং আয়াত)।

*সুতরাং যারা ত্বরিকা মানেনা তারা পথভ্রষ্ট, ইহা মহান আল্লাহর ফতুয়া।

#দলিলঃ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وليس فى عنقه بيعة مات ميتة الجاهلية *অর্থঃ যারা মারা গেল অথচ বায়াতের রশ্মি তার গলায় জুলন না সে যেন জাহেলীদের মত মারা গেল (মুসলীম শরিফ; মেসকাত, ৩২০ পৃ:; মেরকাত, ৭ম খন্ড, ২৩৪ পৃ:; মুসনাদে আহমদ, ১৫৪/২; আশিয়াতুল লুমআত)।

*এই হাদিস দ্বারা প্রমান হয়ে যায়, বায়াত না হয়ে মারা গেলে জাহেলীদের মতই মারা যাবে।

#দলিলঃ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات ولا بيعة عليه مات ميتة الجاهلية *অর্থঃ যে মারা গেল কিন্তু বায়াত হইল না, সে জাহেলীদের মত মারা গেল (তাবারানী মুজামুল কবির, ৬ষ্ঠ খন্ড, ২৯৭ পৃ:)।

*এই হাদিস দ্বারাও প্রমানিত বায়াত না হইলে সে জাহেলীদের (যারা জাহান্নামী) মতই মারা যাবে।

*পীর ইন্তেকালের পরে তাঁর কাছে বায়াতঃ

*রাসূলে করিম (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) এর খলিফা গণের ইন্তেকালের পরেও তাঁদের কাছে বায়াত বা মুরিদ হওয়া যায়। যদি সে প্রকৃত আল্লাহর ওলী হয়ে থাকেন।

*যে মুরিদ হওয়ার বাসনা রাখবে, সে পীরের মাজারের কাছে মোরাকাবা করবে এবং দৃঢ় সংকল্পতার সাথে পীরের নির্দেশের আনুগত্যের ও খারাপ কাজ থেকে দূরে থাকার ওয়াদাবদ্ধ হবে। বিশ্বাস রাখতে হবে যে, ঐ সময় সে কি ওয়াদাবদ্ধ হয়েছে তা অবশ্যই মাজারস্থ আল্লাহর ওলী দেখেন ও শুনেন। আর এ ব্যাপারে পবিত্র হাদিসে বলা আছে:

#দলিলঃ বদর যুদ্ধের শহীদগণের মাজারের কাছে দাড়িয়ে প্রিয় নবীজি (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) শহীদানদের সাথে কথা বলতেছিলেন। হজরত উমর (রাঃ) রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) কে বললেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি এমন একদল লোকের সাথে কথা বলছেন, যারা লাশ হয়ে পরে আছে। রাসূলে করিম (ছালালাহু আলায়হি ওয়া ছালাম) বললেন: যে মহান সত্ত্বার হাতে আমার জীবন তাঁর শপৎ করে বলছি, আমি যে সব কথা বার্তা বলছি তা ওদের চেয়ে তোমরা মোটেও বেশী শুনছ না (আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া, ১ম খন্ড, ৩১৮ পৃ:) হাদিসটি সহি।

*সুতরাং আল্লাহর প্রিয় বান্দারা ইন্তেকালের পরেও পৃথিবীর যাবতীয় অবস্থা দেখতে ও শুনতে পারে। এরেই প্রেক্ষিতে উল্লেখ আছে: الموتى يعلمون بزوارهم *অর্থঃ মৃত ব্যক্তি যেয়ারত কারীকে চিনেন (ফাতুয়ায়ে শামী, ৩য় খন্ড, ১৫০ পৃ:)।

*এ ব্যাপারে আরোও উল্লেখ আছে:

#দলিলঃ ان النفوس الزكية القدسية اذا تجردت عن العلائق البدنية عرجت واتصلت بالملا الاعلى ولم يبق لها حجاب فترى الكل كا لمشاهد *অর্থঃ নিশ্চয় পবিত্র আত্মার অধিকারীগণ ইন্তেকালের পরে তাঁদের রূহ দেহ থেকে বের হয়ে উপরের জগতের সাথে মিশে যায়, তখন তাঁদের চোখের সামনে কোন পর্দা থাকেনা, ফলে তাঁরা সব কিছু উপস্থিত লোকের মত দেখতে পায় (মেরকাত শরহে মেসকাত, ৩য় খন্ড, ১১ পৃ:)।

*তাই'ত হাদিস শরিফে উল্লেখ আছে:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا فرسة المؤمنين فانه ينظروا بنور الله

*অর্থাৎ, রাসূলে করিম (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) বলেছেন: তোমরা মু'মিনের অন্তরের দৃষ্টিকে ভয় কর, নিশ্চয় আল্লাহর নূর দিয়ে তাঁরা দেখে (জামে তিরমিজি শরিফ, ২য় খন্ড, ১৪৫ পৃ:; তাফছিরে কাবির শরিফ, ১ম খন্ড, ১২৭ পৃ:; ২৩তম খন্ড, ২৩১ পৃ:; তাফছিরে রুহুল বয়ান, ১ম খন্ড, ৩৯ পৃ:; ৪র্থ খন্ড, ৫৯০ পৃ:; ২য় খন্ড, ৪৫৫ পৃ:; তাবারানী তাঁর "আওছাতে" ২য় খন্ড, ২৯১ পৃ: ও ৬ষ্ঠ খন্ড, ১৯ পৃ:; তাবারানী তাঁর "কবিরে" ১০২/৮, হা: নং ৭৪৯৪; 'মজমুয়ায়ে জাওয়াহেদ' ২৭১/১০; ছেররুল আছরার, ১২২ পৃ:; আলবেদায়া ওয়ান নেহায়া, ২য় খন্ড, ৪০৯ পৃ:; তাফছিরে কুরতবী, ১০ম খন্ড, ৩৪ পৃ:; নাওয়াদেরুল উছুল, ২৭১ নং হা:; তাফছিরে তাবারী, ১৪ তম খন্ড, ৫০ পৃ:)।

*সুতরাং ইন্তেকালের পরেও আল্লাহর ওলীগণ মানুষকে দেখেন ও তাদের কথা শুনেন। তাইত তাঁদের ইন্তেকালের পরেও তাঁদের কাছে ওয়াবদ্ধ বা বায়াত হওয়া যায়। আরেকটি বিষয় লক্ষ্যনীয় যে, কামেল পীর ইন্তেকালের পরেও মুরীদগণকে হেদায়াতের রাস্তা দেখাতে পারেন ও তাঁদেরকে সূলুক আদায়ে এবং যাবতীয় বিষয়ে মুরীদকে সাহায্য করতে পারেন। যেমন:

#দলিলঃ وقد تواتر عن كثير من الاولياء انهم ينصرون اولياءهم ويدمرون اعداءهم ويهدون الى الله تعالى *অর্থঃ অনেক আউলিয়াকেরাম রয়েছে যারা (ইন্তেকালের পরে) আপনজনদেরকে সাহায্য করতে পারে ও শত্রুদেরকে পর্যদস্ত করতে পারে এবং হেদায়াতের রাস্তাও দেখাতে পারেন (তাফছিরে মাজহারী, ১ম খন্ড, ১৭০ পৃ:)।

*ইন্তেকালের পরে আল্লাহর ওলীগণের কাছে বায়াতের মাধ্যমে ছায়ের-ছুলুকের বিভিন্ন বিষয়ে সাহায্য চাওয়া ও পাওয়া যায়। যেমন উল্লেখ আছে:

#দলিলঃ وقال الامام الغزالى من يستمد فى حياته يستمد بعد وفاته *অর্থঃ হুজ্জাতুল ইসলাম আল্লামা ঈমাম গাজ্জালী (রাঃ) বলেন: যার কাছে জিবদ্দশায় (সূলুক আদায়ের জন্য) সাহায্য চাওয়া যায় তাঁর কাছে ওফাতের পরেও সাহায্য চাওয়া যায় (মেসকাত, ১৫৪ পৃ: হা:; আশিয়াতুল লুমআত, যিয়ারত অধ্যায়)।

*আল্লাহর ওলীগণ ইন্তেকালের পরে তুরিকতের ব্যাপারে মুরীদগণকে সাহায্য করার জন্য তাঁদেরকে আল্লাহ একটি নুরের দেহ দান করেন, যার নাম 'ওজুদ মাহব লাহু' কাদ্‌রিয়া তুরিকার ভাষায় 'তেফলুল মায়ানী'। ঐ দেহের ক্ষমতা এত বেশী যে এক মূহুর্তে একাদিক জায়গায় যেতে পারে ও একাদিক শরীরের অধিকারী হতে পারে। যেমন:

#দলিলঃ ولا تباعد عن الاولياء حيث طويت لهم الارض وحصل لهم ابدان مكتسبة متعددة وجدوها فى اماكن مختلفة فى ان واحد *অর্থঃ ওলীগণ একই মূহুর্তে কয়েক জায়গায় বিচরণ করতে পারেন। একই সময়ে তাঁরা একাদিক শরীরের অধিকারীও হতে পারেন (মেরকাত শরহে মেসকাত, باب: ما يقال عند من حضره الموت এই বাবের মধ্যে)।

*এ ব্যাপারে আরোও উল্লেখ আছে: ان الله تعالى يعطي لارواحهم قوة الاجساد فيذهبون من الارض والسماء والجنة حيث يشاؤون وينصرون اولياءهم ويدمرون اعداءهم *অর্থঃ নিশ্চয় আল্লাহ তা'লা তাঁদের রুহ সমূহকে একটি কুওয়াতের দেহ দান করেন। ফলে তাঁরা ঐ দেহ দ্বারা জান্নাত, আসমান ও পৃথিবীর যেখানে খুশি সেখানে যাইতে পারে এবং আপনজনদেরকে সাহায্য করতে পারে ও শত্রুদেরকে পর্যদস্ত করতে পারেন (তাফছিরে মাজহারী, ১ম খন্ড, ১৬৯ পৃ:)।

*সুতরাং প্রকৃত আল্লাহর ওলীগণ ইন্তেকালের পরেও তাঁদের মুরীদগণকে ত্বরিকতের সূনুক আদায়ের জন্য সাহায্য করতে পারে ও লোকদেরকে মুরীদ হিসেবে কবুল করে হেদায়াতের রাস্তা দেখাতে পারেন।

*হজরত খাজা খিজির (আঃ) শরিয়তে ইন্তেকাল করেছেন, তবুও তিনি দুনিয়ার লোকদেরকে সাহায্য করতে পারেন, বিপদের সময় সঠিক পথ দেখাতে পারেন ও ইলমে লাদুন্নি দান করতে পারেন।

*যেমন হজরত বায়জিদ বোস্তামী (কু: ছে: আ:) এর মুরীদ ও খলিফা হল হজরত আবুল হাছান খেরকানী (রাঃ)।

লক্ষ্য করুন!

হজরত বায়জিদ বোস্তামী (রাঃ) এর ইন্তেকালের ৩৯ বছর পরে হজরত আবুল হাছান খেরকানী (রাঃ) এর জন্ম হয়েছে। শিশুকাল থেকে ৮ বছর বয়স পর্যন্ত তিনি মাতৃ কোলে কাটান। ৮ বছর বয়স থেকে ২০ বছর বয়স পর্যন্ত তিনি হজরত বায়জিদ বোস্তামী (রাঃ) এর মাজার যিয়ারত করতেন। প্রতিদিন এশার নামাজ পড়ে খেরকান থেকে বোস্তাম নগরে গিয়ে বায়জিদ বোস্তামী (রাঃ) এর মাজার যিয়ারত করতেন (দেখুন, "তাজকেরাতুল আউলিয়া, ১ম খন্ড)।

ভাল করে লক্ষ্য করুন!!

শিশুকালে কাটে ৮ বছর। মাজার যিয়ারতকাল কাটে ১২ বছর। জন্ম হয়েছে বায়জিদ বোস্তামী (রাঃ) এর ওফাতের ৩৯ বছর পরে।

মোট: ৮+১২+৩৯=৫৯ বছর।

তাহলে হজরত বায়জিদ বোস্তামী (কু: ছে: আ:) এর ওফাতের ৫৯ বছর পর হজরত আবুল হাছান খেরকানী (রাঃ) তাঁর কাছে মুরীদও হয়েছেন এবং খলিফা হয়েছেন। আর হজরত আবুল হাছান খেরকানী (রাঃ) হয়েই নক্সবন্দীয়া ও মোজাদ্দেদীয়া এই দুই ত্বরিকা বর্তমান পর্যন্ত

বিস্তৃত রয়েছে। সারা বিশ্বের সকল পীর-মাশায়েখগণ যারা এই দুই ত্বরিকার মাশায়েখ, তাঁরা সবাই আবুল হাছান খেরকানী (রাঃ) হয়ে খেলাফত পেয়েছেন, যিনি বায়জিদ বোস্তামী (রাঃ) এর ওফাতের ৫৯ বছর পর মুরীদ হয়েছেন ও খেলাফতও পেয়েছেন।

এমনকি হাজারী মোজাদ্দেদ হজরত শেখ আহমদ ছেরহেন্দী (রাঃ), খাজা বাহাউদ্দিন নক্সবন্দ (রাঃ), সূফি ফতেহ আলী (রঃ), সৈয়দ আহমদ বেরলভী (রঃ), শাহ ওয়ালী উল্লাহ মোহাদ্দেছ দেহলভী (রঃ), শাহ্ আব্দুল আজীজ মোহাদ্দেছ দেহলভী (রঃ), খাজা এনায়েত পুরী (রাঃ) প্রমূখ মাশায়েখগণ সেই আবুল হাছান খেরকানী (রাঃ) হয়েই এই দুই ত্বরিকার খেলাফত প্রাপ্ত হয়েছেন।

ছেরহেন্দ, ফুরফুরা, ছারছিনা, জৈনপুর, রাজারবাগ, দেওয়ানবাগ, চন্দ্রপাড়া, ফুলতলী, চরমোনাই, কুতুববাগ, সিরাজনগর, সুরেশ্বরী, এনায়েতপুর ইত্যাদি ইত্যাদি দরবারের সম্মানিত খলিফাগণ নক্সবন্দিয়া-মুজাদ্দেদীয়া এই দুই ত্বরিকা হজরত আবুল হাছান খেরকানী (রাঃ) হয়ে পর্যায়ক্রমে পেয়েছেন। যিনি বায়জিদ বোস্তামী (রাঃ) এর ওফাতের ৫৯ বছর পর মুরীদ হয়েছেন ও খেলাফত পেয়েছেন।

এখন, যদি "কামেল পীর ওফাতের পরেও মুরীদ হওয়া যায়" এই কথা অস্বীকার করেন, তাহলে বায়জিদ বোস্তামী (রাঃ) এর মুরীদ ও খলিফা এবং নক্সবন্দীয়া-মুজাদ্দেদীয়া ত্বরিকার অন্যতম ধারক ও বাহক হজরত আবুল হাছান খেরকানী (রাঃ) এর ব্যাপারে কি বলবেন?

এমনকি হুজুর গাউছে ছাকালাইন, শেখ সৈয়দ মহিউদ্দিন আব্দুল কাদের জিলানী (রাঃ) এর ওফাত শরীফের প্রায় ৭৫০ বছর পরে রাশিয়ার তাতার শহরের বাশিন্দা 'আল্লামা মিরান শাহ্ তাতারী (রঃ) গাউছে পাক (রাঃ) এর কাছে মাজার শরীফে যিয়ারত মোরাকাবার মাধ্যমে মুরীদত্ব অর্জন করেছিলেন (দেখুন "মিরান শাহ (রঃ) এর জীবনী")।

*হজরত খাজা বাহাউদ্দিন নক্সবন্দ (রাঃ) এর জীবনীতে দেখা যায়, তিনি বিভিন্ন শহরে আল্লাহর ওলীগণের মাজারে মোরাকাবার মাধ্যমে অবস্থান করতেন ও মুরিদত্ব অর্জন করে এলমে মারেফাত হাছিল করতেন।

*হানাফী মাজহাবের দৃষ্টি কোন থেকে আমরা ঈমামে আজম আবু হানিফা (রাঃ) এর কাছে বায়াত। এ কারনেই আমরা 'হানাফী' বলে দাবী করি। ঈমাম আবু হানিফা (রাঃ) শরিয়াতে জিবীত নয় অথচ এখনোও মুসলমানগণ তাঁর কাছে মাজহাবী বায়াত গ্রহন করছে।

*শরিয়াতের দৃষ্টিতে বিশ্বনবী হজরত মুহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) আমাদের কাছে জিবীত নয়, অথচ কেয়ামত পর্যন্ত লোকেরা প্রিয় নবীজির কাছে কলেমা পড়ে নবীর উম্মত হবেন।

সুতরাং বুজা যায়, কামেল পীরের ওফাতের পরেও তাঁদের কাছে বায়াত হওয়া যায় ও ইলমে মারেফাত অর্জন করা যায়। পাশাপাশি আল্লাহর ওলীগণও মুরীদগণকে মারেফাত দান করতে পারেন, এক কথায় মুরীদকে সর্ব ব্যাপারে সাহায্য করতে পারেন।

*উল্লেখ্য যে, বায়াত বা মুরিদত্ব ৩ রকমে অর্জন হয়।

১/ পীরের হাঁতে হাত রেখে ওয়াদাবদ্ধ হওয়া।

#দলিলঃ قال جرير اتيت النبى صلى الله عليه وسلم وهو يبايع فقلت يا رسول الله ابسط يديك حتى ابايعك *অর্থঃ হজরত জারির (রাঃ) বলেন, আমি যখন রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) এর কাছে আসি তখন আমি বললাম: ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আপনার হাঁত বাড়িয়ে দিন যাতে আমি আপনার নিকট বায়াত গ্রহন করতে পারি (সুনানে নাসাঈ শরিফ)।

[

#দলিলঃ عن عبادة قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فى اليسر والعسر والمنشط والمكره .... *অর্থঃ হজরত উবাদা (রাঃ) বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: আমরা রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) এর নিকট বায়াত গ্রহন করলাম যে, অনুকূল-প্রতিকূল, সুখে-দুঃখে, সর্বাবস্থায় অনুগত থাকব.... (নাসাঈ শরিফ, ১ম জিঃ কিতাবুল বায়াত)।

*এই হাদিস দ্বারা বুঝা যায়, সাহাবীগণ প্রিয় নবীজির কাছে শুধু কালাম বা কথার মাধ্যমেও বায়াত হতেন। কলমী বায়াত হাছিলের জন্যই বিশ্ব ওলী খাজাবাবা ফরিদপুরী (রাঃ) এর রেকর্ট করা বানীর সাথে জবান মিলিয়ে তওবা করা হয় এবং বায়াত করা হয়, অন্যথায় নিচে উল্লেখিত নিয়মেও বায়াত হওয়া যায়। রেকর্ট করা বানী বাজানো হয় দুটি কারনে যথা: একদিকে কলমী বায়াত হাছিল করা হয়, অন্যদিকে মুরিদের আত্মার শান্তির জন্য। রেকর্ট করা বানী ছাড়াও ওফাত প্রাপ্ত ওলীর কাছে বায়াত হওয়া যায়। নিচে লক্ষ্য করুনঃ-

৩/ পীর যদি কাউকে মুরীদ হিসেবে কবুল করে নেন, তিনি জিবীত হোক আর ওফাত প্রাপ্ত হোক। যেমন:-

#দলিলঃ عن رجل من ال الشريد يقال له عمرو بن ابيه قال فى وفد ثقيف رجل مجدوم فارسل اليه النبى صلى الله عليه وسلم ارجع فقد بايعتك *অর্থঃ হজরত আমর (রাঃ) নামক এক ব্যক্তি তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন, বণু ছাকীফ গোত্রের প্রতিনিধি দলে এক ব্যক্তি কুষ্ঠ রোগী ছিল। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) তাঁকে বললেন: তুমি চলে যাও আমি তোমার বায়াত কবুল করেছি (সুনানে নাসাঈ শরিফ, ১ম জিঃ কিতাবুল বায়াত)।

*লক্ষ্য করুন! প্রিয় নবীজি (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) ঐ লোকটির হাতেও হাঁত মোবারক রাখলেন না, জবানের সাথে জবান মোবারক মিলিয়ে ওয়াদা নিলেন না; শুধু বললেন: চলে যাও আমি তোমার বায়াত কবুল

করেছি। এই হাদিস দ্বারা প্রমান হয়, মোর্শেদে কামেল যদি মুরীদ হিসেবে কবুল করেনেন তাহলে বায়াত হওয়া তথা মুরীদের অন্তর্ভূক্ত হওয়া যায়। যেমনি ভাবে প্রিয় নবীজি ঐ লোকটিকে শুধু বললেন: আমি তোমার বায়াত কবুল করেছি। এজন্যেই বলা হয়:

"চুতো যাতে পীরেরা কারদে কবুল,
হাম খোদা দর জাতাশ আমাদ হাম রাসূল"

*অর্থঃ যেই মাত্র তোমার পীর তোমাকে মুরীদ হিসেবে কবুল করবেন, ঠিক সেই সময়েই রাসূল তোমাকে উম্মত হিসেবে কবুল করবেন, যেই মাত্র রাসূল তোমাকে উম্মত হিসেবে কবুল করবেন, ঠিক সেই সময়ে আল্লাহ তোমাকে খাছ বান্দাহ হিসেবে কবুল করবেন (মছনভী শরিফ)।

*সুতরাং পীর যদি আপন রওজা পাক থেকে তোমাকে মুরীদ হিসেবে কবুল করেনেন, তাহলে অবশ্যই তুমি ঐ পীরের মুরীদের অন্তর্ভূক্ত হবে।

*গাউছে পাক আব্দুল কাদের জিলানী (রাঃ) তাঁর কিতাবে উল্লেখ করেন: রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) এরশাদ করেন: যে ব্যক্তি ইলমে মারেফাত শিক্ষা করা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে তাঁর কবরে দু'টি 'রুহ' প্রেরণ করেন। যারা তাকে কিয়ামত পর্যন্ত ইলমে মারেফাত শিক্ষা দিতে থাকে। ফলে সেই ব্যক্তি মারেফাতের আলিম ও আশিক হয়ে হাশরের মাঠে উঠবেন (ছেররুল আছরার, ৯৬ পৃ:)।

*এই হাদিস দ্বারা প্রমান হয়, আল্লাহর ওলীগণের পবিত্র রুহ ওফাতের পরেও মুরীদের কবরে গিয়ে মারেফাত শিক্ষা দিতে পারেন। সুতরাং পীর যদি মুরীদের কবরে গিয়ে এলমে মারেফাতের তালিম দিতে পারেন, তাহলে দুনিয়াতে মুরীদকে সে শিক্ষা দিতে পারবেন না কেন? আমরা পূর্বেও উল্লেখ করেছি, আল্লাহর ওলীগণ ওফাতের পরেও আপনজনকে সাহায্য করতে পারে। এজন্যেই বলা হয়:

"পীর যারে দয়া করে, মুর্দা দেল তার জিন্দা হয়;
অকুল সাগর মাঝে ডুবা নৌকা ভেসে যায়"

*ওফাত প্রাপ্ত ওলীগণ ৩নং পদ্ধতীতে মুরীদ বা বায়াত করেন। কামেল পীর যদি রওজা পাক থেকে কাউকে মুরীদ হিসেবে কবুল করেনেন তাহলে আপনার সমস্যা কি? আল্লাহর ওলীগণ'ত রওজা পাক থেকেও দুনিয়ার অবস্থা তথা আশেকীন ও জাকেরীন গণের অবস্থা আল্লাহর নূর দিয়ে দেখতে পান।

*জিজ্ঞাসাঃ

*প্রশ্নঃ আমরা জানি রাসূলে পাক (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) এর ওফাত শরিফের পর সাহাবীগণ হজরত আবু বকর ছিদ্দীক (রাঃ) এর নিকট ও পরে উমর (রাঃ) এর নিকট, পরে উছমান (রাঃ) এর নিকট, তারপর আলী (রাঃ) এর নিকট বায়াত হয়েছেন। এক কথায় রাষ্ট্র প্রধানের নিকট বায়াত হইতেন। তাহলে আমরা পীরের নিকট কেন বায়াত হব?

*জবাবঃ ইসলামের স্বর্ণযুগে সাহাবী ও তাবেঈগণ নবীপাকের
খলিফাগণের কাছে বায়াত হইতেন। লক্ষ্য করুনঃ- ان
'বায়াত হওয়া' এই নিয়ম কেয়ামত পর্যন্ত থাকবে কারন আল্লাহ বলেন:
الذين يبعونك انما يبعون الله *অর্থাৎ, নিশ্চয় যারা আপনার নিকট বায়াত
হচ্ছে এবং হতে থাকবে তারা যেন আল্লাহর নিকট বায়াত হচ্ছে ও হতে
থাকবে (আল কোরআন)। এখানে: يبعمنك এই শব্দ 'মোজারের ছিগা' তথা
বর্তমান ও ভবিষ্যত কাল বাচক শব্দ।

*কিন্তু আমাদের জানার বিষয় হল, সাহাবীগণ নবী (ছাল্লাল্লাহ আলায়হি
ওয়া ছাল্লাম) এর খলিফাগণের নিকট বায়াত হয়েছেন নবীর খলিফা যেনে,
রাষ্ট্র প্রধান যেনে নয়। নচেৎ 'খেলাফত' নবীজির পরে মাত্র ৩০ বছর চালু
ছিল, পরবর্তীতে খেলাফত প্রথা বন্ধ হয়ে যায়, চালু হয় রাজতন্ত্র তথা রাজা-
বাদশার যুগ। সাথে সাথে বন্ধ হয়ে যায় সেই রাষ্ট্রির প্রধান খলিফাদের নিকট
বায়াত হওয়ার প্রথা।

*কিন্তু বায়াত হওয়ার প্রথা চালু থাকে। তবে রাষ্ট্রিয় প্রধানের নিকট নয়
বরং পর্যায়ক্রমে রাসূলে পাক (ছাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) এর খেলাফত
প্রাপ্ত খলিফাগণের নিকট, সে বাদশা হোক আর সাধারণ জনতা হোক। যদি
রাষ্ট্রিয় প্রধান যেনে বায়াত হওয়ার কোন শর্ত থাকত তাহলে অবশ্যই
কেয়ামত পর্যন্ত খেলাফত চালু থাকত, ৩০ বছরে সীমাবদ্ধ থাকত না।
বর্তমানে কোথাও নবী পাকের খেলাফত রাষ্ট্রিয় ভাবে নেই কারন আল্লাহর
নবী বলেছেন খেলাফত ৩০ বছর থাকবে পরে রাজতন্ত্র চালু হবে। তাহলে
বর্তমানে কার কাছে বায়াত হবেন? তাই বায়াত রাষ্ট্রীয় প্রধানের থাকে সম্পৃক্ত
নয় বরং নবী পাকের পর্যায়ক্রমে খলিফার সাথে সম্পৃক্ত। যেমন:-

লোকেরা ঈমান হোছাইন (রাঃ) এর কাছে বায়াত হয়েছিল অথচ তিনি
কোন রাষ্ট্রিয় খলিফা ছিলেন না, বরং নবী পাকের খলিফা ছিলেন।

ঈমাম আবু হানিফা (রাঃ) বায়াত হয়েছেন আওলাদে রাসূল ঈমাম জাফর
ছাদেক ও ঈমাম বাকের (রাঃ) এর নিকট, অথচ তাঁরা কোন রাষ্ট্র প্রধান ছিলেন না।

ঈমাম আহমদ (রাঃ) বায়াত হয়েছেন হজরত বশির হাফি (রঃ) এর
নিকট, অথচ তিনি কোন রাষ্ট্র প্রধান ছিলেন না।

হজরত বায়জিদ বোস্তামী (রঃ) বায়াত হয়েছেন হজরত হজরত জাফর
ছাদেক (রাঃ) এর নিকট, অথচ তিনি কোন রাষ্ট্র প্রধান ছিলেন না।

খাজা মইনুদ্দিন চিশ্তী (রঃ) বায়াত হয়েছেন খাজা উসমান হারুনী (রঃ)
এর নিকট, অথচ তিনি কোন রাষ্ট্র প্রধান ছিলেন না।

শেখ আহমদ ছেরহেন্দী মোজাদ্দেদ আলফেছানী (রাঃ) বায়াত হয়েছেন
হজরত খাজা মোহাম্মদ বাকী বিল্লাহ (রঃ) এর নিকট, অথচ তিনি কোন রাষ্ট্র
প্রধান ছিলেন না। এই সকল ঈমাম-মুজতাহিদ্গণ কি ভুল করে গেছেন?
(নাউজুবিল্লাহ)

*সুতরাং, বায়াত রাষ্ট্র প্রধানের সাথে সম্পৃক্ত নয়, বরং নবী পাকের
পর্যায়ক্রমে খলিফাগণের সাথে সম্পৃক্ত। আপনি যার কাছে বায়াত হবেন
দেখতে হবে সে নবী করিম (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) এর খলিফা
কতৃক খেলাফত প্রাপ্ত কি-না।

#প্রশ্নঃ নবী করিম (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) এর ওফাত শরীফের
পরে হজরত আবু বকর ছিদ্দীক (রাঃ) এর কাছে ও আবু বকর (রাঃ) এর
ওফাতের পরে হজরত উমর (রাঃ) কাছে বায়াত হয়েছেন। যদি ওফাতের
পরে বায়াত হওয়া জায়েয হত তাহলে সাহাবীগণ আবু বকরের ওফাতের
পরে হজরত উমর (রাঃ) এর কাছে বায়াত হলেন কেন?

#উত্তরঃ প্রিয় নবীজির সাহাবীগণ (রাঃ) নবী পাকের ওফাতের পরে এবং
হজরত আবু বকর ছিদ্দীক (রাঃ) এর ওফাতের পরে নব নিযুক্ত খলিফা
হজরত উমর (রাঃ) এর কাছে বায়াত হয়েছেন এই কারনেই ওফাতের পরে
নব নিযুক্ত খলিফার নিকট বায়াত হওয়া জায়েয প্রমানিত হয়েছে। অন্যথায়
লোকেরা নবী পাকের কাছেই বায়াত-এ সীমাবদ্ধ থাকতেন। শরিয়তের
দৃষ্টিতে নবীজির ওফাতের পরেও অদ্যবদী লোকেরা নবীজির উম্মতের অন্ত
ভূক্ত নয়কি?

প্রিয় নবীজির ওফাতের পরে কিংবা হজরত আবু বকর (রাঃ) এর
ওফাতের পরে লোকেরা নব নিযুক্ত খলিফার কাছে বায়াত হওয়াতে ঐরূপ
বায়াত জায়েয প্রমান হয়েছে, কিন্তু ওফাতের পরে বায়াত হওয়া অস্বীকার
হয়না। দুনিয়ার সকল মুসলমান মূলত রাসূলে পাক (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া
ছাল্লাম) এর কাছে বায়াত, পীর হল বায়াতে রাসূল হাছিলের উছিলা। যেমন
শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ মোহাদ্দেছে দেহলভী (রাঃ) উল্লেখ করেন: بيعة رسول الله
صلى الله عليه و سلم بوستة خلفاء *বায়াতে রাসূল হাছিল করতে হয় তাঁর
খলিফাগণের উছিলায় (আল কাউলুল জামিল)।

তাই 'বায়াতে রাসূল' হাছিল করতে হলে 'বায়াতে শেখ' অবশ্যই
দরকার। বাহ্যিক দৃষ্টিতে আল্লাহর নবী (ছাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়া ছাল্লাম)
ওফাত প্রাপ্ত, তাই বলে কি লোকেরা রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম)
এর কাছে বায়াত হতে পারবেনা? অবশ্যই পারবে ও কেয়ামত পর্যন্ত লোকরা
নবী পাক (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) এর কাছে বায়াত হবে।

ওফাতের পরে যদি কামেল পীরের নিকট বায়াত না হওয়া যাইত, তাহলে
হজরত আবুল হাছান খেরকানী (রাঃ) ও হজরত মিরান শাহ্ তাতারী (রঃ)
তদীয় মুর্শিদের নিকট বায়াত হলেন কিভাবে ও কেন?

এমনকি কোন ফকিহ্-মুজতাহিদ্ এর প্রতিবাদ-না করে তাঁদের মাধ্যমে
এলমে বাতেন হাছিল করলেন কিভাবে ও কেন?

*কুরআন-সুন্নাহর দৃষ্টিতেঃ

*রাসূলে পাক ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম নূরের তৈরীঃ

*বর্তমান সমাজে আলেমগণের মাঝে একটি বিবেধ হল রাসূলে পাক ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম কি আল্লাহর নূরের সৃষ্ট নাকি মাটির সৃষ্ট। এই ব্যাপারে পবিত্র কোরআন ও হাদিস কি বলে আমরা সে দিকে লক্ষ্য করুনঃ

*পবিত্র কোরআনের আলোকেঃ

#দলিলঃ قد جاء كم من الله نور و كتاب مبين *অর্থঃ অবশ্যই আল্লাহর তরফ থেকে তোমাদের নিকট এসেছে নূর এবং সুস্পষ্ট কিতাব (সূরা মায়েদা, ১৫ নং আয়াত)।

*এই আয়াতে নূর দ্বারা কাকে বুজানো হয়েছে এই ব্যাপারে তাফছিরকারকগণের উক্তি শুনুনঃ

#দলিলঃ قد جاء كم من الله نور هو النبى صلى الله عليه و سلم *অর্থঃ নিশ্চয় আল্লাহর নিকট থেকে এসেছে নূর আর তিনি হল মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম (তাফছিরে জালালাইন, ৯৭ পৃ:; তাফছিরে ছাবী, ১ম খন্ড, ৪৫১ পৃ:)।

*জালালাইন শরিফ আলিয়া ও ক্বাওমী মাদ্রাসা উভয়টিতে পড়ানো হয়। অথচ এই কিতাব পড়েও এক শ্রেণীর লোক নবীজিকে নূরের তৈরী মানেন না।

#দলিলঃ قد جاء كم من الله نور يعنى محمد صلى الله عليه و سلم *অর্থঃ নিশ্চয় আল্লাহর নিকট থেকে এসেছে নূর অর্থাৎ মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম (তাফছিরে মায়ালেমু তানজিল, ২য় খন্ড, ১৩৮ পৃ:)।

#দলিলঃ قد جاء كم من الله نور : المراد بالاول هو الرسول صلى الله عليه و سلم و بالثانى القران *অর্থঃ নিশ্চয় আল্লাহর নিকট থেকে এসেছে নূর : এখানে প্রথমটি দ্বারা অর্থ হল 'রাসূল' ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম ও দ্বিতীয়টি দ্বারা 'কোরআন' (তাফছিরে আবু সাউদ, ২য় খন্ড, ৪৪৭ পৃ:; তাফছিরে রুহুল বয়ান, ২য় খন্ড, ৪২৯ পৃ:)।

#দলিলঃ الاول ان المراد بالنور محمد وبالكتاب القران *অর্থঃ প্রথমটি দ্বারা মুরাদ হল 'নূরে মুহাম্মদী' ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম আর কিতাব দ্বারা মুরাদ হল 'আল কোরআন' (তাফছিরে কবির শরিফ, ১১ তম খন্ড, ১৬৩ পৃ:)।

#দলিলঃ قيل: نور محمد صلى الله عليه و سلم عن الزجاج *অর্থঃ কেউ কেউ বলেছেনঃ নূর মানে 'মুহাম্মদ' ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম ইহা যুজাজ (রঃ) এর মত (তাফছিরে কুরতবী, ৬ষ্ঠ খন্ড, ১০৬ পৃ:)।

#দলিলঃ قد جاء كم يا اهل التوراة و الانجيل من الله نور يعنى بالنور محمد صلى الله عليه و سلم *অর্থঃ হে আহলে তাওরাত ও আহলে ইনজিল! তোমাদের নিকট এসেছে নূর অর্থাৎ নূরে মুহাম্মাদী ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম (তাফছিরে তাবারী শরিফ, ৬ষ্ঠ খন্ড, ১৭৬ পৃ:)।

#দলিলঃ يعنى محمدا صلى الله عليه و سلم انما سماه الله نورا *অর্থঃ নূর অর্থ মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম এজন্যই আল্লাহ তাঁর নাম রেখেছেন 'নূর' (তাফছিরে খাজেন শরিফ, ২য় খন্ড, ২৪ পৃ:)।

#দলিলঃ قد جاء كم من الله نور : عظيم وهو نور الانوار والنبى المختار صلى الله عليه وسلم *অর্থঃ নিশ্চয় আল্লাহর নিকট থেকে তোমাদের নিকট এসেছে নূর : অর্থাৎ বিশাল নূর ও সকল নূরের নূর, তিনি নবী মুখতার ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম (তাফছিরে রুহুল মায়ানী, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৩৭৮ পৃ:)।

**এই আয়াতের তাফছির গুলো দ্বারা স্পষ্ট প্রমান হয় যে, পবিত্র কোরআনে আল্লাহ পাক নবী করিম ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম কে নূর বলেছেন। আল্লাহ বলেন: নবীজি নূর, আর অজ্ঞ লোকেরা বলে: নবীজি মাটি (নাউজুবিল্লাহ)। প্রিয় নবীজি শুধু নূরই নয় বরং তিনি সকল নূরেরও নূর।

***অপর আয়াতে উল্লেখ আছে: الله نور السموات والارض مثل نوره كمشكوة *অর্থঃ আল্লাহ আসমান জমীনের নূর দাতা, তাঁর নূরের মেছাল হল চেরাগের মত...... (সূরা নূর, ৩৫ নং আয়াত)।

*এই আয়াতে বলা হয়েছে مثل نوره *অর্থাৎ,তাঁর নূরের মেছাল। এখানে 'তাঁর' বলতে 'আল্লাহর, তাঁর নূরের মেছাল অর্থাৎ 'আল্লাহর নূরের মেছাল'। আল্লাহ'ত নূর নয়, বরং নূর এর স্রষ্টা, তাহলে বুজা যায় আল্লাহর নূর আছে। সেই নূর কে বা কি? এ ব্যাপারে তাফছিরের কিতাবে কি উল্লেখ আছে, লক্ষ্য করুন:

#দলিলঃ وقال سعيد بن جبير و الضحاك هو محمد صلى الله عليه وسلم *অর্থঃ হজরত সাইদ ইবনে যুবাইর (রাঃ) ও হজরত দ্বাহ্হাক (রাঃ) বলেন: مثل نوره তথা আল্লাহর নূর হল 'মুহাম্মদ' ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম (তাফছিরে মায়ালেমু তানজিল, ৪র্থ খন্ড, ১১৫ পৃ:; তাফছিরে খাজেন শরিফ, ৩য় খন্ড, ২৯৭ পৃ:; তাফছিরে রুহুল মায়ানী, ১৮ তম খন্ড, ৪৮২ পৃ:)।

#দলিলঃ عن سعيد بن جبير فى قوله (مثل نوره) قال محمد صلى الله عليه وسلم *অর্থঃ হজরত সাইদ ইবনে যুবাইর (রাঃ) مثل نور সম্পর্কে বলেন: ইহা মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম (তাফছিরে তাবারী শরিফ, ১৮ তম খন্ড, ১৪৫ পৃ:)।

#দলিলঃ (مثل نوره) وسمى نبيه نورا فقال قد جاء كم من الله نور و كتاب مبين *অর্থঃ আল্লাহ তাঁর নবীকে 'নূর' নামকরন করেছেন, যেমন তিনি বলেছেন: নিশ্চয় আল্লাহর নিকট থেকে তোমাদের নিকট এসেছে নূর (তাফছিরে কুরতবী শরিফ)।

#দলিলঃ المراد بنوره رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وقد جاء اطلاق النور عليه الصلوة والسلام فى قوله تعالى (قد جاء كم من الله نور

و كتاب مبين) ..... وقيل الضمير رجع الى محمد صلى الله عليه وسلم وروى ذالك جماعة عن ابن عباس عن كعب الاحبار و حكاه ابو حيان ابن جبير ايضا *অর্থঃ তাঁর নুর দ্বারা মুরাদ হল মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম, যেমন আল্লাহ বলেন: নিশ্চয় আল্লাহর নিকট থেকে তোমাদের নিকট এসেছে নুর ও কিতাব। ..... কেউ কেউ বলেছেন নুর শব্দের জমীর নবী করিম ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম এর দিকে ফিরেছে, ইহা বর্ণনা করেছেন হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ), হজরত কা'ব ইবনে আহবার (রাঃ) থেকে। আর এমনিভাবে আবু হাইয়ান (রঃ) হজরত ইবনে যুবায়ের (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন (তাফছিরে রুহুল মায়ানী, ১৮ তম খন্ড, ৪৮২ পৃ:)।

***এই দলিল দ্বারা বুজার যায় নবীর সাহাবী হজরত ইবনে আব্বাস ও কাব ইবনে আহবার (রাঃ) এবং ইবনে যুবায়ের (রাঃ) প্রমূখ সাহাবীগণ প্রিয় নবীজিকে আল্লাহর নুর হিসেবেই জানতেন।

*সুতরাং যারা আল্লাহর নবীকে নুর হিসেবে মানবে না তার যেন আল্লাহর কোরআনকে মানল না। আর যারা আল্লাহর কোরআনকে মানেনা তাদের ঈমান কতুটুকু আছে চিন্তা করে দেখুন।

*পবিত্র হাদিসের আলোকেঃ

#দলিলঃ عن ميسرة الفخرى قال قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم متى كنت نبيا؟ قال : وادم بين الروح والجسد *অর্থঃ হজরত হজরত মাইছারাতুল ফিহরী (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম কে জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কখন থেকে নবী ছিলেন? নবীজি বলেন: আমি তখনও নবী যখন আদম রুহ ও দেহের মাঝে ছিল (মুস্ত[illegible]দরাকে হাকেম, ৪র্থ খন্ড, ১৫৭৫ পৃ:; মাদারে যুন্নবুয়ত, ১ম খন্ড, ৭ পৃ:; বায়হাক্বী তাঁর দালায়েলুন্নবুয়াতে, ২য় খন্ড, ৯০ পৃ:; মাওয়াহেবুল্লাদুন্নিয়া, ১[illegible] খন্ড, ৫৮ পৃ:; খাছায়েছুল কোবরা, ১ম খন্ড, ২১ পৃ:; মুসনাদে আহমদ; ঈমা[illegible] বুখারী তাঁর 'তারিখে'; তাবারানী তাঁর 'কবীরে'; শরহে সুন্নাহ, ২০৭/১; আ[illegible] বেদায়া ওয়ান নেহায়া, ২য় খন্ড, ৬২৬ পৃ:; আবু নুয়াইম তাঁর হলিয়াতে)।

#দলিলঃ [illegible]ن ابى هريرة قال قيل للنبى صلى الله عليه وسلم متى لك النبوة؟ قال بين خلق ادم ونفخ و الروح فيه *অর্থঃ হজরত আবু হুরায়রা (রা[illegible] বর্ণনা করেন, নবী পাক ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম কে জিজ্ঞাসা করা হ[illegible] কোন সময় আপনার নবুয়াত আবশ্যক হয়? প্রিয় নবীজি ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ও[illegible] ছাল্লাম বলেন: আদম যখন কাঁদা মাটি ও রুহ অবস্থায় ছিল (ঈমাম বায়হাক্বী তাঁ[illegible] দালায়েলুন্নবুয়াতে. ২য় খন্ড, ৯০ পৃ:; মেরকাত, ১০ম খন্ড, ৪৩৯ পৃ:; তিরমি[illegible] শরিফ, ২য় জি: ২০২ পৃ:; মুস্তাদরাকে হাকেম, ৪র্থ খন্ড, ১৫৭৫ পৃ:; মেসক[illegible]

শরিফ, ৫১৩ পৃ:; মাওয়াহেবুল্লাদুন্নিয়া, ১ম খন্ড, ৫৭ ও ৬০ পৃ:; মুসনাদে আহমদ, ১২৭/৪; খাছায়েছুল কোবরা, ১ম খন্ড, ২২ পৃ:)।

#দলিলঃ عن ابن عباس قال قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم متى نبين؟ قال وادم بين اروح والجسد *অর্থঃ হজরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলে পাক ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম কে জিজ্ঞাসা করা হল, আপনি কোন সময় থেকে নবী ছিলেন? নবীজি ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম বলেন: আমি তখনও নবী ছিলাম যখন আদম (আঃ) দেহ ও রুহ অবস্থায় (তাবারানী আওছাতে, ৩য় খন্ড, ১৫৮ পৃ:; মেরকাত শরহে মেসকাত, ১০ম খন্ড, ৪৩৯ পৃ:; খাছায়েছুল কোবরা, ১ম খন্ড, ২২ পৃ:)।

#দলিলঃ عن العرباض بن سارية عن النبى صلى الله عليه وسلم قال انى عند الله لخاتم النبين وان ادم لمنجد فى طينته *অর্থঃ হজরত ইরবাদ্ব ইবনে ছারিয়া (রাঃ) নবী করিম ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম হতে বর্ণনা করেন, নবীজি বলেন: নিশ্চয় আমি তখনও শেষ নবী ছিলাম যখন আদম (আঃ) কাঁদা মাটিতে (মাওয়াহেবুল্লাদুন্নিয়া, ১ম খন্ড, ৫৭ পৃ:; মুসনাদে আহমদ, ১২৭/৪; মেসকাত, ৫১৩ পৃ:; মেরকাত, ১০ম খন্ড, ৪৩৯ পৃ:; বায়হাক্বী; হাকেম; মেরআতুল মানাজিহ)।

*এরুপ অনেক রেওয়াত বিভিন্ন সাহাবী থেকে বর্ণিত রয়েছে, আর সব গুলোই সহি। এই হাদিস গুলো দ্বারা প্রমান হয়, আমাদের নবী ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম আদম (আঃ) এর পূর্বেও নবী হিসেবে ছিলেন।

#দলিলঃ عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت اول النبين فى الخلق واخرهم فى البعث *অর্থঃ হজরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল পাক ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম বলেছেন: সৃষ্টি জগতে আমি প্রথম নবী, প্রেরিত হয়েছি সবার শেষে (মেরকাত শরহে মেসকাত, ১০ম খন্ড, ৪৩৯ পৃ:; আবু নুয়াইম তাঁর দালায়েলে; শিফা শরিফ, ১, জি: ২৬৬ পৃ:; আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া, ২য় খন্ড, ৬২৭ পৃ:; খাছায়েছুল কোবরা, ১ম খন্ড, ২১ পৃ:)।

*এই হাদিসও প্রমান করে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম সর্ব প্রথম নবী।

#দলিলঃ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نبيا وادم بين الماء والطين *অর্থঃ রাসূলে পাক ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম বলেন: আমি তখনও নবী ছিলাম, যখন আদম (আঃ) মাটি ও পানিতে ছিল (মাওয়াহেবুল্লাদুন্নিয়া, ১ম খন্ড, ৫৬ পৃ:; মেরকাত শরহে মেসকাত, ১০ম খন্ড, ৪৩৯ পৃ:; তাফছিরে রুহুল বয়ান, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৪৬৫ পৃ:)।

*এই হাদিসটি সনদগত ভাবে দূর্বল হলেও অন্যন্ন হাদিসের পরিপূরক ও সমর্থক।

***লক্ষ্য করুন!

*'নবী' হওয়ার জন্য শর্ত হল মানুষ হওয়া। কারন মানুষ ব্যতিত অন্য কোন জাতির মধ্যে নবী নেই।

*আমাদের নবী ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম অবশ্যই মানুষ ছিলেন? কারন পবিত্র কোরআনে বলা আছে: قل انما انا بشر *অর্থঃ হে নবী আপনি বলুন, আমি একজন মানুষ (সূরা কাহাফ, ১১০ নং আয়াত)।

*মানুষ হওয়ার জন্য শর্ত কি?

*মানুষ হওয়ার জন্য শর্ত হল "দেহ ও রুহ" উভয় থাকা।

*দেহ আছে 'রুহ্' নাই একে বলা হয় 'লাশ' *আবার 'রুহ' আছে কিন্তু 'দেহ' নেই এর নাম: আত্মা বা পেত্নি বা প্রেতাত্মা। সুতরাং মানুষ'ত তিনিই যার 'দেহ ও রুহ' উভয় আছে।

*নবীজি বলেন: আদম (আঃ) সৃষ্টির পূর্বেও আমি 'নবী' ছিলাম অর্থাৎ, আদম সৃষ্টির পূর্বেও আমি 'দেহ-রুহ্' সহ মানুষ অবস্থায় নবী ছিলাম। যেহেতু নবী হওয়ার জন্য 'দেহ-রুহ' সহ মানুষ হওয়া। অর্থাৎ, হজরত বাবা আদম (আঃ) এর পূর্বে নবী ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম এর দেহ ও রুহ মোবারকও ছিল।

*স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, যদি আদম সৃষ্টির পূর্বে আমাদের নবী ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম দেহও রুহ সহ মানুষ থাকেন, তাহলে তিনি কিসের তৈরী মানুষ ছিলেন? কারন আদম (আঃ) মাটির তৈরী সর্ব প্রথম মানুষ। তাহলে অবশ্যই রাসূল মাটির মানুষ ছিলেন না।

#দলিলঃ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت اولهم خلقا واخرهم بعثا *অর্থঃ রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম বলেন: সৃষ্টি জগতে আমি প্রথম সৃষ্ট, প্রেরিত হয়েছি সবার শেষে (তাফছিরে রুহুল বয়ান, ৯ম খন্ড, ৬৩ পৃ:; শাব্দিক ব্যবধানেঃ- শিফা শরিফ, ১ম খন্ড, ২৬৬ পৃ:; মেরকাত শরহে মেসকাত, ১০ম খন্ড, ৪৩৯ পৃ:; আবু নুয়াইম তাঁর দালায়েলে)।

*সৃষ্টি জগতে যেহেতু নবীজিই প্রথম সেহেতু মাটি সৃষ্টির আগেই নবীজির অস্তিত্ব লাভ হয়েছে। সুতরাং নবীজিকে মাটির বলা মূর্খতা।

#দলিলঃ عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اوحى الله تعالى الى عيسى ان امن بمحمد .... فلو لا محمد ما خلقت ادم ولا الجنة ولا النار *অর্থঃ হজরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম বলেছেন: আল্লাহ ঈসা (আঃ) এর প্রতি ওহী করলেন, তুমি মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম প্রতি ঈমাম আনবে...... যদি মুহাম্মদ কে না বানাইতাম আদমকেও বানাইতাম না, জান্নাত-জাহান্নাম কিছুই বানাইতাম না (মুস্তাদ্রাকে হাকেম, ৪র্থ খন্ড, ১৫৮৩ পৃ:; শিফাউস সিকাম, আফদ্বালুল ক্বোরা; খাছায়েছুল কোবরা, ১ম খন্ড, ২৯ পৃ:) ঈমাম হাকেম (রঃ) বলেছেন: হাদিসটি সহি।

*এই হাদিসের দ্বারা বুজা যায়, আমাদের নবী মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম জান্নাত-জাহান্নাম বানাইবার পূর্বেও ছিলেন। এমনকি আদম (আঃ) এর পূর্বেও তিনি ছিলেন।

*এখন যদি প্রশ্ন করি এই মুহাম্মদ কে? জবাব হবে, মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম আব্দুল্লাহ ও মা আমেনার ছেলে। তাহলে সেই মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম কে উদ্দেশ্য করে ঈসা (আঃ) কে আল্লাহ বলছেন, মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম কে না বানাইলে আদম (আঃ) ও জান্নাত-জাহান্নামও বানাইতাম না। সুতরাং মাটির তৈরী প্রথম মানুষ বাবা আদম (আঃ) ও জান্নাত-জাহান্নাম বানাইবার আগেই আল্লাহ আমাদের নবী মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম কে তৈরী করেছেন। তাহলে নবীজি অন্তত মাটির মানুষ নয়। কারন মাটির তৈরী প্রথম মানুষ বাবা আদম (আঃ) সৃষ্টির পূর্বেই নবীজি সৃষ্টি হয়েছে।

#দলিলঃ হজরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম বলেছেন: আল্লাহ পাক আমাকে সকল নবীর অগ্রে সৃষ্টি করেছেন এবং সকলের পরে পাঠিয়েছেন (খাছায়েছুল কোবরা, ইবনে আবী হাতেম তাঁর 'তাফছির' গ্রন্থে; আবু নুয়াইম তাঁর 'দালায়েল'-এ;)

#দলিলঃ বাবা আদম (আঃ) আল্লাহকে বললেন: فرايت على قوائم العرش مكتوبا لا اله الا الله محمد رسول الله আমি আপনার আরশে নবীর কলেমা 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' লিখা দেখেছি এবং ভেবেছি নিশ্চয় তোমার প্রিয়ভাজন হবে। তখন আল্লাহ জবাব দেন তুমি قد صدقت সত্যি বলেছ, তাঁকে সৃষ্টি করার কারনেই তোমাকে ক্ষমা করা হয়েছে: ولو لا محمد ما خلقتك *অর্থঃ আমি যদি মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম! কে না বানাইতাম তাহলে তোমাকেও বানাইতাম না (মুস্তাদরাকে হাকেম, ৪র্থ খন্ড, ১৫৮৩ পৃ:; বায়হাক্বী দালায়েলুন্নবুয়ত; তাফছিরে রুহুল বয়ান, ৭ম খন্ড, ১৬৩ পৃ:; মাওয়াহেবুল্লাদুন্নিয়া, ১ম খন্ড, ৭০ পৃ: ও ৪র্থ খন্ড, ৫৯৪ পৃ:; শিফা শরিফ, ২য় জি: ২২১ পৃ:; আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া, ২য় খন্ড, ৬২৮ পৃ:; খাছায়েছুল কোবরা, ১ম খন্ড, ২৭ পৃ:; আবু নূযাইম) সকলেই সহি সনদে।

#দলিলঃ فقال ادم: لما خلقتنى رفعت راسى الى عرشك فاذا فيه مكتوب: لا اله الا الله محمد رسول الله فعلمت انه ليس احد اعظم قدرا عندك ممن جعلت اسمه مع اسمك فاوحى الله اليه: وعزتى وجلالي انه لاخر النبين من ذريتك ولولاه ما خلقتك *অর্থঃ আদম (আঃ) বললেন: যখন আমাকে সৃষ্টি করা হল, তখন আমি আপনার আরশের দিকে দেখেছি ইহার মধ্যে লেখা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" তখন থেকে আমি জেনে গেলাম,

নিশ্চয় আপনার প্রিয় ভাজন ব্যতিত কেউ নয়, কারন আপনার নামের পাশে নাম লিখা। তখন আল্লাহর ওহী করলেন: হে আদম! আমার ইজ্জত ও জালালের কসম! নিশ্চয় তোমার বংশের মধ্যে সে সর্বশেষ নবী, আর যদি আমি তাঁকে না বানাইতাম তবে তোমাকেও বানাইতাম না (বায়হাক্বী দালায়েলুন্নবুয়াত; শিফা শরিফ, ২য় জি: ২২১ পৃ:; নশরুত্তীব)।

*হাদিসত্রয়ে বলা আছে, ولو لا محمد لما خلقتك নবীজিকে না বানাইলে আল্লাহ আদম (আঃ) কে বানাইতেন না। আর আদম (আঃ) হল সৃষ্টির প্রথম মাটির মানুষ, আর সেই আদমের আগে নবীজিকে বানাইছেন। তাহলে সহজেই অনুমেয় হয় যে, রাসূলে করিম ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম কে অন্তত আল্লাহ মাটি দিয়ে বানায়নি। আল্লাহ পাক আরোও বলেছেন: মাটির জমীনও প্রিয় নবীজির উছিলায় সৃষ্টি করেছেন, তাহলে যার উছিলায় মাটির জমীন সৃষ্টি হল, সে অন্তত মাটির তৈরী নয়।

#দলিলঃ عن ابن عباس(رض) مرفوعا اتانى جبريل فقال ان الله تعالى يقول لولاك ما خلقت الجنة ولو لاك ما خلقت النار *অর্থঃ হজরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) মরফু রুপে বর্ণনা করেন, প্রিয় নবীজি বলেন: আমার নিকট জিব্রাইল (আঃ) আসলেন ও বললেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ! নিশ্চয় আল্লাহ বলেছেন: যদি আপনাকে না বানাইতাম তাহলে জান্নাত ও জাহান্নাম বানাইতাম না (দায়লামী শরিফ, মাওয়াহেবুল্লাদুন্নিয়া, ১ম খন্ড; বারাহেনে ক্বাতিয়া, কৃত: জৈনপুরী (রঃ); মাওজুআতুল কাবির, ১০১ পৃ:) হাদিসটি সহি।

*এই হাদিস মরফূ সহি। যাতে প্রমান হয়, মাটি'ত দূরের কথা জান্নাত-জাহান্নাম বানাইবার বহু পূর্বে আল্লাহ তাঁর বন্ধুকে তৈরী করেছেন।

#দলিলঃ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت اول الناس و اخرهم فى البعث *অর্থঃ আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম বলেছেন: আমি সৃষ্টির প্রথম মানুষ, প্রেরিত হয়েছি সব শেষে ('ইবনে সাদ' সহি সনদে, আবু নুয়াইম ও আবী হাতেম তদীয় তাফছির কিতাবে উল্লেখ আছে; শাব্দিক ব্যবধানেঃ- শিফা শরিফ, ১ম খন্ড, ২৬৬ পৃ:; মেরকাত শরহে মেসকাত, ১০ম খন্ড, ৪৩৯ পৃ:; আবু নুয়াইম তাঁর দালায়েলে; খাছায়েছুল কোবরা, ১ম খন্ড, ২১ পৃ:)।

*এই হাদিস দ্বারা প্রমানিত হয়, আল্লাহর নবী ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম সর্ব প্রথম মানুষ, এমনকি বাবা আদম (আঃ) এরও পুর্বে। মানুষত তিনিই যার দেহ ও রুহ উভয় আছে। তাহলে বুজা যায়, নবী করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়া ছাল্লাম আদম (আঃ) এর সৃষ্টির পূর্বে দেহ ও রুহ মোবারক সহ ছিলেন।

#দলিলঃ عن ثلمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يقول لو لاك ما خلقت الدنيا *অর্থঃ হজরত সালমান ফারছী (রাঃ) বর্ণনা করেন রাসূল পাক ছাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়া ছাল্লাম বলেছেন: নিশ্চয় আল্লা

বলেছেন: আপনাকে না বানাইলে দুনিয়া বানাইতাম না (তারিখে ইবনে আছাকির, মাওজুআতুল কাবির, কৃত: আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রঃ) ১০১ পৃ: হাদিসটি বিশুদ্ধ)।

*সুতরাং! দুনিয়ায় যা আছে সব কিছুর পূর্বে আল্লাহ তাঁর হাবিবকে তৈরী করেছেন। তাই নবীজিকে মদিনার মাটির তৈরী বলা বাতুলতা মাত্র, কারন অন্য সব মানুষের বিধান আর নবীজির সাথে মিলালে হবে না।

#দলিলঃ হজরত আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত: রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম বলেছেন:- قلت يا ربى لم خلقتنى؟ قال تعالى وعزتى وجلالى لو لاك ما خلقت الارض ولا سماء *অর্থঃ জিজ্ঞাসা করলাম হে আমার রব! আমাকে কেন তৈরী করলেন? আল্লাহ বললেন: আমার ইজ্জত ও জালালের কসম! আপনাকে না বানাইলে আসমান জমীন কিছুই বানাইতাম না (নজহাতুল মাজালিছ, ২য় খন্ড, ১১৯ পৃ:; মাওয়াহেবুল্লাদুন্নিয়া, ১ম খন্ড, ৭০ পৃ:)।

*এই হাদিসেও প্রমান, আসমানে ও জমীনে যা আছে এগুলোর বহু পূর্বে নবী পাক ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম কে বানানো হয়েছে। তাই নবীজিকে দুনিয়ার কোন কিছূ দিয়ে তৈরী বলাটা মূর্খতা মাত্র। কারন দুনিয়ার সব কিছু নবীর উছিলায় সৃষ্টি।

*তাই এই সকল হাদিসের সার হিসেবে রেওয়াত বিল মায়ানা হিসেবে সহি বর্ণনা রয়েছে:

#দলিলঃ لو لاك ما خلقت الافلاك *অর্থঃ হে নবী! আপনাকে না বানাইলে কোন কিছুই বানাইতাম না (মাওজুআতুল কাবির, ১০১ পৃ:; তাফছিরে রুহুল বয়ান, ২য় খন্ড, ৪৩০ পৃ: এই হাদিস উল্লেখ করে ঈমাম মোল্লা আলী ক্বারী আল্লামা ইবনে হাজর আসকালানী (রঃ) বলেন: لكن معناه صحيح (কিন্তু এর মায়ানা বা অর্থ সহি); এমনকি হাজার বছরের মোজাদ্দেদ শেখ আহমদ ছেরহেন্দী মোজাদ্দেদ আলফেছানী (রাঃ) তাঁর "মাকতুবাত শরিফে" এই হাদিসটি বহুবার উল্লেখ করেছেন; আল্লামা হুছাইন আহমদ মাদানী সাদেব তাঁর "আস সিহাবুছ ছাকিব" কিতাবের ৫০ পৃ: এই হাদিসটি এনেছেন: ছেররুল আছরার, কৃত: গাউছে পাক আব্দুল কাদের জিলানী (রা:) ১০২ পৃ:; কাশফুল খফা, ২য় খন্ড, ১৪৮ পৃ: হাদিসটি উল্লেখ করে বলেছেন: واقول لكن معناه صحيح অর্থাৎ আমি বলি এই হাদিসের মায়ানা সহি)।

#দলিলঃ قال صلى الله عليه وسلم كنت اول الانبياء فى الخلق واخرهم فى البعث *অর্থঃ নবী করিম ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম বলেন: সৃষ্টি জগতে আমি প্রথম নবী প্রেরিত হয়েছি সবার শেষে (শিফা শরিফ, ১ম জি: ২৬৬ পৃ:; মেরকাত শরহে মেসকাত, ১০ম খন্ড, ৪৩৯ পৃ:; আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া, ২য় খন্ড, ৬২৭ পৃ:; মুসনাদে আবু নুয়াইম) এরুপ আরেকটি হাদিস রয়েছে।

*এই হাদিস দ্বারাও প্রমানিত বাবা আদম (আঃ) (যিনি মাটির তৈরী প্রথম মানুষ ও নবী) সৃষ্টি হওয়ার পূর্বেও রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম নবী ছিলেন। যখন নবীজি ছিলেন, তখন মাটির তৈরী প্রথম মানুষই সৃষ্টি হয়নি তাহলে নবী পাক ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম মাটির সৃষ্টি হবে কেমন করে।

#দলিলঃ عن عبد الرزاك عن معمر عن منكدير عن جابر بن عبد !لله الانصارى قال قلت يا رسول الله بابى انت وامى اخبرنى عن اول شئ خلفه الله تعالى قبل الاشياء قال يا جابر ان الله تعالى قد خلق قبل الاشياء نور نبيك من نوره ..... *অর্থঃ ঈমাম আব্দুর রাজ্জাক (রঃ) মামার (রঃ) হতে, তিনি মুন্‌কাদির (রঃ) হতে, তিনি জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) হতে, তিনি বলেন: আমি নবী করিম ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম কে জিজ্ঞাসা করলাম, আমার পিতা মাতা আপনার কদমে কুরবানী ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে সংবাদ দিন কোন জিনিস আল্লার সব কিছুর পূর্বে তৈরী করেছেন? নবীজি বলেন: হে জাবের! নিশ্চয় আল্লাহ সব কিছুর পূর্বে তাঁর নুর থেকে তোমার নবীর নূর তৈরী করেছেন .....(মুছান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক, ১ম খন্ড, ৯১ পৃ: (পুরাতন ছাপা); মাওয়াহেবুল্লাদুন্নিয়া, ১ম খন্ড, ৭১ পৃ:; নসরুত্তিব, কৃত: মাওঃ আশরাফ আলী থানভী, পৃ: ৫; ছিরাতে হলভিয়া, ১ম খন্ড, ১৩২ পৃ:; কাশফুল খফা, ১ম খন্ড, ২৩৭ পৃ:) "কাশফুল খফা" কিতাবেহই হাদিসটি সঠিক দাবীতে উল্লেখ আছে।

*এই হাদিসটি সহি। সুতরাং আল্লাহ তাঁর নুর দিয়ে আমাদের নবীকে তৈরী করেছেন। আর নবীর নুর দিয়ে সারার জাহান তৈরী করেছেন।

[বি: দ্র:জেনে রাখা দরকার যে, ওহাবীরার এই হাদিসটিকে 'মুছান্নাফ' এর-নতুন সংস্করণ থেকে বাদ করে দিয়েছেন, পুরাতন ছাপা কিতাবে এই হাদিস মওজুদ রয়েছে। প্রয়োজনে ইন্টারনেট সার্স করে দেখুন, সেখানে পুরানো সম্পূর্ণ কিতাবটি দেওয়া আছে]

*এরই প্রেক্ষিতে বিশ্বওলী খাজা বাবা ফরিদপুরী (কু: ছে: আ:) বলেন: আল্লাহ তা'লা নবী করিম ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম এর নুর দ্বারা বিশ্বব্রহ্মান্ড সৃষ্টি করিয়াছেন। অন্যান্ন নবীগণকেও তদীয় নুর বা নূরে মুহাম্মদী দ্বারা সৃষ্টি করা হইয়াছে (১৫ নং বই, ৬৪ পৃ:)।

#দলিলঃ لما اراد الله تعالى فقبض قبضة من نوره ثم قال لها كونى حبيبى محمد فطلف محمدا *অর্থঃ হজরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, যখন আল্লাহ মাখলুকাত সৃষ্টি করতে ইচ্ছা করলেন তখন তাঁর নুর থেকে নুর লইয়া বললেন তুমি আমার হাবিব হয়ে যাও (নজহাতুল মাজালিছ, মাওয়াহেবুল্লাদুন্নিয়া, ১ম খন্ড)।

#দলিলঃ عن ابن مرزوق عن علي بن الحسين عن ابه عن جده ان النبى صلى الله عليه وسلم قال كنت نورا بين يدي ربي قبل خلق ادم

باربعة عشر الف عام *অর্থঃ ইবনে মারজুক (রঃ) আলী ইবনে হুছাইন থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে, তিনি তাঁর দাদা (হজরত আলী) থেকে বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম বলেছেন: আমি আমার রবের নিকট আদম সৃষ্টির ১৪ হাজার বছর পূর্বে নুর হিসেবে বিদ্যমান ছিলাম (মাওয়াহেবুল্লাদুন্নিয়া, ১ম খন্ড, ৭২ পৃ:; আনওয়ারে মুহাম্মদীয়া; তাফছিরে রুহুল বয়ান, ২য় খন্ড, ৪২৯ পৃ:; নশরুতিবীব, পৃ: ৫ কৃত: আশরাফ আলী থানভী সাহেব)।

*এই হাদিসটিও সহি। সুতরাং নবী করিম ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম নুরের ইহাই সঠিক।

#দলিলঃ আদম (আঃ) এর সামনে সকল মানুষের রুহ রাখার পর একটি খুব চমকাচ্ছিল। আদম (আঃ) প্রশ্ন করলেন ওহে আল্লাহ ঐ লোকটি কে? তখন আল্লাহ বললেন: هذا نور نبى من زريتك اسمه فى السماء احمد وفى الارض محمد لولاه ما خلقتك وما خلقت سماء والارضا *অর্থঃ ইহা আমার নুর নবী! যা তোমার বংশধরের একজন। আসমানে তাঁর নাম হবে আহ্‌মদ ও জমীনে তাঁর নাম মুহাম্মদ। যদি আমি তাঁকে না বানাইতাম তাহলে তোমাকেও বানাইতাম না, আসমান জমীন কিছুই বানাইতাম না (মাওয়াহেবুল্লাদুন্নিয়া, ১ম খন্ড, ৭০ পৃ:)।

*এই হাদিসে স্পষ্ট বলা আছে هذا نورنبى ইহা আমার নুর নবী। তাহলে বলুন! নবীজিকে আল্লাহ নুরের নবী বললেন কেন?

#দলিলঃ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اول ما خلق الله نورى *অর্থঃ আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম বলেন: আল্লাহ সর্বপ্রথম আমার নুর সৃষ্টি করেছেন (মাদারে যুন্নবুয়াত, ১ম খন্ড, ৭ পৃ:; তাফছিরে রুহুল মায়ানী, ৮ম খন্ড, ৪২৪ পৃ:; তাফছিরে নিছাফুরী, তাফছিরে রুহুল বয়ান, ২য় খন্ড, ৪২৯ পৃ:; তাফছিরে মারেফুল কোরআন, সূরা আনয়ামের শেষের দিকে; ছেররুল আছরার, কৃত: গাউছে পাক আব্দুল কাদের জিলানী (রা:) ৪৮ পৃ:; কাশফুল খফা, ১ম খন্ড, ২৩৭ পৃ:)।

*এই হাদিস মশহুর হিসেবে সকল ফকিহ্ ও মোফাচ্ছেরীণ গণের নিকট গ্রহনযোগ্য। আল্লামা শেখ আব্দুল হক্ব মোহাদ্দেছ দেহলভী (রঃ) এই হাদিসটিকে সহি বলে দাবী করেছেন। সুতরাং আল্লাহর নবী ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম আল্লাহর নুরে সৃষ্ট।

#দলিলঃ قال عليه الصلوة والسلام انا من نور الله والمؤمنون من فيض نورى *অর্থঃ নবী করিম ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম বলেন: আমি আল্লাহর নুর হতে সৃষ্ট, মু'মিন আমার নুরের ফয়েজ থেকে সৃষ্ট (তাফছিরে রুহুল বয়ান, ৯ম খন্ড, ৬৩ পৃ:; ছেররুল আছরার, ৪৯ পৃ:)।

#দলিলঃ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقت انا من نور الله وخلق من نورى *অর্থঃ আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম

বলেছেন, আমি আল্লাহর নুরের সৃষ্টি আর সৃষ্টি জগতের সব কিছু আমার নুরে সৃষ্টি (মতায়েনুল মুছাররাত শরহে দালায়েলুল খায়রাত)।

*এই হাদিসটির সাথে "মুছান্নাফের" জাবের (রাঃ) এর হাদিসটির মিল রয়েছে।

*এই জন্যেই বিশ্ব ওলী খাজাবাবা ফরিদপুরী (কু: ছে: আ:) বলেন: দয়াল নবী ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম প্রথম সৃষ্ট। তিনি আল্লাহর নুরে সৃষ্ট এবং তাবৎ বস্তু তাহার নুরে সৃষ্ট (১৫ নং বই, ২৫ পৃ:)।

#দলিলঃ হজরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত: একদা নবী ছাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়া ছাল্লাম জিব্রাইল (আঃ) কে জিজ্ঞাসা করলেন: يا جبريل كم عمرك হে জিব্রাইল তোমার বয়স কত? জিব্রাইল বললেন আমি তা জানিনা من السنين ইয়া রাসূলাল্লাহ! তবে একটি তারকা দেখেছি যা ৭০ হাজার বছর পর উদিত হত আবার ডুবলে আবার ৭০ হাজার বছর পর উদিত হত। এভাবে আমি ৭২ হাজার বার উদিত হতে দেখেছি। নবীজি বললেন: يا جبريل وعزة انا ذلك الكوكب *হে জিব্রাইল আল্লাহর ইজ্জতের কসম! আমিই সেই তারকা (তাফছিরে রুহুল বয়ান, ৩য় খন্ড, ৬৫১ পৃ:;.নশরুত্তিব, ৫ পৃ:; ছিরতে হলভিয়া, ১ম জি: ১৩২ পৃ: আল্লামা বুরহান উদ্দিন হলভী (রঃ) হাদিসটি উল্লেখ করে বলেন رواه البخارى অর্থাৎ ঈমাম বুখারী হাদিস বর্ণনা করেছেন।

[বি: দ্র: ঈমাম বুখারী কৃত: কিতাব হল:- সহি বুখারী, তারিখুল কাবির, আল আদাবুল মোফরাদ ইত্যাদি, এছাড়াও তিনি সারে ছয় লক্ষ হাদিসের হাফেজ ছিলেন]

*সুতরাং নুরের সৃষ্ট ফেরেস্থা জিব্রাইল (আঃ) সৃষ্টির পূর্বেও আমাদের নবীর সৃষ্টি, যখন মাটির অস্থিত্বও ছিল না।

#দলিলঃ قال الله تعالى خلقت محمدا من نور وجهى *অর্থঃ মহান আল্লাহ তা'লা বলেন: আমি মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম কে আমার চেহারার নুর দ্বারা তৈরী করেছি (ছেররুল আছরার, কৃত: গাউছে পাক আব্দুল কাদের জিলানী (রা:) ৪৮ পৃ:)।

*হাদিসটি মোতাশাবিহাতের অন্তর্ভূক্ত, তবে এর দ্বারা জানা যায় আল্লাহর নুর দিয়েই নবীজিকে সৃষ্টি করেছেন।

*ছায়া বিহীন নবীঃ

#দলিলঃ عن جقون ان النبى صلى الله عليه وسلم لم يكن يرى له ظل فى شمس ولا قمر *অর্থঃ হজরত যাকওয়ান (রাঃ) বলেন, নবী ছাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়া ছাল্লাম এর দেহ মোবারকের ছায়া চন্দ্র-সূয্যের মধ্যে পরত না (হাকেম তিরমিজি কৃত: 'নাওয়াদেরুল উছুল' কিতাবে; শুকরুন নিমা, ৩৯ পৃ:; মাদারে যুন্নবুয়থ, ১ম খন্ড, খাছায়েছুল কোবরা)।

#দলিলঃ لم يكن له صلى الله عليه وسلم ظل فى شمس ولا قمر لانه كان نورا *অর্থঃ চন্দ্র-সূয্যের আলোতে নবী ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম এর দেহ মোবারকের ছায়া পরত না। কারন তিনি ছিলেন নুর (যুরকানী শরিফ)।

#দলিলঃ وما ذكر من انه كان لاظل لشمخصه فى شمس ولا قمر لانه كان نورا *অর্থঃ নুরের দলিল হিসেবে ছায়াহীন দেহের যে রেওয়াতটি পেশ করা হয় তা হল: দিনের সূয্যের আলো কিংবা রাতের চন্দ্রের আলো কোনটিতেই নবী ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম এর ছায়া পরত না। কারন তিনি ছিলেন নুর (শিফা শরিফ, ১ম খন্ড, ২৪২ পৃ:)।

**এই দলিল গুলো দ্বারা জানা যায় যে, নবী করিম ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম এর দেহ মোবারকের কোন ছায়া ছিল না। আমরা জানি মাটির দেহের ছায়া আছে কিন্তু আমাদের নবীর কোন ছায়া ছিল না সুতরাং নবী ছাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়া ছাল্লাম মাটি নয়, নুর।

#দলিলঃ عن زرارة بن اوفى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجبرئيل هل رايت ربك فانتقض جبرئيل وقال يا محمد ان بينى وبينه سبعين حجاب من نور لو دنوت من بعضها لاحترقت *অর্থঃ হজরত যুরারা ইবনে আওফা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম একদা জিব্রাইল (আঃ) কে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনিকি রবকে দেখেছেন? এই কথা শুনে জিব্রাইল কেপে উঠলেন এবং বললেন ইয়া মুহাম্মদ! আমার ও তাঁর মাঝে ৭০টি নূরের পর্দা রয়েছে, যদি আমি ইহার কোন একটির নিকটবর্তী হই তবে আমি জ্বলে যাব (মেসকাত শরিফ, ৫১০ পৃ:; মেরকাত, ১০ম খন্ড, ৪১০ পৃ:; মাসাবীহুছ ছুন্নাহ, হা: নং ৪৪৫৭; জামেঈছ ছাগীর, হা: নং ৪৬১০; আবু নুয়াইম তাঁর 'হুলিয়া' কিতাবে; মেরআতুল মানাজিহ)।

#দলিলঃ عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله خلق اسرافيل منذ يوم خلقه صاقا قدميه لا يرفع بصره بينه وبين الرب تبارك وتعالى سبعون نورا ما منها من نور يدنو منه الا احترق *অর্থঃ হজরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম বলেছেন: আল্লাহ যেদিন ইস্রাফিল (আঃ) কে সৃষ্টি করলেন, তিনি তখন হতে নিজের দুই পায়ের উপর দাড়িয়ে রয়েছেন। চক্ষু তুলেও দেখেননি। তাঁর ও রবের মাঝে ৭০টি নূরের পর্দা রয়েছে। তিমি এগুলোর যে কোন একটি পর্দার নিকটবর্তী হলে তখনই ইহা তাঁকে জ্বালিয়ে ফেলবে (মেসকাত, ৫১০ পৃ:; মেরকাত, ১০ম খন্ড, ৪১০ পৃ:; তিরমিজি, সহি সনদে; বায়হাক্বী শুয়াইবুল ঈমান, হা: নং ১৫৭; মেরআতুল মানাজিহ)।

*লক্ষ্য করুন! জিব্রাইল (আঃ) ও ইস্রাফিল (আঃ) উভয়ই নূরের তৈরী ফেরেস্তা, অথচ আল্লাহর ৭০টি নূরের পর্দার কাছেও যেতে পারেনা। নূরের তৈরী ফেরেস্থারা নিকটে গেলে যদি জ্বলে যায়, তাহলে নবী ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম যদি মাটির তৈরী হতেন তাহলে মেরাজের রাতে আল্লাহর একেবারে নিকটে কিভাবে গেলেন? অথচ তিনি জ্বললেনও না।

মাটি'ত দূরের কথা নূরের তৈরী ফেরেস্তারা যেখানে যেতে পারেনা, সেখানে আমার নবী ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম গেছেন। তাইত ঈমাম মহিউদ্দিন ইবনুল আরাবী (রঃ) বলেছেন: জিব্রাইলের নূরের ক্ষমতা যেখানে শেষ, সেখান হতে আমার নবীর নূরের ক্ষমতা শুরু।

*কিছু আয়াতের বিশ্লেষণঃ

* خلق الانسان من صلصال كالفخار *অর্থঃ আমি মানুষকে ঠনঠনে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছি (সূরা আর রহমান, ১৪ নং আয়াত)।

*এই আয়াতের তাফছিরে উল্লেখ আছে:

#দলিলঃ والمراد بالانسان ادم عند جمهور *অর্থঃ ইনছান দ্বারা মুরাদ হল আদম (আঃ) ইহা অধিকাংশের অভিমত (তাফছিরে রুহুল মায়ানী, ২৭ তম খন্ড, ১৩৭ পৃ:)।

#দলিলঃ خلق الانسان الذي هو ادم *অর্থঃ ইনছান সৃষ্টি করবেন আর তিনি হলেন আদম (আঃ) (তাফছিরে খাজেন শরিফ, ৪র্থ খন্ড, ২২৬ পৃ:; তাফছিরে তাবারী শরিফ, ২৮ তম খন্ড, ১৩১ পৃ:)।

**এই ব্যাপারে সকল মোফাচ্ছেরীণ গণ একমত যে এই আয়াতে انسان দ্বারা মুরাদ হল বাবা আদম (আঃ)। সুতরাং আদম (আঃ) এর শানে আয়াত দ্বারা নবীজিকে মাটির তৈরী বলা চরম মূর্খতা। যদি এরুপ কেউ বলে তাহলে বুজতে হবে তাফছিরের কিতাব সম্পর্কে সে কোন জ্ঞাণই রাখেনা।

* اذ قال ربك للملائكة انى خالق بشرا من طين فاذا صورتهونفخت فيه من روحى فقعواله ساجدين فسجد الملائكة كلهم اجمعون الا ابليس *অর্থঃ যখন তোমার রব ফেরেস্তাদের বললেন: আমি মাটি দিয়ে বাশার তৈরী করব। আর যখন আকৃতি দেওয়া সমাপ্ত হবে তখন তাতে রুহ প্রবেশ করাব। তখন তোমরা তাঁর প্রতি সেজদায় পতিত হবে। অতঃপর ইবলীছ ব্যতিত সকল ফেরেস্তাগণ সিজদায় পতিত হল (সূরা সোয়াদ: ৭১)।

*এই আয়াতের তাফছিরে উল্লেখ আছে:

#দলিলঃ (انى خالق بشرا من طين) يعنى ادم عليه السلام *অর্থঃ নিশ্চয় আমি মাটি থেকে 'বাশার' সৃষ্টি করব, 'বাশার' মানে বাবা আদম (আঃ) (তাফছিরে সামরকান্দী, ৩য় জি: ১৪১ পৃ:)।

#দলিলঃ (اذ قال ربك للملائكة انى خالق بشرا من طين) يعنى: ادم عليه السلام *অর্থঃ যখন আল্লাহ ফেরেস্তাদেরকে বললেন: আমি মাটি থেকে বাশার সৃষ্টি করব। এই বাশারের অর্থ হল বাবা আদম (আঃ) (তাফছিরে মায়ালেমু তানজিল, ৪র্থ খন্ড, ৩৬৬ পৃ:)।

#দলিলঃ انى خلق بشرا من طين هو ادم *অর্থঃ নিশ্চয় আমি মাটি থেকে বাশার সৃষ্টি করব, 'বাশার' তিনি বাবা আদম (আঃ) (তাফছিরে জালালাইন শরিফ, ৩৮৪ পৃ:)।

#দলিলঃ اذ قال ربك للملائكة انى خالق بشرا من طين اي ادم عليه السلام *অর্থঃ যখন আল্লাহ ফেরেস্তাদেরকে বললেন: আমি মাটি থেকে বাশার তৈরী করব অর্থাৎ আদম (আঃ) (তাফছিরে খাজেন শরিফ, ৪র্থ খন্ড, ৪৭ পৃ:)।

#দলিলঃ انى خالق بشرا من طين يعنى بذلك خلق ادم *অর্থঃ নিশ্চয় আমি বাশার সৃষ্টি করব, অর্থাৎ, এমনিভাবে আমি আদমকে সৃষ্টি করব (তাফছিরে তাবারী শরিফ, ২৩ তম জি: ১৮৮ পৃ:)।

*অতিব আফছোছ! যে, এই আয়াত দিয়ে প্রিয় নবীজিকে ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম অনেকে মাটির তৈরী বলতে চান। একজন সাধারণ ব্যক্তিও বুজতে পারবে যে এই আয়াতে بشرا (বাশার) বলতে যাকে সম্বোধন করা হয়েছে তিনি বাবা আদম (আঃ)। কারন আদম (আঃ) কেই ফেরেস্তারা সেজদা করেছিল, ইবলীছ ব্যতিত। যদি কেউ বলেন এখানে بشرا শব্দটি عام বা نكرا তাহলে বলব: তাহলে কি সকল মানুষকে ফেরেস্তারা সেজদা করেছেন? বরং তা নয়, ইহা আদম (আঃ) ই বটে, যা সূরা বাকারায় এভাবে উল্লেখ আছে: واذ قال ربك للملائكة انى جائل فى الارض خليفة......فسجدوا الا الابلس *অর্থঃ আর যখন তোমার রব ফেরেস্তাদের বললেন আমি জমীনে খলিফা প্রেরণ করব...... তখন সবাই সেজদা করল কিন্তু ইবলীছ ব্যতিত (সূরা বাকারা, ৩০)।

*এই খলিফা যাকে ফেরেস্তারা সেজদা করেছেন তিনি বাবা আদম (আঃ)। উভয় আয়াতে একই ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। সুতরাং بشرا (বাশার) শব্দটি نكرا (নাকেরা) হলেও ইহা দ্বারা বাবা আদম (আঃ) কেই বুজায়, আর এ ব্যাপারে সকল মোফাচ্ছেরীনগণ একমত।

*.....هو الذى خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم علقة *অর্থঃ তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে অতঃপর নুত্ফা রুপে অতঃপর রক্তপিন্ড রুপে অতঃপর মাংশপিন্ড রুপে...... (আল কোরআন)।

*এই আয়াতে خلقكم তোমাদের সৃষ্টি করেছি, দ্বারা সকল মানুষকে বুজানো হয়েছে, আমাদের নবী ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম ব্যতিত। কারন মাটি সৃষ্টি হওয়ার বহু পূর্বে নবী করিম ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম কে সৃষ্টি করা হয়েছে। কারন আল্লাহ বলেছেন لولاك ما خلقت السماء والارض *অর্থাৎ, ওহে আমার নবী! আপনাকে না বানাইলে আসমান ও মাটির জমীন বানাইতাম না।

*পূর্বে এ ব্যাপারে দলিল সহ আলোচনা হয়েছে। আর সকল মানুষের মূল হল মাটি, অতঃপর ঐ মাটি 'নুত্ফা' আকারে (যার মাঝে আগুণ, পানি, মাটি ও বাতাস মিশানো থাকে) পিতার পৃষ্ট থেকে মায়ের রেহেমে স্থানান্তর হয়, অতঃপর ইহা রক্তপৃন্ড রুপে অবস্থান করে, অতঃপর মাংশপৃন্ড রুপে, অতঃপর পর্যায়ক্রমে আকৃতি ধারণ করে। জেনে রাখা দরকার সকল মানুষের বিধান ও

আমাদের নবী রাসূলে পাক ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম এর বিধান এক রকম নয়। যেমন নবী পাক ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম قَال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت اول الناس فى الخلق বলেছেন:

*অর্থঃ রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম বলেছেন: আমি সৃষ্টির প্রথম মানুষ (তারিখে ইবনে আছাকির)। অর্থাৎ, মাটির তৈরী প্রথম মানুষ বাবা আদম (আঃ) এরও পূর্বে নবী পাক ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম রুহ ও দেহদারী মানুষ ছিলেন। আমাদের নবী হয়েছে'ত মাটির সৃষ্টি হয়েছে। নবী হয়েছে'ত দুনিয়া হয়েছে। নবী হয়েছে'ত ফেরেস্তারা হয়েছে। আল্লাহ বলেন;لو لاك ما خلقت الدنيا নবী আপনে না হলে দুনিয়াও বানাইতাম না (তারিখে ইবনে আছাকির, মাওজুআতুল কাবির, ১০১ পৃ:)।

*কিছু হাদিসের বিশ্লেষণঃ

*হজরত কা'ব আহবার (তাবেঈ) বলেন: যখন আল্লাহ তাঁর নবীকে সৃষ্টি করার ইচ্ছা করলেন তখন তিনি জিব্রাইল (আঃ) কে খামিরা আনতে নির্দেশ দিলেন যা ছিল: قلب الارض وبها وَها ونورها *ইহা জমীনের ক্বাল্ব ও জমীনের নুর। এই নির্দেশ পেয়ে জিব্রাইল (আঃ) জান্নাতুল ফেরদৌস ও সর্বোচ্ছ আসমানের ফিরিস্তাদের নিয়ে পৃথিবীতে অবতরন করলেন। অতঃপর রাসূলে পাকের রওজা পাকের স্থান থেকে এক মুষ্টি খামিরা নিলেন.....(মাওয়াহেবুল্লাদুন্নিয়া, ১ম খন্ড)।

**এই হাদিসটি মাক্তু পর্যায়ের। কারন কাব আহবার (রঃ) একজন তাবেঈ, আর তাবেঈ এর ব্যক্তিগত বর্ণিত হাদিসকে মাক্তু হাদিস বলা হয়। কাব আহবার (রঃ) হাদিস বর্ণনা করেছেন কিন্তু কোন সাহাবীর উদ্ধিতি দেননি।

*সকলেই একমত যে, কোন মাক্তু হাদিস মরফু কিংবা মাওকুফ হাদিসের মোকাবেলায় গ্রহনযোগ্য নয়। আর আমরা অনেকগুলো মরফূ ও মাওকুফ হাদিস উল্লেখ করেছি যা দ্বারা প্রমানিত যে রাসূলে পাক ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম মাটি সৃষ্টির পূর্বেই স্ব-শরীরে মানুষ অবস্থায় নবী ছিলেন। তদাপিও কাব আহবারের বর্ণনায় উল্লেখ আছে قلب الارض وبها وَها ونورها ইহা জমীনের ক্বাল্ব ও জমীনের নুর। অর্থাৎ, জিব্রাইল যে খামিরা নিয়েছিল তা জমীনের নুর। যদি হাদিসটি গ্রহনযোগ্য ধরে নেই। সম্ভবত আল্লাহ পাক নুরে মুহাম্মদীকে খামিরা রুপে নবী পাকের রওজায় রেখেছেন আর জিব্রাইল (আঃ) ঐ খামিরা নিয়ে যান।

* عن ابن مسعود قَال رسول الله (ص) ما من مولود الا وفى سرته من تربته التى خلقَ منها حتى يدفن فيها وانا وابو بكر و عمر خلقنا من تربة واحد وفيها ندفن *অর্থঃ হজরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন রাসূল ছাল্লাল্লাহু

আলায়হি ওয়া ছাল্লাম বলেছেন প্রত্যেক শিশুর নাভিতে মাটি রাখা হয় যেখানে তাকে দাফন করা হয়। তিনি আরোও বলেন আমি আবু বকর ও উমর একই মাটির তৈরী এবং একই জায়গায় দাফন হব (তারিখে বোগদাদ)।

*এই হাদিসটি বর্ণনা করে খতীবে বোগদাদী বলেন এই হাদিস গরীব। গরীব হাদিস কোন আইনী ব্যাপারে গ্রহনযোগ্য নয়।

*বিশ্ব বিখ্যাত হাদিস বিশারদ আল্লামা ইবনে জওজী (রঃ) বলেন: ইহা জাল ও বানোয়াট (তাফছিরে মারেফুল কোরআন, ৮৫৬ পৃ: সৌ: সং: বা:; তাফছিরে মাজহারী)।

*দলিলঃ الخطيب عن ابن مسعود وقال: غريب واورده ابن جوزي فى الموضوعات *অর্থঃ 'খতীব' ইবনে মাছউদ থেকে বর্ননা করে বলেন: ইহা গরীব হাদিস। আল্লামা ইবনে জাওজী (রঃ) মওজু রিওয়াত হিসেবে উল্লেখ করেন (তাফছিরে মাজহারী, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৭৩ পৃ:)।

*এরুপ একটি 'জাল' হাদিস দিয়ে নবীজিকে মাটির মানুষ বলা মূর্খতা ছাড়া কিছুই নয়।

*এর পরও যদি এই হাদিস সহি হত, তাহলে এখানে হজরত ঈসা (আঃ) এর নাম উল্লেখ থাকত, কারন শেষ যুগে নবী পাকের রওজা শরিফের পাশে হজরত ঈসা (আঃ) কেউ দাফন করা হবে। প্রত্যেক মিথ্যার একটি না একটি প্রমান থাকে।

*মদিনা শরিফের মাটিও নবী পাকের উছিলায় সৃষ্টি হয়েছে। তাহলে নবী করিম ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম ঐ মাটি দিয়ে তৈরী হয় কিভাবে?

*ছওয়াল-জবাবঃ

*ছওয়ালঃ আমরা জানি নুরের তৈরী ফেরেস্তারা মাটির তৈরী আদম (আঃ) কে সেজদা করেছেন। এতে বুজা যায় নুরের চেয়ে মাটির মর্যাদা বেশী। তাই নবী ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম কে নুরের তৈরী বললে নবীজির ইজ্জত কি কমেনা?

*জবাবঃ না কমেনা। কারন মাটির মর্যাদা নুরের চেয়ে বেশী নয়। যদি ধরে নেই মাটির মর্যাদা নুরের চেয়ে বেশী, তাহলে রবী ঠাকুর, রবিন্দ্র নাথ ঠাকুর, বুশ, টনী ব্রেয়ার, ফেরাউন, নমরুদ, কারুন প্রমূখ তারা অবশ্যই মাটির মানুষ ছিলেন। তাহলে কি নুরের তৈরী ফেরেস্তা জিব্রাইল (আঃ), মিকাইল (আঃ) ও অন্যান্ন নুরের তৈরী ফেরেস্তাদের চেয়ে এদের মর্যাদা বেশী? (নাউজুবিল্লাহ)

*যে কোন মানুষ হোক, যতক্ষণ পর্যন্ত তার-মাঝে নুরের সম্পর্ক না আসবে ততক্ষণ তার মর্যাদা বাড়বে না।

*একজন মুসলমান ও কাফেরের মর্যাদাও এক সমান নয়। কারন মুসলমানের কাছে আছে: ঈমান, ইসলাম, ইলিম ও কুরআন। আর এগুলো

الايمان نور। ইসলাম নুর। الاسلام نور। এলেম নুর। العلم نور। সবই নুর। ঈমান নুর। القران نور। কুরআন নুর। সুতরাং নুর থাকার কারনে মাটির মানুষের নাম 'মুসলমান' হয় ফলে মাটির মানুষের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়।

*তাফছিরে কবির শরিফে ...تلك الرسول এর ব্যাখ্যায় উল্লেখ আছে: বাবা আদম (আঃ) এর কঁপালে আমাদের নবী ছাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়া ছাল্লাম এর নুরে মুহাম্মদী ছিল। এজন্যই তাঁর দিকে ফিরে ফেরেস্তাদের সেজদা করার হুকুম আল্লাহ দিয়েছেন।

*সুতরাং নুরে মুহাম্মদী থাকার কারনে বাবা আদম (আঃ) এর মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে।

*আরেকটি বিষয় লক্ষ্যনীয় যে, ফেরেস্তারা কেউ বাবা আদম (আঃ) কে সেজদা করেননি, বরং আদম (আঃ) এর দিকে ফিরে সেজদা করেছেন। যেমন আয়াতে বলা আছে: اسجدوا لادم অর্থাৎ, তোমরা আদমের প্রতি সেজদা কর। যেমন আমরা কাবা'র দিকে ফিরে সেজদা করি কিন্তু কাবাকে কেউ সেজদা করিনা। ফেরেস্তারা সেজদা করেছেন আল্লাহ্কেই, আদম (আঃ) শুধু কেব্লার মত সামনে ছিল, যেমনিভাবে আমাদের সামনে কাবা থাকে। যেমন তাফছিরে উল্লেখ আছে: جعل الله تعالى ادم قبلة للملائكة كما جعل الكعبة قبلة للناس *অর্থঃ আদম (আঃ) কে ফেরেস্তাদের কেব্লা বানানো হয়েছিল যেমনি কাবা মানুষের কেব্লা (তাফছিরে মাজহারী, ৫ম খন্ড, ১৬৩ পৃ:)।

*আদম (আঃ) এর কঁপালে নুরে মুহাম্মদী থাকার কারনে ফেরেস্তাদের কেব্লা হওয়ার যোগ্যতা লাভ করেছেন।

#ছওয়ালঃ এক হাদিসে আছে: اول ما خلق الله نورى *অর্থাৎ আল্লাহ সর্বপ্রথম আমার নুর সৃষ্টি করেছেন। আরেক হাদিসে আছে: اول ما خلق الله روحى *অর্থাৎ আল্লাহ সর্বপ্রথম আমার রুহ সৃষ্টি করেছেন। দু'টি হাদিস একত্র করলে বুজা যায় আল্লাহ সর্বপ্রথম নুর দিয়ে নবীজির রুহ মোবারক তৈরী করেছেন।

#জবাবঃ বিশ্ব ওলী খাজা বাবা ফরিদ পুরী (কু: ছে: আ:) বলেন: রাসূলে পাক ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম "আমার রুহ" বলিয়া যে রুহের প্রতি ঈঙ্গিত করিয়াছেন তাঁহা তাঁহার রুহ্ ঠিকই তবে তাঁহার মধ্যে রাসূলে পাক ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম এর নুর ও তদীয় পার্থিব সত্বা এই দুই অবস্থা বিদ্যমান (কামেল পীরের আবশ্যকতা, ১১৭ পৃ:)।

*অর্থাৎ, সর্ব প্রথম আল্লাহ তাঁর নুর দিয়ে নবী পাকের দেহ ও রুহ উভয় তৈরী করেছেন। যেহেতু নবীজির রুহ বলতে দেহ ও রুহ উভয়ই বুজায়। যেমন পবিত্র কোরআনে উল্লেখ আছে: تنزل الملائكة والروح *অর্থাৎ কদরের রজনীনে অসংখ্য ফেরেস্তা ও রুহ্ নাজিল বা প্রেরিত হয় (সূরা কদর)।

*এই আয়াতে 'রুহ' বলতে হজরত জিব্রাইল (আঃ) কে বুজানো হয়েছে। এ ব্যাপারে সকল মোফাচ্ছেরীনে কেরাম একমত। যেমন: معنى ذلك: تنزل الملائكة و جبريل معهم وهو الروح *অর্থঃ ইহার অর্থ হল: জিব্রাইল (আঃ) সকল ফেরেস্তাদের সাথে নাজিল হন, কারন তিনিই রুহ (তাফছিরে তাবারী শরিফ, ৩০ তম খন্ড, ২৮৫ পৃ:)।

#দলিলঃ واما الروح فقيل المراد به هاهنا جبريل *অর্থঃ অপর দিকে 'রুহ' যাকে বলা হয়, ইহার মুরাদ হল জিব্রাইল (তাফছিরে ইবনে কাছির, ৪র্থ খন্ড, ৬৫২ পৃ:)।

#দলিলঃ يعنى جبريل عليه السلام معهم *অর্থঃ অর্থাৎ জিব্রাইল (আঃ) তাঁদের সাথে (তাফছিরে মায়ালেমু তানজিল, ৫ম খন্ড, ৩৮২ পৃ:; তাফছিরে দূর্রে মানছুর, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৬৭৩ পৃ:)।

এরুপ অনেক রেফারেন্স দেওয়া যেতে পারে। সংক্ষিপ্ত করার জন্য ক্ষান্ত হলাম। অর্থাৎ কদরের রাতে ফেরেস্তা জিব্রাইল (আঃ) অসংখ্য ফেরেস্তাদের নিয়ে জমীনে প্রেরিত হন।

'রুহ্' বলতে যদি নুরের দেহধারী জিব্রাইল (আঃ) কে বুজানো যেতে পারে, তাহলে 'রুহ' দ্বারা কেন নবী করিম ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম এর 'দেহ ও রুহ' উভয় কে বুজানো যাবেনা?

*'রুহ্' বলতে আলাদা কোন সৃষ্টি নয় বরং রুহ্ হল আল্লাহর আদেশ। যেমন কোরআনে উল্লেখ আছে: قل الروح من امر ربى *অর্থঃ বলুন রুহ্ আল্লাহর আদেশ (আল কোরআন)।

রুহ সম্পর্কে خلق 'সৃষ্টি' শব্দটি আল্লাহর আদেশকেই মজাজী বা রুপক অর্থে ব্যবহার করা হয়। মূলত 'রুহ্' কোন সৃষ্টি নয়, ইহা আল্লাহর আদেশ যা কোন পবিত্র কোরআন দ্বারা প্রমানিত।

*আরেকটি বিষয় লক্ষ্যনীয় যে, আমরা যখন:-اول ما خلق الله نورى এই হাদিসটি বলি তখন আপনারা আমাদের বলেন ইহা কোন কিতাবে সনদ সহ উল্লেখ নেই। এখন যদি আমরা জিজ্ঞাসা করি: اول ما خلق الله روحى এই হাদিসটি বিশ্বের কোন হাদিসের কিতাবে সনদ সহ উল্লেখ আছে?

#ছওয়ালঃ মাটির মানুষকে দেখা যায়, কথা বলা যায় ও তাদের চুল দাড়ি পশম ইত্যাদি রয়েছে। নবীজি যদি নুরের তৈরী হতেন তাহলে তাঁকে দেখা যেত, কথা বলা যেত ও তাঁর চুল দাড়ি ও পশম মোবারক ছিল কেন?

#জবাবঃ নুরের তৈরী মানুষকেও দেখা যায়, কথা বলা যায় ও তাঁদের চুল, দাড়ি ও পশম থাকতে পারে।

*বলুন! আল্লাহ কি নুর দিয়ে মানুষ তৈরী করতে পারেনা? অবশ্যই পারে।

#দলিলঃ عن ابى هريرة قال كان النبى صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس فاتاه رجل فقال ما الايمان قال الايمان ان تؤمن بالله...قال ما

الاسلام قَال الاسلام ان تَعبدَ الله ولا تشرك به.....قَال ما الاحسان قَال ان تَعبدَ الله كانك تَراه ....ثم ادبر فقال ردوه فلم يروا شيءا فقال هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم *অর্থঃ হজরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন একদিন রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম জনসমক্ষে বসা ছিলেন, এমন সময় তাঁর কাছে এক ব্যক্তি এসে জিজ্ঞাসা করলেন 'ঈমাম কি'? তিনি বললেন ঈমান হল আপনি আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস রাখবেন.....অতঃপর জিজ্ঞাসা করলেন ইসলাম কি? তিনি বললেন ইসলাম হল আল্লাহর ইবাদত করবেন ও তাঁর সাথে কাউকে শরিক করবেন না...... অতঃপর জিজ্ঞাসা করলেন: এহছান কি? তিনি বললেন এমন ভাবে আল্লাহর ইবাদত করবেন যেন তাঁকে দেখতে পান............ এরপর ঐ ব্যক্তি চলে গেলে তিনি বললেন তোমরা তাঁকে ফিরিয়ে আন। তাঁরা কিছুই দেখতে পেল না। তখন তিনি বললেন ইনি জিব্রাইল (আঃ)। লোকদেরকে তাদের দ্বীন শেখাতে এসেছিল (সহি বুখারী, ১ম জি: ১২ পৃ:; ফাতহুল বারী)।

*এই হাদিস দ্বারা প্রমান হয় যে, নুরের তৈরী ফেরেস্তারাও মানুষের ছুরত ধারণ করতে পারে, তাঁদেরকে দেখা যায় ও কথা বলা যায়। নুরের তৈরী ফেরেস্তারা যদি মানুষের আকৃতি বা ছুরত ধারণ করতে পারে, তাহলে নবী পাক ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম কেন নুরের তৈরী হয়ে মানুষ হতে পারবেনা? ফেরেস্তা জিব্রাইলেরও ঐ সময় মানুষ হতে যা যা দরকার অর্থাৎ চুল দাড়ি পশম ইত্যাদি তা সবই ছিল, তাহলে নবী পাক ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম এর এরুপ থাকলে অসুবিধা কোথায়? জিব্রাইল (আঃ) বেশীর ভাগ নবীর সাহাবী দাহইয়াতুল কালবী (রাঃ) এর ছুরত ধারণ করে আসতেন। দাহ্ইয়াতুল কালবী (রাঃ) এর চুল দাড়ি ও পশম সবই ছিল। আর জিব্রাইল (আঃ) ঐ ছুরতেই নবীজির কাছে আসতেন। সুতরাং নুরের তৈরী হলেও মানুষের ছুরত বা মানুষ হওয়া যায়। আর আমরা তাই বলি যে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম মানুষ সত্য, তবে নুরের মানুষ। সর্বোপরি নবী করিম (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) কে আল্লাহ বাশারিয়াত তথা মানবীয় গুনাগুণ দান করেছেন।

#ছওয়ালঃ নুরের তৈরী মানুষের কি খাবার, পশ্রাব, পায়খানা, স্ত্রী সম্ভোগ ও সন্তান জন্ম দেওয়া ইত্যাদি থাকে?

#জবাবঃ সাধারণত নুরের তৈরী ফেরেস্তাদের মাঝে এরুপ কোন স্বভাব নেই। কিন্তু নবী করিম ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম এর মাঝে এরুপ স্বভাব ছিল, কারন ফেরেস্তাদেরকে আল্লাহর ইচ্ছায় (بشرية) বাশারিয়াত তথা মানবীয় ছুরত দেওয়া হয় কিন্তু মানবীয় গুনাগুণ দেওয়া হয়না। কিন্তু হুজুরে পাক ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম কে (بشرية) বাশারিয়াত তথা মানবীয় ছুরত ও গুনাগুণ উভয়ই দেওয়া হয়েছে। আর এ কারনেই পবিত্র

কোরআনে বলা হয়েছে: قل انما انا بشر *অর্থাৎ, হে নবী! আপনি বলুন আমি বাশার বা মানুষ....(সূরা কাহাফ, ১১০ নং আয়াত)। আল্লাহ যদি কোন ফেরেস্তাকে বাশারিয়াত দান করেন তাহলে আমাদের সমস্যা কি? আল্লাহ কি এরুপ দান করতে পারে না? অবশ্যই পারেন। ان الله على كل شي قدير *অর্থাৎ আল্লাহ সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান (আল কোরআন)।

[বি: দ্র: বাশারিয়াত বা মানবীয় গুনাগুণের মধ্যে খাবার গ্রহন, কাজায়ে হাজত, স্ত্রী সম্ভোগ ও সন্তান দান ইত্যাদি সবই রয়েছে, তবে নবীজির প্রশ্রাব-পায়খানা মোবারক পবিত্র]

#ছওয়ালঃ সূর্য্য একটি নুর অথচ ঐ সূর্য্যের কাছে গেলে আমরা জ্বলে যাইব। নবী পাক ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম যদি নুরের তৈরী হয় তাহলে নুরের তাজাল্লীতে লোকেরা জ্বলে গেলনা কেন?

#জবাবঃ সূর্য্য নুর তাই সূর্য্যের কাছে গেলে জ্বলে যাইতে হয়। পবিত্র কোরআনে উল্লেখ আছে: هو الذى جعل الشمس ضياء والقمر نورا *অর্থঃ তিনি সূর্য্যকে উজ্জল রুপে আর চন্দ্রকে নুর রুপে প্রেরণ করেছেন (সূরা ইউনূছ, ৫ নং আয়াত)।

এই আয়াত দ্বারা প্রমান হয় চন্দ্রও একটি নুর এবং তা পবিত্র কোরআনের ভাষায়। যদি নুরের কাছে গেলে জ্বলে যাইতে হয় তাহলে মানুষ চাঁদে গেল জ্বলে গেলনা কেন? কারন চাঁদও একটি নুর। তাই বুজা যায় সব নুর এক রকম নয়।

*নুরের তৈরী ফেরেস্তা জিব্রাইল (আঃ) যখন নবীজির কাছে দুনিয়ায় আসতেন তখন আশে পাশের সাহাবীরা জ্বলে গেলনা কেন?

*পবিত্র কোরআনে উল্লেখ আছে, হারুত ও মারুত নামে দু'জন ফেরেস্তা দুনিয়ায় এসেছিল। বহু মানুষের সাথে তাঁরা উঠা বসা করেছেন অথচ কেহই জ্বলে যায়নি। কারন কি?

*সুতরাং সব ধরনের নুরের দ্বারা জ্বলে যাইতে হয়না। সর্বোপরি নবীজিকে আল্লাহ পাক বাশারিয়াতের কভার পড়িয়ে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন।

রাসূলে পাক (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) মানবীয় কভার নিয়ে এসেছেন যাতে সেই নূরের তাজাল্লীতে লোকদের কোন সমস্যা না হয়।

#ছওয়ালঃ নবী করিম ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম এর মাতা-পিতা তাঁরা'ত মাটির মানুষ. তাহলে মাটির মানুষের ঘরে নুরের তৈরী মানুষ জন্ম হয় কিভাবে?

#জবাবঃ নবীজির মাতা আমেনা (রাঃ) নবীজিকে গর্ভে ধারণ করেনছেন এবং তিনিই সবচেয়ে ভাল জানেন যে, তিনার গর্ভে সাধারণ মাটির মানুষ ধারণ করেছেন নাকি নূরের মানুষ ধারণ করেছেন।, পাশাপাশি নবী পাক ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম যখন মা আমেনা গর্ভ থেকে দুনিয়ায় আসেন তখন কি মাটির মানুষ এসেছেন নাকি নুরের মানুষ এসেছেন, সে ব্যাপারেও মা আমেনাই ভাল জানবেন। লক্ষ্য করুন!

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان امى رايت فى المنامها *দলিলঃ ان الذين فى بطنها نور *অর্থঃ নবী করিম ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম বলেছেন, নিশ্চয় আমার মা সপ্নে দেখেছেন তাঁর গর্ভে নুর ছিল (দূররুল মোনাজ্জামা)।

*নবীজি নিজেই বলছেন তাঁর মায়ের গর্ভে তিনি নুর ছিলেন, আর এ অবস্থা তাঁর মা সপ্নে দেখেছেন। তাহলে আপনি মাটি বলবেন কেন?

*দলিলঃ رات انه خرج منها نور *অর্থঃ (নবীজির মা প্রসব কালিন) তাঁর থেকে নুর বের হতে দেখেছেন (হাকেম, ৪র্থ খন্ড, ১৫৬৫ পৃঃ; খাছাইছুল কোবরা, মাদারে যুন্নবুয়াত, ১ম খন্ড; শিফা শরিফ, ২য় জি: ২২০ পৃঃ; তাবারানী; মুসনাদে আহমদ, ১৬ তম খন্ড, ২৫১ পৃঃ; তাফছিরে ইবনে কাছির, ৪র্থ খন্ড, ৪২৮ পৃঃ) হাদিসটি সহি।

*দলিলঃ دعوة ابي ابراهيم وبشرى عيسى ابن مريم ورات امى انه خرج منها نور *নবীজি বলেন: আমি বাবা ইব্রাহিম (আঃ) এর দোয়া, ঈসা ইবনে মরিয়মের সু-সংবাদ, আর মা (আমেনা) দেখেছিল তাঁর থেকে নুর বের হচ্ছে (বায়হাক্বী দালায়েলুন্নবুয়ত, ১ম খন্ড, ৮৫ পৃ: কয়েকটি সনদে; মুসনাদে আহমদ, ২৬২/৫; তাবারানী তাঁর কবিরে, ১৭৫/৮; ঈমাম হায়ছামী তাঁর 'মজমুয়ায়ে' ২২২/৮; মেসকাত, ৫১৩ পৃ:) সনদ সহি।

*নবীজির মা আমেনা (রাঃ) বলছেন: তাঁর থেকে নুর বের হয়েছে তাহলে আপনি মাটি বলবেন কেন?

*আমরা পূর্বেও উল্লেখ করেছি নবী ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম এর জন্য সৃষ্টি জগতের সব কিছুর পূর্বে। নবী ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম এর উছিলায় সব কিছু পয়দা হয়েছে। দুনিয়ার নিয়ম মা-বাবার মাধ্যমে পত্যাবর্তন করা তাই আল্লাহ তাঁর বন্ধুকে পিতা-মাতার মাধ্যমে পাঠিয়েছেন। নচেৎ নবীজি যদি পিতা-মাতা ব্যতিত সরাসরি আসতেন তাহলে লোকেরা হয়ত ভয়ে তাঁর কাছে আসত না কিংবা তাঁকেই খোদা ভেবে বসতেন। পিতাহীন ঈসা (আঃ) শুধু মায়ের মাধ্যমে যে আল্লাহ পাঠাতে পারেন সে আল্লাহ মাটির মানুষের ভিতর থেকে নুরের মানুষও বের করতে পারেন। وتخرج الحي من الميت وتخرج ميت من الحي *অর্থঃ আর তিনি মৃত থেকে জিন্দা বের করেন জিন্দা থেকে মৃত বের করেন (আলে ইমরান)। এক কথায় আল্লাহ সব কিছু করার ক্ষমতা রাখেন, তবে অপ্রীতিকর কাজ থেকে তিনি পবিত্র।

#ছওয়ালঃ মানুষ মারা গেলে তাকে কবরে রাখার সময় বলতে হয়, منها خلقنا كم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم ...... *অর্থঃ তোমাকে এই মাটি দ্বারাই সৃষ্টি করা হয়েছে, এখানেই শুয়ানো হচ্ছে আবার এখান থেকেই বের করা হবে.....। সুতরাং বুজা যায় সকল মানুষকেই যেখানে দাফন করা হয় সেখানের মাটি দ্বারা সৃষ্টি করা হয়। তাহলে নবী পাক ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম কে দাফন করা হয়েছে মদিনায়, সুতরাং নবীজি মদিনার মাটি দিয়ে তৈরী।

#জবাবঃ প্রথমত منها خلقنا كم ومنها نعيدكم ومنها نخرجكم..... এই দোয়া সকল মানুষের দাফনের সময় পড়া হয় কারন সকলেই এই মাটির সৃষ্টি। কিন্তু প্রিয় নবীজির রওজা পাকে তাঁকে রাখার পর কোন সাহাবী এই দোয়া পাঠ করেছেন এরূপ দলিল আছে কি? প্রিয় নবীজির শরিয়তে ইন্তে কালের পর থেকে দাফন করার পর পর্যন্ত সকল সাহাবীগণ দূরুদ-সালাম পাঠ করেছেন। এমনকি আমরা মারা গেলে আনুষ্ঠানিক ভাবে জানাযা হয় বা হবে, কিন্তু প্রিয় নবীজির কি এরূপ জানাযা হয়েছে? নবী পাকের ইন্তেকালের পরে সাহাবীগণ কি করেছেন শুনুন: ثم دخل الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسالا يصلون عليه حتى اذا فرغوا ادخلوا النساء حتى اذا فرغوا ادخلوا الصبيان ولم يوم الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم احد *অর্থঃ অতঃপর পুরুষ লোকেরা দলে দলে নবীজির কাছে প্রবেশ করলেন ও দূরুদ-সালাম পাঠ করলেন। এমনকি পুরুষের পালা শেষ হলে মহিলারা প্রবেশ করেন ও দূরুদ-সালাম পাঠ করেন। অবশেষে তাঁদের পালা শেষ হলে বালক-বালিকারা প্রবেশ করেন। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম এর দোয়ায় কেউ ঈমামতি করেননি (ইবনে মাজাহ, ১১৮ পৃঃ; বায়হাক্বী, সুনানে কুবরা, ৪র্থ খন্ড, ১৮৯ পৃঃ; খাছায়েছুল কোবরা; দালায়েলুন্নবুয়াত, ৭ম খন্ড, ২০৩ ও ১৯৮ পৃঃ; মুছান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক, ৩য় খন্ড, ৩০৩ পৃঃ; মাওয়াহেবুল্লাদুন্নিয়া, ৪র্থ খন্ড, ৫৬১ পৃ:) সনদ সহি।

*এতে প্রমান হয় নবীজির বেলায় এই আপত্তি সঠিক নয়। কারন নবীজির ওছিলায় জমীন সৃষ্টি হয়েছে। যেই নবীর ওছিলায় জমীন ও জমীনের মাটি সৃষ্টি হয়েছে সে নবী মাটি দ্বারা সৃষ্টি ইহা অমূলক কথা ছাড়া কিছুই নয়। এজন্যেই নবী করিম ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম বলেন: خلقت انا من نورالله والخلق من نورى *অর্থঃ আমি আল্লাহর নুরের সৃষ্টি আর সব কিছু আমার নুরে সৃষ্টি (মতায়েলুল মুছাররাত শরহে দালায়েলুল খায়রাত)।

**তদাপিও এই আয়াত দ্বারা মুরাদ নেওয়া হয়েছে বাবা আদম (আঃ)'কে। লক্ষ্য করুণঃ-

#দলিলঃ (منها) اي من الارض (خلقنكم) يعنى خلقنا من تراب الارض ابائكم ادم *অর্থঃ (মিনহা) অর্থাৎ, জমীন হতে। (খালাক্বনাকুম) অর্থাৎ, আমি জমীনের মাটি থেকে তোমাদের পিতা 'আদম'কে সৃষ্টি করেছি (তাফছিরে মাজহারী, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৭৩ পৃ:)।

#দলিলঃ (منها) اي من الارض (خلقنكم) اى فى ضمن خلق ابيكم ادم عليه الصلوة والسلام *অর্থঃ (মিনহা) অর্থাৎ জমীন হতে। (খালাক্বনাকুম)

অর্থাৎ ইহা দ্বারা সরাসরি আদম (আঃ) কে সৃষ্টি করেছি (তাফছিরে রুহুল মায়ানী, ১৬ তম জি: ৭২৩ পৃ:; তাফছিরে আবু ছাউদ, ৪র্থ খন্ড, ৬১৫ পৃ:)।

#দলিলঃ (منها خلقنكم) اي من الارض خلقنا ادم *অর্থঃ (মিনহা খালাক্বানাকুম) অর্থাৎ আমি জমীন থেকে 'আদম'কে সৃষ্টি করেছি (তাফছিরে খাজেন শরিফ, ৩য় খন্ড, ২০৬ পৃ:)।

#দলিলঃ (منها) اي من الارض (خلقنكم) يعنى: اباكم ادم *অর্থঃ (মিনহা) অর্থাৎ জমীন হতে। (খালাক্বনাকুম) তোমাদের বাবা 'আদম'কে সৃষ্টি করেছি (তাফছিরে মায়ালেমু ত্বানজিল, ৪র্থ খন্ড, ১১ পৃ:)।

*সুতরাং যে আয়াত দ্বারা বাবা আদম (আঃ) কে বুজানো হয়েছে, সেই আয়াত দ্বারা সকল মানুষের দিকে নিছবত করে প্রিয় নবীজিকে মাটির মানুষ বুজানোই হল মূর্খতা। রাসূলে করিম ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম ব্যতিত পৃথিবীর সকল মানুষকে সৃষ্টি করেছেন 'নুতফা' দ্বারা, [নুতফা হল: এক ফোটা বির্য] যেমন পবিত্র কোরআনে আল্লাহ পাক বলেনঃخلق الانسان من علق *অর্থঃ আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি 'নুতফা' দ্বারা (সূরা আলাক্ব)। আর সেই নুতফার ভিতরে যেখানে দাফন করা হয় সেখানের মাটি মিশ্রিত থাকে। তাই কোন মানুষই সরাসরি মাটির তৈরী নয়, (বাবা আদম ব্যতিত) বরং তার ভিতরে মাটি থাকে। এজন্যেই বলা হয়: আগুন, পানি, মাটি ও বাতাস তথা প্রধান 'দশ লতিফা' দ্বারা মানব দেহ গঠিত (তাফছিরে মাজহারী)।

*কুরআন-সুন্নাহ এর দৃষ্টিতেঃ
*নবী-ওলীগণের শাফায়াতঃ

*বর্তমান সমাজে বড় একটি ফিতনা বের হয়েছে, তাহল: অনেকে বলেন, নবী-রাসূল ও ওলী আল্লাহগণ শাফায়াত করতে পারবেনা। অনেকে বলে থাকেন, পীর সাহেবেরই উপায় নাই মুরীদ বাছাইবে কিভাবে। নবীরাই বলবে ইয়া নাফছি! ইয়া নাফছি! ওলীরাত হিসাবের বাইরে। আমরা দেখব পবিত্র কোরআন ও হাদিস এ ব্যাপারে কি বলে।

#দলিলঃ من ذالذى يشفع عنده الا باذنه *অর্থঃ কে আছে আল্লাহর কাছে অনুমতি ব্যতিত শাফায়াত করবে (আয়াতুল কুরসীর অংশ)। এই আয়াত দ্বারা বুজা যায়, আল্লাহর অনুমতিতে শাফায়াত করা হবে।

#দলিলঃ عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شفاعة لاهل الكبائر من امتى *অর্থঃ হজরত জাবের (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) বলেছেন: আমার উম্মতের কবীরা গোনাহ্‌গারের জন্য আমার শাফায়াত (আবু দাউদ, ২য় জি: ৬৫২ পৃ:; তিরমিজি শরিফ, ২য় জি: ৭০ পৃ:; ইবনে মাজাহ, ৩৩০ পৃ:; মেসকাত, ৪৯৪ পৃ:; মেরকাত, ১০ম খন্ড, ২৭০ পৃ:; মুসনাদে আহমদ, ২১৩/৩; তাফছিরে মাজহারী, ৫ম খন্ড, ৩২৬

পৃ:; হাকেম শরিফ, ১ম খন্ড, ১০২ পৃ:; তাবারানী আওছাতে, ৬ষ্ঠ খন্ড, ২০৫ পৃ:; জামেউছ ছাগীর, ২য় জি: ৩০১ পৃ:)।

*ঈমাম তিরমিজি ও হাকেম (রঃ) বলেছেন: هذا حديث حسن صحيح অর্থাৎ এই হাদিস হাছান-সহি।

*এ ব্যাপারে হজরত আনাছ (রাঃ) হতেও বর্ণিত আছে।

#দলিলঃ عن ابى سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم .....وانا اول شافع واول مشفع ولا فخر *অর্থঃ হজরত আবু ছাইদ (রাঃ) বলেন, রাসূলে করিম (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) বলেছেন: আমি সর্বপ্রথম শাফায়াতকারী এবং সর্বাগ্রে আমার শাফায়াত কবুল করা হবে এতে আমার কোন ফখর নেই (ইবনে মাজাহ, ৩৩০ পৃ:; মেরকাত ১০ম খন্ড, ৪২১, ৪৪২ পৃ:; সহি মুসলীম, আবু দাউদ, হা: নং ৪৬৭৩: তিরমিজি, হা: নং ৩৬১৫; দারেমী শরিফ, ১ম খন্ড, ৪১ পৃ:; মুসনাদে আহমদ, ২/৩; শিফা শরিফ, ১ম জি: ২৪৫ পৃ:; আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া, ১ম খন্ড, ৩৮২ পৃ:) সনদ সহি।

#দলিলঃ عن عثمان بن عفان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة ثلاثة الانبياء ثم العلماء ثم الشهداء *অর্থঃ হজরত উছমান ইবনে আফ্‌ফান (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) বলেছেন: ক্বিয়ামতের দিন ৩ শ্রেণীর লোক শাফায়াত করবে, সকল নবীগণ, আলিমগণ ও শহীদগণ (ইবনে মাজাহ, ৩৩০ পৃ:; মেসকাত, ৪৯৫ পৃ:; মেরকাত শরহে মেসকাত, ১০ম খন্ড, ২৮০ পৃ:; তাফছিরে মাজহারী, ৫ম খন্ড, ৩২৫ পৃ:; বায়হাক্বী; তাফছিরে রুহুল মায়ানী, ২৮ তম জি: ২৯৯ পৃ:; আশিয়াতুল লুমআত)। মুসনাদে বাজ্জার শরিফে অতিরিক্ত আছে: ثم المؤذن অর্থাৎ, মুয়াজ্জিনগণও শাফায়াত করবে (তাফছিরে মাজহারী, ৫ম খন্ড, ৩২৬ পৃ:)।

*আলিম কারা এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'লা বলেন: انما يخشى الله من عباده العلماء *অর্থঃ নিশ্চয় যারা আল্লাহকে ভয় করে তারাই 'আলিম'। অন্যত্র উল্লেখ আছে: الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولهم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون *অর্থাৎ, সাবধান! নিশ্চয় আল্লাহর ওলীগণের কোন ভয় নেই এবং তাঁরা চিন্তিত হবেনা, তারাই ঈমানদার ও আল্লাহকে ভয় করে (সূরা ইউনূছ, ৬২-৬৩)।

*এই আয়াত দ্বারা বুজা যায়, আল্লাহর ওলীগণই আল্লাহকে ভয় করেন, আর যারা আল্লাহকে ভয় করেন তাঁরাই 'আলিম'। সুতরাং আলিমগণ বলতে আল্লাহর ওলীদেরকে বুঝানো হয়েছে। কারন তাঁরাই আল্লাহকে ভয় করে। তাই আলিমগণ বলতে আল্লাহর ওলীগণই হাশরের দিন শাফায়াত করবেন।

#দলিলঃ عن عبد الله بن الجدعاء انه سمع النبى صلى الله عليه وسلم يقول ليدخلن الجنة بشفاعة رجل من امتى اكثر من بنى تميم قالوا يا رسول الله سواك قال سواى *অর্থঃ হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে জাদয়া (রাঃ)

বলেন, আমি নবী করিম (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) কে বলতে শুনেছি: আমার একজন উম্মতের শাফায়াতে 'বনী তামিম' গোত্রের লোকের চাইতে অধিক লোক জান্নাতে যাবে। সাহাবীরা জিজ্ঞাসা করলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইহা কি আপনি ব্যতিত অন্য কেউ? নবীজি বললেন: হ্যাঁ আমি ব্যতিত (তিরমিজি শরিফ, ২য় জি: ৭০ পৃ:; ইবনে মাজাহ, ৩৩০ পৃ:; মেসকাত, ৪৯৪ পৃ:; মেরকাত শরহে মেসকাত, ১০ম খন্ড, ২৭২ পৃ:; দারেমী শরিফ, ২য় খন্ড, ৪২৩ পৃ:; মুসনাদে আহমদ, ৪৬৯/৩; হাকেম, ১ম খন্ড, ১০৩ পৃ:) ঈমাম তিরমিজি বলেন: هذا حديث حسن صحيح অর্থাৎ, এই হাদিস হাছান-সহি।

*এই হাদিস দ্বারা নবী পাকের উম্মতের শাফায়াত প্রমানিত হয়, অর্থাৎ, নবী পাক (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) এর উম্মতগণও শাফায়াত করতে পারবেন।

#দলিলঃ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان من امتى من يدخل الجنة بشفاعة اكثر من مضر *অর্থঃ নিশ্চয় রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) বলেছেন: আমার উম্মতের মাঝে এক ব্যক্তি হবে যার শাফায়াতে 'মোদ্বার' গোত্রের চাইতেও অধিক লোক জান্নাতে যাবে (ইবনে মাজাহ, ৩৩১ পৃ:; মুস্তাদরাকে হাকেম শরিফ, ১ম খন্ড, ১০৪ পৃ:) সহি হাদিস।

*এই হাদিস সম্পর্কে ঈমাম হাকেম বলেন: هذا حديث صحيح الاسناد على شرط مسلم *এই হাদিস ঈমাম মুসলীমের শর্তানুযায়ী সহি (হাকেম, ১ম খন্ড, ১০৪ পৃ:)। এই হাদিস দ্বারাও নবীজির উম্মতের শাফায়াত প্রমানিত হয়।

#দলিলঃ عن الحسن البصرى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع عثمان بن عفان يوم القيامة فى مثل ربيعة ومضر *অর্থঃ হজরত হাছান বছরী (রাঃ) বলেন, রাসূলে করিম (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) বলেছেন: উছমান ইবনে আফ্ফান (রাঃ) ক্বিয়ামতের দিন 'রবীয়া ও মোদ্বার' গোত্রের সমপরিমান লোকদের শাফায়াত করবে (তিরমিজি, ২য় জি: ৭০ পৃ:; তাফছিরে মাজহারী, ৫ম খন্ড, ৩২৬ পৃ:; তাবারানী; বায়হাক্বী)। বায়হাক্বী ও তাবারানীতে হাদিসটি হজরত আবু উমামা (রাঃ) থেকে মরফু রূপে সহি সনদে উল্লেখ আছে।

*এই হাদিস দ্বারাও নবীপাকের উম্মতের শাফায়াত প্রমানিত হয়।

#দলিলঃ عن ابى سعيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان من امتى من يشفع للفئام ومنهم من يشفع للقبيلة ومنهم من يشفع للعصبة ومنهم من يشفع للرجل حتى يدخلوا الجنة *অর্থঃ হজরত আবু ছাইদ (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) বলেছেন: আমার উম্মাতের এমন লোক আছে যে বহু সংখ্যক লোক শাফায়াত করবে। এমন লোক আছে যে একটি গোত্রের শাফায়াত করবে। এমন লোক আছে যে কিছু সংখ্যক লোকের শাফায়াত করবে। এমন লোক আছে যে একজন শাফায়াত করবে, শেষ পর্যন্ত তাঁদের শাফায়াতে জান্নাতে প্রবেশ করবে (তিরমিজি, ২য় জি: ৭০

পৃ:; মেসকাত, ৪৯৫ পৃ:; মেরকাত, ১০ম খন্ড, ২৭২ পৃ:; মুসনাদে আহমদ, ২০০/৩; তাফছিরে রুহুল মায়ানী, ১৬ তম জি: ৬৩৫ পৃ:)।

#দলিলঃ عن ابن عمر قال يقال للعالم اشفع فى تلامذتك ولو بلغت عدد نجوم السماء *অর্থঃ হজরত ইবনে উমর (রাঃ) বলেন: হাশরের দিন আলিমগণকে বলা হবে তোমার শিষ্যদেরকে শাফায়াত কর, যদিও তাদের সংখ্যা আসমানের তারার সমানও হয় (দায়লামী শরিফ; তাফছিরে মাজহারী, ৫ম খন্ড, ৩২৬ পৃ:; তাফছিরে মারেফুল কোরআন)।

*এই হাদিস দ্বারা প্রমানিত হয়, নবী করিম (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) এর উম্মতের অন্তর্ভূক্ত আলিমগণও শাফায়াত করতে পারবে। আর প্রকৃত আলিম তাঁরাই, যারা আল্লাহর ওলী। 'কারন আল্লাহর ওলীগণই আল্লাহকে ভয় করেন, আর যারা আল্লাহকে ভয় করেন তাঁরাই 'আলিম'।

#দলিলঃ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهيد يشفع فى سبعين من اهل بيته *অর্থঃ রাসূলে পাক (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) বলেছেন: একজন শহিদ তাঁর বংশ হতে ৭০ জন শাফায়াত করবে (তাফছিরে মাজহারী, ৫ম খন্ড, ৩২৬ পৃ:; ইবনে মাজাহ, ২০৬ পৃ:; আবু দাউদ) সনদ সহি।

#দলিলঃ عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرا القران فاستظهره فاحل حلاله وحرم حرمه ادخله الله الجنة وشفعه فى عشرة من اهل بيته كلهم قد وجبت له النار *অর্থঃ হজরত আলী (রাঃ) বলেন, রাসূলে করিম (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) বলেছেন: যে কুরআন পাঠ করে ও মুখস্থ রাখে, হালালকে হালাল জানে ও হারামকে হারাম জানে, আল্লাহ তাঁকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন এবং তাঁর বংশের এমন দশজনকে শাফায়াত করবে যাদের জন্য জাহান্নাম ওয়াজিব ছিল (মেসকাত, ১৮৭ পৃ:; মুসনাদে আহমদ, ১৪৮/১; দারেমী শরিফ; তিরমিজি শরিফ; ইবনে মাজাহ; মেরকাত, ৫ম খন্ড, ৪১ পৃ:; আশিয়াতুল লুমআত)।

*এই হাদিস দ্বারা প্রমান হয় যে, হাফিজে কোরআন ও নিয়মিত কোরআন তেলাওয়াতকারী নিজের বংশের দশজনকে শাফায়াত করে জান্নাতে নিয়ে যাবে।

*সুতরাং নবী-রাসূলগণ, শোহাদায়ে কেরামগণ, তাক্বওয়াশীল আলিম তথা আল্লাহর ওলীগণ, হাফেজে কোরআন বিবিধ শ্রেণীর লোকেরা তাঁদের আপনজনদের শাফায়াত করে জান্নাতে নিয়ে যাবে।

*কুরআন-সুন্নাহ এর দৃষ্টিতেঃ

*আল্লাহর ওলীগণের অন্তরদৃষ্টিঃ

*সাধারণে মানুষের দৃষ্টি শক্তি ও আল্লাহর ওলীগনের দৃষ্টি শক্তি এক নয়। সাধারণ মানুষ তাদের চক্ষু দ্বারা চোখের সামনের দৃষ্ট বস্তু ছাড়া আর কিছুই দেখতে পায়না, আর আল্লাহর ওলীগণ তাঁদের অন্তরদৃষ্টি দ্বারা সৃষ্টি জগতের

যেকোন অবস্থা অবলোকন করতে পারে। নিচে এ ব্যাপারে পবিত্র কোরআন ও হাদিসের আলোকে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলঃ

*পবিত্র কোরআনের আলোকেঃ

*মহান আল্লাহ তা'লা বলেন:ان فی ذلك لايت للمتوسمين *অর্থঃ নিশ্চয় এতে গভীর দৃষ্টিশীলদের জন্যে রয়েছে নিদর্শন (সূরা হিজর: ৭৫ নং আয়াত)।

*এই আয়াতে: للمتوسمين (লিল মুতাওয়াচ্ছেমিন) বলতে আল্লাহর ওলীগণের অন্তরদৃষ্টিকে বুজানো হয়েছে। যেমন:

#দলিলঃ قال ابن عباس: للناظرين وقال مجاهد: للمتفرسين *অর্থঃ হজরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন: অর্থাৎ, দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন লোক; হজরত মুজাহিদ (রঃ) বলেন: অন্তরদৃষ্টি সম্পন্ন লোক (তাফছিরে মায়ালেমু তানজিল, ৩য় খন্ড, ২৩৯ পৃ:; তাফছিরে খাজেন, ৩য় খন্ড, ৬০ পৃ:; তাফছিরে রুহুল মায়ানী, ১৪ তম খন্ড, ৪২৮ পৃ:; তাফছিরে তাবারী শরিফ, ১৪ তম খন্ড, ৫০ পৃ:; তাফছিরে কবির, ১৯ তম খন্ড, ১৬৮ পৃ:; তাফছিরে ইবনে আব্বাস, ২য় খন্ড; তাফছিরে মাজহারী, ৫ম খন্ড, ১৭২ পৃ:; জালালাইন শরিফ, ২১৪ পৃ:; ইবনে কাছির, ২য় খন্ড, ৬৯২ পৃ:; তাফছিরে দূর্রে মানছুর, ৪র্থ খন্ড, ১৯৪ পৃ:)।

*সুতরাং, এই আয়াতের সহজ অনুবাদ হবে: অন্তরদৃষ্টি সম্পন্ন লোকদের জন্যে রয়েছে নিদর্শন।

*তাফছিরে রুহুল মায়ানীতে আরোও উল্লেখ আছে: قال جعفر بن محمد رضى الله عنه للمتفرسين *অর্থঃ বিশিষ্ট সাহাবী হজরত জাফর ইবনে মুহাম্মাদ (রাঃ) বলেন: (মুতাওয়াচ্ছেমীন) হল: অন্তরদৃষ্টি সম্পন্ন লোক (রুহুল মায়ানী, ১৪ তম খন্ড, ৪২৮ পৃ:; আবু নুয়াইম তাঁর হুলিয়াতে; তাফছিরে দূর্রে মানছুর, ৪র্থ খন্ড, ১৯৪ পৃ:)।

*এ ব্যাপারে আরোও উল্লেখ আছে: عن عبيد قال سمعت الضحاك يقول فی قوله: (للمتوسمين) يقول: للناظرين *অর্থঃ হজরত উবাইদ (রঃ) বলেন, এই আয়াতের ব্যাপারে আমি দ্বাহ্হাক (রঃ) কে বলতে শুনেছি: (লিল মুতাওয়াচ্ছেমীন) হল দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন লোক (তাফছিরে তাবারী শরিফ, ১৪ তম খন্ড, ৫৬০ পৃ:; তাফছিরে কুরতবী, ১০ম খন্ড, ৩৪ পৃ:)।

*এ ব্যাপারে আরোও উল্লেখ আছে:للمتبصرين :وقال ابو عبيدة *অর্থঃ হজরত আবু উবায়দা (রাঃ) বলেন: (লিল মুতাওয়াচ্ছেমীন) হল: চক্ষুষ্মান ব্যক্তি (তাফছিরে কুরতবী, ১০ম খন্ড, ৩৪ পৃ:)। [অন্তরদৃষ্টিকেই বলা হয় চক্ষুষ্মান]

*সুতরাং, পবিত্র কোরআন আল্লাহর নেক বান্দাগণের অন্তরদৃষ্টি স্বীকার করে।

#দলিলঃ (للمتوسمين) اي المتفكرين المتفرسين الذين يتثبتون فی نظرهم حتى يعرفوا حقيقة الشيء بسمته *অর্থঃ (লিল মুতাওয়াচ্ছেমীন)

অর্থাৎ, গভীর চিন্তাশীল ও অন্তরদৃষ্টি সম্পন্ন লোক, যারা তাঁদের দৃষ্টিশক্তি দ্বারা চিহ্নিত করতে পারে এমনকি নিদর্শন দেখে প্রত্যেক বস্তুর হাকিকত জানতে পারে (তাফছিরে আবু ছাউদ, ৪র্থ খন্ড, ৩০৭ পৃ:; তাফছিরে রুহুর বয়ান, ৪র্থ খন্ড, ৫৮৯ পৃ:)।

*সুতরাং আল্লাহর ওলীগণ অন্তরদৃষ্টি দ্বারা সৃষ্টি জগতের যেকোন অবস্থা দেখতে পায় ও হাকিকতের জ্ঞানে জ্ঞানী হতে পারেন।

*পবিত্র হাদিসের দৃষ্টিতেঃ

#দলিলঃ عن ابى سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنور الله : *অর্থঃ হজরত আবু ছাইদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূলে পাক (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) বলেছেন: তোমরা মু'মিনের অন্তরদৃষ্টিকে ভয় কর, নিশ্চয় তাঁরা আল্লাহর নুর দিয়ে দেখেন (জামে তিরমিজি শরিফ, ২য় খন্ড, ১৪৫ পৃ:; তাফছিরে কাবির শরিফ, ১ম খন্ড, ১২৭ পৃ:; ২৩তম খন্ড, ২৩১ পৃ:; তাফছিরে রুহুল বয়ান, ১ম খন্ড, ৩৯ পৃ:; ৪র্থ খন্ড, ৫৯০ পৃ:; ২য় খন্ড, ৪৫৫ পৃ:; তাবারানী তাঁর "আওছাতে" ২য় খন্ড, ২৭১ পৃ: ও ৬ষ্ঠ খন্ড, ১৯ পৃ:; (সনদ: হাছান) তাবারানী তাঁর "কবিরে" (১০২/৮) হা: নং ৭৪৯৪; 'মজমুয়ায়ে জাওয়াহেদ' (২৭১/১০); ছেররুল আছরার, [কৃত: হুজুর গাউছে পাক আব্দুল কাদের জিলানী (রা:)] ১২২ পৃ:; আলবেদায়া ওয়ান নেহায়া, ২য় খন্ড, ৪০৯ পৃ:; তাফছিরে কুরতবী, ১০ম খন্ড, ৩৪ পৃ:; নাওয়াদেরুল উছুল, ২৭১ নং হা:; তাফছিরে তাবারী, ১৪ তম খন্ড, ৫০ পৃ:; রুহুল মায়ানী, ১৪ তম খন্ড, ৪২৯ পৃ:; তাফছিরে খাজেন, ৩য় খন্ড, ৬০ পৃ:; ইবনে কাছির, ২য় খন্ড, ৬৯২ পৃ:; মাকাছিদুল হাছানাহ, ১৯ পৃ:; এহইয়ায়ে উলুমুদ্দিন, ৩য় খন্ড, ৩২ পৃ:; কাশফুল খফা, ১ম খন্ড, ৩৫ পৃ:)।

[বি: দ্র: ঈমাম তিরমিজি (রঃ) এর কাছে হাদিসটি গরীব হলেও সহি, কারন তিনি এ ব্যাপারে কোন মন্তব্য করেননি। যদি দ্বায়িফ হত তাহলে অবশ্যই তিনি উল্লেখ করতেন। গরীব হাদিস সহি হতে পারে, যেমন সহি বুখারীর: انما العمل بنية (ইন্নামাল আমালু বিন নিয়াত) এই হাদিসও গরীব কিন্তু সহি]

*এই হাদিস দ্বারা প্রমান হয়, মু'মিনে কামেল তথা আল্লাহর ওলীগণ আল্লাহর নুর দিয়ে সব কিছু দেখতে পারেন।

#দলিলঃ عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بمور الله *অর্থঃ হজরত ইবনে উমর (রাঃ) বলেন, রাসূলে করিম (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) বলেছেন: তোমরা মু'মিনের অন্তর দৃষ্টিকে ভয় কর, নিশ্চয় মু'মিম আল্লাহর নুর দিয়ে দেখেন (তাফছিরে ইবনে কাছির, ২য় খন্ড, ৬৯২ পৃ:; তাফছিরে তাবারী

শরিফ, ১৪ তম খন্ড, ৫০ পৃঃ; আবু নুয়াইম তাঁর 'হুলিয়াতে' ৯৪/৪; তাফছিরে দূর্রে মানছুর, ৪র্থ খন্ড, ১৯৪ পৃঃ; দ্বায়ফুজ জামে, ১২৭)।
[বিঃ দ্রঃ ইহার সনদ দ্বায়িফ, তবে ফাদ্বায়েল বা মর্যাদার ক্ষেত্রে দ্বায়িফ সনদ গ্রহন যোগ্য]

*এই হাদিসেও মু'মিনে কামেলের অন্তর দৃষ্টির কথা বলা হয়েছে।

#দলিলঃ عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احذروا فراسة المؤمن فانه ينظر بنور الله *অর্থঃ হজরত ছাউবান (রাঃ) বলেন, রাসূলে পাক (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) বলেছেন: তোমরা মু'মিনের অন্তর দৃষ্টিকে ভয় কর, নিশ্চয় তাঁরা আল্লাহর নুর দিয়ে দেখেন (তাফছিরে তাবারী শরিফ, ১৪ তম খন্ড, ৫০ পৃঃ; তাফছিরে ইবনে কাছির, ২য় খন্ড, ৬৯২ পৃঃ; তাফছিরে দূর্রে মানছুর, ৪র্থ খন্ড, ১৯৫ পৃঃ; দ্বায়ফুজ জামে, ১৯৬; ঈমাম ছিয়তী (রঃ) এর "জামেউছ ছাগীর" ১ম জিঃ ১৬ পৃঃ; মাকাছিদুল হাছানা, ১৯ পৃঃ)।
[বিঃ দ্রঃ ইহার সনদও দ্বায়িফ, তবে ফাদ্বায়েল বা মর্যাদার ক্ষেত্রে দ্বায়িফ সনদ গ্রহন যোগ্য]

*এই হাদিসেও মু'মিনে কামেল তথা আল্লাহর ওলীগণের অন্তর দৃষ্টিকে সমর্থন করা হয়েছে।

#দলিলঃ عن ابى امامة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنور الله *অর্থঃ হজরত আবু উমামা (রাঃ) নবী করিম (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) হতে বর্ণনা করেন, প্রিয় নবীজি বলেন: তোমরা মু'মিনের অন্তর দৃষ্টিকে ভয় কর, নিশ্চয় তাঁরা আল্লাহর নুর দ্বারা দেখেন (তাবারানী তাঁর 'আওছাতে, ২য় খন্ড, ২৭১ পৃঃ; তাবারানী তাঁর মুজামুল কাবিরে, ৮/১০২; তাফছিরে কবির শরিফ, ১ম জিঃ ১২৬ পৃঃ; জামেউছ ছাগীর, ১ম জিঃ ১৩ পৃঃ)
[বিঃ দ্রঃ এই হাদিসের সনদ হাছান]

*সর্বোপরি মু'মিনে কামেল তথা আল্লাহর ওলীগণ অন্তর দৃষ্টি সৃষ্টি জগতের যেকোন অবলোকন করতে পারে। কারন তাঁদের চোখে আল্লাহর নুর বিরাজ করে, এবং তাঁদের চোখ আল্লাহর মনোনীত চোখ হয়ে যায়। যেমন:

#দলিলঃ عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يقول: من عادى لي وليا فقد اذنت بالحرب...... فاذا احببته كنت سمعه الذى يسمع به وبصره الذى يبصر به... *অর্থঃ হজরত আবু হুরায়রা (রাঃ) রাসূলে পাক (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) বলেছেন: আল্লাহ তা'লা বলেন: যারা আমার ওলীদের সাথে দুশমনী করবে আমি তার সাথে জেহাদ ঘোষনা করলাম।...... যখন আমি তাঁকে ভালবাসতে শুরু করি তখন আমি তাঁর কান হয়ে যাই যা দ্বারা সে শুনে, আমি তাঁর চোখ হয়ে যাই যা দ্বারা

সে দেখে..... (সহি বুখারী, ২য় খন্ড, ৯৬৩ পৃঃ; সহি ইবনে হিব্বান, ১ম জিঃ ২১০ পৃঃ তাফছিরে রুহুল বয়ান, ২য় খন্ড, ৪৪৯ পৃঃ; তাফছিরে কবির শরিফ; ইবনে মাজাহ, ২৯৬ পৃঃ (আংশিক); তাফছিরে রুহুল মায়ানী, ১১ তম খন্ড, ১৯২ পৃঃ)।

*এই হাদিস দ্বারা বুজা যায়, আল্লাহর ওলীগণের চোখ হল সয়ং আল্লাহ তা'লা, অর্থাৎ তাঁদের চোখ আল্লাহর মনোনিত চোখ হয়ে যায়, ফলে আল্লাহ তা'লা ঐ চোখে নুর দান করেন। তাই তাঁরা আল্লাহর নুর দ্বারা যা খুশি দেখতে পারে।

#দলিলঃ عن انس قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشى فى طريق اذ لقيه حارثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف اصبحت يا حارثة؟ قال: اصبحت والله مؤمنا حقا فقال عليه الصلاة ولسلام انظر ما تقول فان لكل حق حقيقة فما حقيقة ايمانك؟ فقال وكاني انظر الى عرش ربي بارزا وكاني انظر الى اهل الجنة يتزاورون فيها والى اهل النار يتعاوون فيها *অর্থঃ হজরত আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলে পাক (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) রাস্তায় অতিক্রমকালে যখন হারেছ (রাঃ) এর সাথে মিলিত হল, তখন নবীজি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার ভোর বেলা কেমন হল হে হারেছ? হারেছ (রাঃ) বলেন: আল্লাহর কসম! আজকের ভোর বেলা আমার সত্যিকারের ঈমানের সাথে হয়েছে। নবীজি বলেন: তুমি লক্ষ্য কর, যা তুমি বলছ। কারন সব হাকিকতেরও হাকিকত রয়েছে, তোমার ঈমানের হাকিকত কি? হারেছ (রাঃ) বলেন: আমি যেন আল্লাহর আরশে আল্লাহকে দেখতে পাই, আমি যেন জান্নাতের ভিতরে জান্নাতীদের একে অপরের সাথে কথা বলতে দেখি ও জাহান্নামীদের যন্ত্রনার ছটফট করতে দেখি (তাফছিরে কবির শরিফ, ১ম জিঃ ১২৭ পৃঃ; তাবারানী তাঁর কবিরে: 'মজমুয়ায়ে জাওয়ায়েদ'-এ ৫৭/১; মুসনাদে বাজ্জার; জামেউছ ছাগীর; ফেকহে আকবার; জামেউল মাছানেদেউ ওয়াছ ছুনান, ২১ তম খন্ড, ৫৯৩১ পৃঃ; মুসনাদে আবী ইয়ালা)।

#দলিলঃ عن ابن عمر ان عمر بعث جيشا وامر عليهم رجلا يدعى سارية فبينما عمر يخطب فجعل يصيح يا سارى الجبل فقدم رسول من الجيش فقال يا امير المؤمنين لقينا عدونا فهزمونا فاذا بصائح يصيح يا سارى الجبل فاسندنا ظهورنا الى الجبل فهزمهم الله تعالى *অর্থঃ হজরত ইবনে উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, একবার হজরত উমর (রাঃ) একদল সৈন্য অভিযানে প্রেরণ করেন। 'ছারিয়া' নামক এক ব্যক্তিকে সেই দলের সেনাপতি নিযুক্ত করেন। একদিন হজরত উমর (রাঃ) মসজিদে নববীতে খুতবা দিচ্ছিলেন। হঠাৎ তিনি খুতবার মাঝখানে খুব উচ্চস্বরে বলে উঠলেন "ইয়া ছারিয়া আল জাবাল!" এই ঘটনার কয়েকদিন পরে উক্ত সেনাদলের তরফ থেকে একজন

বার্তাবাহ মদিনায় আগমন করেন, সে বলল: হে আমিরুল মু'মেনীন! আমরা শত্রুদের সম্মোক্ষিন হলে তারা আমাদের পরাস্থ করে। এমন সময় জৈনিক ঘোষনাকারীর "ইয়া ছারিয়া আল জাবাল" উচ্চ শব্দ শুনতে পাই, তৎক্ষনাৎ আমরা পাহাড়টিকে পশ্চাতে রেখে শত্রুর মোকাবেলা করতে থাকি। অবশেষে আল্লাহ তা'লা তাদেরকে পরাস্থ করেন (বায়হাক্বীর দালায়েলুন্নবুয়াত, ৩৭০/৬; মেসকাত, ৫৪৬ পৃ:; মেরকাত, ১১ তম খন্ড, ৯৯ পৃ:; আশিয়াতুল লুমআত; মেরআতুল মানাজিহ)।

*এই হাদিস দ্বারা প্রমান হয়, বহু দূরেও যদি কোন কিছু হয়, আল্লাহর ওলীগণ আল্লাহর নুর দ্বারা তা দেখতে পায়, পাশাপাশি তাঁদের জবানের আওয়াজও বহু দূরে পৌছাতে পারে।

*ফকিহ্গণের ভাষ্যঃ

#দলিলঃ ان النفوس الزكية القدسية اذا تجردت عن العلائق البدنية عرجت واتصلت بالملا الاعلى ولم يبق لها حجاب فترى الكل كالمشاهد *অর্থঃ নিশ্চয় পবিত্র আত্মার অধিকারী যারা ইন্তেকালের পরে তাঁদের রুহ উপরের জগতে মিশে যায়। তখন তাঁদের সামনে কোন পর্দা থাকেনা, ফলে তাঁরা (সৃষ্টি জগতের) সব কিছু দেখতে পায় (মেরকাত শরহে মেসকাত, ৩য় খন্ড, ১১ পৃ:)।

*সুতরাং 'নফছে মুত্মা ইন্নাহ' স্তরের তথা পবিত্র আত্মার অধিকারী আল্লাহর ওলীগণ ইন্তেকালের পরেও সব কিছু দেখতে পান।

#দলিলঃ ان الله تعالى يعطى لارواحهم قوة الاجسد فيذهبون من الارض والسماء والجنة حيث يشاؤون *অর্থঃ নিশ্চয় আল্লাহ তাঁদের (ওলীগণের) রুহকে দেহের মত শক্তি দান করেন, ফলে তাঁরা পৃথিবী, আসমান ও জান্নাতের যত্র-তত্র যাইতে পারেন (তাফছিরে মাজহারী, ১ম খন্ড, ১৬৯ পৃ:)।

*সুতরাং; আল্লাহর বন্ধুগণ ইন্তেকালের পরেও নুরের দেহ দ্বারা সৃষ্টি জগতের যেখানে খুশি সেখানে যেতে পারেন। ঐ নুরের দেহকে ত্বরিকতের ভাষায় 'ওজুদ মাহ্ব লাহ' বা 'তেফলুল মায়ানী' বলা হয়।

#দলিলঃ والرسول- عليه الصلاة والسلام له الخيار فى طواف العوالم مع ارواح الصحابة رضى الله عنهم ولقد راه كثير من الاولياء *অর্থঃ রাসূলে পাক (ছাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) সাহাবীগণের রুহসমূহ সঙ্গে নিয়ে জগৎ সমূহে ভ্রমন করেন, এ অবস্থায় অনেক আউলিয়াগণ দেখেছেন (তাফছিরে রুহুল বয়ান, ১০ম খন্ড, ১১৩ পৃ:)।

*সুতরাং প্রিয় নবীজি (ছাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) ও সাহাবীগণ ভূ-মন্ডলে সফর করেন, সাধারণ মানুষ কেউ দেখতে পায়না, অথচ আল্লাহর ওলীগণ তা দেখতে পান।

*আরেকটি বিষয় লক্ষ্যনীয় যে, সাহাবীগণ নবীর উম্মত, অথচ নবীজির সাথে সফর করেন। তাহলে বুজা যায়, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) উম্মতেও সৃষ্ট জগতে সফর করতে পারেন।

*তাই বলা যায়, আল্লাহর ওলীগণ জীবদ্দশায় ও ইন্তেকালের পরেও আল্লাহর মনোনিত চোখ হওয়ার কারনে তাঁদের চোখে আল্লাহর নুর বিরাজ করে। ফলে তাঁরা সৃষ্টি জগতের সব কিছু দেখতে পায়।

*কুরআন-সুন্নাহর দৃষ্টিতেঃ

*নবী-রাসূলগণ ও ওলীগণের উছিলাঃ

*উছিলা মু'মিনের জিবনে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারন উছিলা ছাড়া জগতে কোন কিছুই সম্ভব নয়।

*উছিলার কয়েকটি ক্ষেত্র রয়েছে, যেমনঃ

১.ইলমে জাহের অর্জনের জন্য ওস্তাদকে উছিলা হিসেবে দরকার,

২.দোয়া কবুলিয়াতের জন্যও উছিলা দরকার, ৩,আল্লাহ তা'লার রেজামন্দি হাছিল ও ইলমে বাতেন অর্জনের জন্যও উছিলা দরকার,

৪.বিভিন্ন আজাব-গজব থেকে রক্ষার জন্যও উছিলার প্রয়োজন, ইত্যাদি ইত্যাদি।

*এখানে আমরা ১টি জটিল বিষয় নিয়ে আলোচনা করব, তাহল:

*দোয়া-মোনাজাতে নবী-রাসূলগণ ও আওলিয়াগণের উছিলা দিয়ে দোয়া করা।

*প্রথমেই জানব, দোয়া মোনাজাতে নবী-রাসূলগণ (আঃ) ও আল্লাহর ওলীগণের উছিলা দিয়ে দোয়া জায়েয আছে কি-না। নিচের দলিল গুলো লক্ষ্য করুনঃ

*এ বিষয়টিকে নিয়ে দুইটি দিক রয়েছে। যথাঃ ১, জিবীত নেক বান্দাকে উছিলা করা, ২. ইন্তেকাল প্রাপ্ত নেক বান্দার উছিলায় দোয়া।

*প্রথম বিষয় হল জিবীত নেক বান্দার উছিলার দোয়া। নিচে লক্ষ্য করুনঃ

#দলিলঃ عن عثمان بن حنيف (رض) ان رجلا ضرير البصر اتى النبى (ص) فقال ادع الله تعالى ان يعافينى فقال ....فامره ان يتوضا فيحسن الوضوء ويدعو بهذا الدعاء: اللهم انى اسالك واتوجه بنبيك صلى الله عليه وسلم نبى الرحمة يا محمد انى توجهت بك الى ربى فى حجتى هذه لتقضى لى اللهم فشفعه فى *অর্থঃ হজরত উসমান ইবনে হুনাইফ (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম এর কাছে এক অন্ধ ব্যক্তি এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার অন্ধ চোখের জন্য দোয়া করুন। অতঃপর নবীজি ছাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়া ছাল্লাম বললেন: তুমি উত্তম রুপে ওজু করে অতঃপর বল: হে আল্লাহ তোমার কাছে নিবেদন করছি, রহমতের নবী ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম এর উছিলায় তোমার অভিমুখী হলাম। ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনার মাধ্যমে আমার রবের প্রতি

মুতাওয়াজ্জু হলাম তিনি যেন আমার চোখের পর্দা সরিয়ে দেন। .... অতঃপর চক্ষু ভাল হয়ে যায় (ইবনে মাজাহ, ৯৯ পৃ: সহি সনদে শাব্দিক ব্যবধানে; তিরমিজি; হাদিস নং ৩৫৭৮ সহি সনদে; আবু দাউদ শরিফ, আব্দুল্লাহ ইবনে হুমাইদী তাঁর মুসনাদে, ১৪৭/১; তাফছিরে রুহুল মায়ানী, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৪১৬ পৃ:; নাসাঈ সহি সনদে, সহি ইবনে খুজাইমা; মাওয়াহেবুল্লাদুন্নিয়া, ৪র্থ খন্ড, ৫৯৪ পৃ:; হাকেম হাদিসটি বর্ণনা করে বলেছেন সহি; তারগীব; ঈমাম বুখারীর 'তারিখে কবিরে'; নশরুত্ত্বিব; জামেউছ ছাগীর, ১ম জি: ৯৪ পৃ:)।

*এই হাদিস দ্বারা প্রমান হয়, জিবীত ব্যক্তির উছিলা দিয়ে দোয়া করা সুন্নাত বরং নবীজির শিক্ষা। এই হাদিসে আরেকটি বিষয় লক্ষ্যনীয় যে, নবীজির কাছেও সরাসরি নালিশ করা যায়, যেমন বলা হয়েছেঃ يا محمد صلى الله عليه وسلم انى اتوجهت بك الى ربى *অর্থঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনার মাধ্যমে রবের প্রতি মনোনিবেশ হলাম।

#দলিলঃ عن شريح بن عبيد.........قال (علي) انى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للابدال يكونون بالشام وهم اربعون رجلا كلما مات رجل ابدل الله مكانه رجلا يسقى بهم الغيث وينصر بهم على الابداء ويصرف عن اهل الشام بهم العذاب *অর্থঃ হজরত আলী (রাঃ) বলেন, নবী পাক ছাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়া ছাল্লাম কে বলতে শুনেছি, আব্দাল সিরিয়াতে'ই হয় এবং তাঁদের সংখ্যা ৪০ জন। যখন একজন মারা যায় অন্য একজন দ্বারা ঐ স্থান পূরণ করা হয়। এই চল্লিশজন আব্দালের উছিলায় আকাশ হতে বৃষ্টি হবে, শত্রুর উপর বিজয় লাভ হবে, সিরিয়া থেকে আজাব ও গজব দূরিভূত হবে (মুসনাদে আহমদ, ১১২/১; মেসকাত, ৫৮২ পৃ:; মেরকাত শরহে মেসকাত, ১১ তম খন্ড, ৪০৯ পৃ:)।

*এই হাদিসের দ্বারা প্রমান হয়, আব্দাল তথা আল্লাহর প্রিয় বান্দাগণের উছিলায় আল্লাহ বৃষ্টি দেন, যুদ্ধে বিজয় দান করেন, আজাব-গজব দূরিভূত হয়। যারা ওছিলা মানেনা, বরং বলেন ওছিলার প্রয়োজন নেই আল্লাহ সরাসরী দিবেন। তাহলে বলুন আল্লাহ সরাসরী দিলে আব্দালদের উছিলায় এগুলো দেন কেন? সরাসরী দেননা কেন? নাকি আল্লাহ আব্দালগণের উছিলায় বৃষ্টি দিয়ে ভুল করেন? এবং আব্দালের উছিলায় যুদ্ধে বিজয় ও জমীন থেকে আজাব দূর করে ভুল করেছেন? (নাওজুবিল্লাহ)

#দলিলঃ عن أنس ان عمر بن حطاب (رض) كان اذا قحطوا استسقى بالعباس (رض) فقال اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبيك صلى الله عليه وسلم فتسقينا وانا نتوسل اليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون *হজরত আনাছ (রাঃ) বলেন, নিশ্চয় হজরত উমর (রাঃ) অনাবৃষ্টির সময় আব্বাস (রাঃ) এর উছিলায় দোয় করতেন। অতঃপর এরুপ বলতেন: হে আল্লাহ আমরা ইতিপূর্বে আমাদের নবীর উছিলায় বৃষ্টির চাইতাম, এখন তাঁরই চাচা আব্বাস (রাঃ) এর উছিলায় দোয়া করছি বৃষ্টি দান করুন, অতঃপর বৃষ্টি হল (সহি বুখারী শরিফ, ১৩৭ পৃ:, হাদিস নং ১০১০; সহি ইবনে খুজাইমা, ২য় খন্ড, ৬০৮ পৃ:; সহি ইবনে হিব্বান, ৮১৪ পৃ: হাদিস নং ২৮৬১; সকলেই সহি সনদে; তাফছিরে রুহুল মায়ানী, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৪১৭ পৃ:; মুসনাদে সুনান, ৭৭৮ নং হাঃ; মুসনাদে উমর, ১৫১৮৪ নং হাঃ; মেসকাত শরিফ, ১৩২ পৃ:; মেরকাত শরহে মেসকাত, ৩য় খন্ড, ৫৫৯ পৃ:; মাওয়াহেবুল্লাদুন্নিয়া, ৪র্থ খন্ড, ২৭৭ পৃ:; নশরুত্ত্বিব)।

*লক্ষ্য করুন, এই হাদিসে নবী ব্যতিত অন্য নেককার লোকের উছিলায় দোয়া করার প্রমান মিলে, কারন আব্বাস (রাঃ) নবী নয়, বরং একজন সাহাবী তথা নেক বান্দাহ, যাকে আল্লাহর অলীও বলা চলে। কারন নবুয়তের যুগের পরেই বেলায়েতের যুগ চালু হয়েছে। হজরত আব্বাস (রাঃ) সেই বেলায়েতের যুগেই পরে। কিছু মূর্খ আছে যারা বলে থাকে, হজরত উমর (রাঃ) নবীর উছিলায় দোয়া করেনি, কারন তিনি মৃত। তাদেরকে বলতে চাই, হজরত উমর (রাঃ) নবীজির উছিলা না দিয়ে আব্বাস (রাঃ) এর উছিলা দেওয়ার কারনে আপনারা বলছেন. নবীজি মৃত ছিল তাই, আচ্ছা বলুন'ত! উমর (রাঃ) যে সময় দোয়া করেছিলেন, সে সময় হজরত আব্বাস (রাঃ) কি জিবীত ছিল? অবশ্যই না। কারন উমর (রাঃ) এর খেলাফতের সময় আব্বাস (রাঃ) জিবীত ছিলেন না, বরং ইবনে আব্বাস (রাঃ) জিবীত ছিলেন। নবীজি জিবীত থাকা কালিনই আব্বাস (রাঃ) ইন্তেকাল করেছেন।

*সুতরাং এই হাদিস দ্বারা ইন্তেকাল প্রাপ্ত নেক বান্দার উছিলা দিয়ে দোয়া করা জায়েয প্রমানিত হয়। পাশাপাশি জিবীত ব্যক্তির উছিলায় দোয়াও জায়েব প্রমানিত হয়, কারন উমর (রাঃ) বলেছেনঃ كنا نتوسل اليك بنبينا صلى الله عليه وسلم *অর্থাৎ, আমরা ইতিপূর্বে নবীজির ওছিলা দিয়ে দোয়া করতাম। অতঃপর বলেন: انا نتوسل اليك بعم نبينا *এখন আপনার কাছে নবীজির চাঁচার উছিলায় প্রার্থনা করছি। এখানে বলা হয়নি যে, "এখন'ত নবী নাই" বরং বলা হয়েছে আগে নবীর উছিলায় দোয়া করতাম, এখন নবীর চাঁচার উছিলায় প্রার্থনা করছি।

#দলিলঃ ان ابا طالب حين اقحط الوادي لستسقى ومعه النبى صلى الله عليه وسلم وهو غلام فاخذ ابو طالب النبى صلى الله عليه وسلم والصق ظهره بالكعبة ولاذ النبى صلى الله عليه وسلم باصبعه وما فى السماء قزعة فاقبل السحاب من ها هنا وها هنا واغدق زاغدق وانفجر له الوادي *অর্থঃ একবার দূর্ভিক্ষ দেখা দিলে আবু তালিব রাসূল ছাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়া ছাল্লাম কে সাথে নিয়ে বৃষ্টির জন্যে দোয়া করতে বের হলেন। রাসূল ছাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়া ছাল্লাম তখন বালক ছিলেন। আবু তালিব রাসূল ছাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়া ছাল্লাম কে ধরে কা'বা ঘরের সাথে তাঁর পিঠ লাগিয়ে

দিলেন এবং রাসূল ছাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়া ছাল্লাম এর অঙ্গুলী ধরে বৃষ্টির জন্য দোয়া করতে লাগলেন। আকাশে তখন মেঘের এক টুকরাও ছিল না। হঠাৎ চার দিকে মেঘ দেখা গেল এবং মূষলধারে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল এবং সারা ময়দানে পানি প্রবাহিত হল। আবু তালিব এ ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করেই বলে ছিল: মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম ছিল উজ্জল, যার উছিলায় বৃষ্টি প্রার্থনা করা হত। তিনি ইয়াতিমের আশ্রয়স্থল ও বিধবাদের সতীত্ব রক্ষাকারী (তারিখে ইবনে আছাকির; তাফছিরে মাজহারী, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৪০৫ পৃ:)।

*সুতরাং প্রিয় নবীজির নবুয়তের দ্বায়িত্ব পাওয়ার পূর্বেও তাঁর উছিলা দিয়ে দোয়া করা হত এবং আল্লাহ তা'লা তা কবুল করতেন।

#দলিলঃ عن امية بن خالد بن عبد الله بن اسيد عن النبى صلى الله عليه وسلم انه كان يستفتح بصعاليك المهاجرين *অর্থঃ হজরত উমাউয়া ইবনে খালিদ ইবনে ওছাইদ (রাঃ) নবী করিম ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি গরীব-মুহাজেরদের উছিলায় দোয়া কামনা করতেন (শরহে সুন্নাহ, হা: নং ৪০৬২; মেসকাত, ৪৪৭ পৃ:; মেরকাত শরহে মেসকাত, ৯ম খন্ড, -৪৩৪ পৃ:; আশিয়াতুল লুমআত)।

* এই হাদিসটি উছিলা দিয়ে দোয়া করার অন্যতম দলিল এবং সুন্নাত বলে প্রমানিত, কারন সয়ং নবীজি উছিলা দিয়ে দোয়া করতেন।

#দলিলঃ প্রিয় নবীজি ছাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়া ছাল্লাম এভাবে দোয়া করতেন, হে আল্লাহ গরীব মোহাজের সাহাবীদের উছিলায় আমাদেরকে শত্রুর উপর বিজয় দান করুন (কুরতবী শরিক)।

#দলিলঃ عن ابى سعيد الخدرى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتى على الناس زمان فيغزو فءام من الناس فيقولون هل فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم فيفتح لهم *অর্থঃ হজরত আবু সাইদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূল পাক ছাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়া ছাল্লাম বলেছেন: এমন এক যুগ আসবে বলা হবে: তোমাদের মাঝে নবীর কোন সাহাবী আছে কি? উত্তরে বলা হবে: হ্যাঁ। অতঃপর (সাহাবীর উছিলায়) বিজয় লাভ হবে। ثم يأتى على الناس زمان فيغزو فءام من الناس فيقال هم فيكم من صاحب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم فيفتح لهم অতঃপর এমন এক যুগ আসবে জেহাদে বহু লোক যোগদান করবে, জিজ্ঞাসা করা হবে, তোমাদের মাঝে নবীর সাহাবীর কোন সঙ্গী (তাবেঈ) আছে কি? উত্তরে বলা হবে: হ্যা। অতঃপর তাঁদের উছিলায় বিজয় লাভ হবে। ثم يأتى على زمان فيغزو فءام من الناس فيقال هل فيكم من صاحب من صاحب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم فيفتح لهم *অতঃপর এক জামানা আসবে বহু সংখ্যক লোক জেহাদে একত্রিত হবে, জিজ্ঞাসা করা হবে: তোমাদের মাঝে এমন লোক আছে কি যে

নবীজির সাহাবীদের সঙ্গীদের সঙ্গ লাভ করেছে? (তাবে তাবেঈ) উত্তরে বলা হবে: হ্যাঁ। তখন বিজয় লাভ হবে (সহি বুখারী শরিফ; সহি মুসলীম; মেসকাত, ৫৫৩ পৃ:; জামেউল মাসানেদেউ ওয়াস সুনান; মুসনাদে আবী ইয়ালা, ২৪১ পৃ:; মেরকাত; আশিয়াতুল লুমআত)।

*ইহা বুখারী, মুসলীমের হাদিস, যা দ্বারা দিবালোকের মত প্রমান হয় আল্লাহর নেক বান্দার উছিলায় দোয়া জায়েয। সাহাবী, তাবেঈ, তাবে তাবেঈগণের উছিলায় দোয়া করে যুদ্ধে জয় লাভ করা সম্ভব। সুতরাং জিবীত নেক বান্দাগণের উছিলায় দোয়া করা যাবে, বরং ইহা সুন্নাত

#দলিলঃ عن ابى الدردا عن النبى صلى الله عليه وسلم ابغنى فى ضعفائكم فانما ترزقون او تنصرون بضعفائكم *অর্থঃ হজরত আবু দারদা (রাঃ) নবী করিম ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: তোমাদের দূর্বলদের মধ্যেই আমাকে অন্বেষণ কর। কেননা দূর্বলদের উছিলায় তোমাদেরকে রিজিক অথবা বললেন সাহায্য দান করা হয় (মেসকাত, ৪৪৭ পৃ:; আবু দাউদ শরিফ, হা: নং ২৫৯৪; মেরকাত শরহে মেসকাত, ৯ম খন্ড, ৪৩৩ পৃ:; তিরমিজি শরিফ, হা: নং ১৭০২; নাসাঈ শরিফ, ৩১৭৯ নং হা:; মুসনাদে আহমদ, ১৯৮/৫; জামেঈছ ছাগীর, হা: নং ৫৮; হাকেম, ১০৬/২; সহি ইবনে হিব্বান; মেরআতুল মানাজিহ)।

*উছিলায় যদি আল্লাহ দিতে পারে তাহলে আমরা উছিলা দিয়ে আল্লাহর কাছে চাইতে পারব না কেন?

*মৃত ব্যক্তির ওছিলায় দোয়াঃ

*জিবীত ব্যক্তির উছিলায় দোয়া করা জায়েয, যা হাদিস দ্বারা প্রমান পাওয়া যায়। এখন জানা দরকার যে ইন্তেকাল প্রাপ্ত নেক বান্দাগণের উছিলায় দোয়া করা জায়েয কি-না? ইতিপূর্বেও আমরা কিছু দলিল উপস্থাপন করেছি। এ ব্যাপারে আরোও দলিল আছেন কি-না, জানা দরকার। নিচে লক্ষ্য করুনঃ-

#দলিলঃ فقال له عثمان بن حنيف اءت الميضاة فتوضا ثم اءت المسجد فصل فيه ركعتين ثم قل *একদা এক লোককে{উসমান (রাঃ) এর যুগে} হজরত উসমান ইবনে হুনাইফ (রাঃ) এর কাছে যাওয়ার পর তিনি তাকে বললেন: উত্তম রূপে ওজু কর এবং দুই রাকাত নামাজ আদায় করে এভাবে দোয়া করঃ اللهم انى اسالك واتوجة اليك بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبى الرحمة يا محمد ! انى اتوجة بك الى ربى فيقضى حاجتى *হে আল্লাহ! তোমার কাছে প্রার্থনা করছি ও তোমার দিকে মুতাওয়াজ্জু হচ্ছি রহমতের নবী ছাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়া ছাল্লাম এর উছিলায়, ওহে মুহাম্মদ! আমি আপনার উছিলায় আল্লাহর দিকে মুতাওয়াজ্জু হলাম তিনি যেন আমার হাজত পূরণ করে দেন (তাবারানী তাঁর কবীরে ও আওছাতে, সহি সনদে, আত্তারগীব ওয়াত্তারহীব; এনহাজুল হাজাত; বায়হাক্বী দু'টি সনদে; নশরুত্তিব)।

* এই হাদিস দ্বারা বুঝা যায় নবীজির ইন্তেকালের পরেও তাঁর উছিলা দিয়ে দোয়া করা জায়েয। স্বয়ং নবীর সাহাবীগণই উছিলা দিয়ে দোয়া করেছেন। বলুন! নবীর সাহাবীগণ কি ভুল করেছেন? (নাউজুবিল্লাহ)।

*হাদিস শরিফে উল্লেখ আছেঃ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل اصحابى كمثل نجوم السماء من اخذ هم فهو هد *আমার সাহাবীগণের মেছাল হল আকাশের তারকার মত, যে ইহা থেকে গ্রহন করবে সঠিক রাস্থা পেয়ে যাবে (মুসনাদে ফিরদাউস, সহি সনদে, তাফছিরে রুহুল মায়ানী)।

*অন্য জায়গায় উল্লেখ আছেঃ اصحابى كنجوم فبايهم اقتديتم اهتديتم *আমার সাহাবীগণ আকাশের তারকার মত, যে কোন একজন অনুসরন করবে হেদায়েতের রাস্থা পেয়ে যাবে (মেসকাত শরিফ, ৫৫৪ পৃ:; রজিন; মেরকাত, ১১ তম খন্ড, ১৬২ পৃ:; আশিয়াতুল লুমআত; মেরআত)।

*সুতরাং সাহাবীদের সুন্নাত হিসেবে ইন্তেকাল প্রাপ্ত নেক বান্দাগেণের ও নবীজির উছিলা দিয়ে দোয়া করা জায়েয। এছাড়াও উমর (রাঃ) আব্বাস (রাঃ) ইন্তেকালের পরে উছিলা দিয়ে দোয়া করেছেন, যা আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি।

#দলিলঃ عن ابى سعيد الخدرى عن النبى صلى الله عليه وسلم فى دعاء الخارج الى الصلوة اللهم انى اسالك بحق السائلين عليك........ *অর্থঃ হজরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূল পাক ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম বলেছেন: যে ব্যক্তি নামাজের উদ্দেশ্যে বের হবে তখন সে যেন এভাবে দোয়া করেঃ اللهم انى اسالك بحق السائلين.. *হে আল্লাহ! প্রার্থনা কারীদের উছিলায় তোমার কাছে প্রার্থনা করছি (বায়হাক্বী শরিফ; তাফছিরে রুহুল মায়ানী, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৪১৯ পৃ:;ইবনে মাজাহ, হা: নং ৭৭৮; মুসনাদে আহমদ, হা: নং ১১১৭; মুছান্নাফে ইবনে আবী শায়বাহ, ২৯২০২ নং হা:; ইবনে জাইদ তাঁর মুসনাদে, হা: নং ২০৩১; মুসনাদে আবু নুয়াইম, ইবনে কাইয়ুম কৃত: যাদুল মায়াদ কিতাবে; কানজুল উম্মাল, ২য় খন্ড, ২৭৩ পৃ:; দায়লামী শরিফ) হাদিসটি সহি।

*এই হাদিসের মাধ্যমে স্পষ্ট প্রমান হয়ে যায়, প্রার্থনা কারী তথা নবী রাসূল, ওলীগণ এক কথায় নেক বান্দাগণ, যারা আল্লাহর কাছে প্রতিনিয়ত প্রার্থনা করত, তাদের ওছিলা দিয়ে দোয়া করার শিক্ষা স্বয়ং আল্লাহর নবীর শিক্ষা। লক্ষ্যনীয় যে, প্রার্থনা কারীগণ ইন্তেকাল প্রাপ্ত, তাই ইন্তেকাল প্রাপ্ত নেক বান্দাগণের উছিলায় দোয়া করা জায়েয।

#দলিলঃ اللهم اغفرلى امى فاطمة بنت اسد وسع عليك مدخلها بحق نبيك والانبياء الذين من قبلى .... *অর্থঃ [আলী (রাঃ) এর মাতা ফাতেমা বিনতে আছাদ (রাঃ) ইন্তেকাল করার পর, ৩য় হিজরীতে নবীজি দোয়া এভাবে দোয়া করেছেন] হে আল্লাহ! তুমি আমার চাচীকে তোমার সত্য নবী

ও আমার পূর্বে যে সকল নবী-রাসূলগণ এসেছে তাঁদের উছিলায় ক্ষমা করে দেন (সহি ইবনে হিব্বান, হাকেম, তাবারানী, সকলেই সহি সনদে)।

*এই হাদিস ইন্তেকাল প্রাপ্ত নেক বান্দাগণের উছিলায় দোয়া করার অন্যতম দলিল। লক্ষ্যনীয় যে, স্বয়ং রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম এভাবে দোয়া করেছেন, সুতরাং ইহা সুন্নাত।

#দলিলঃ মদিনা শরিফে দূর্ভিক্ষ আসলে সাহাবীগণ মা আয়েশা (রাঃ) এরন নিকট যায়, অতঃপর তিনি এ ভাবে পরামর্শ দিলেনঃ فاجعلوا منه كوى الى السماء حتى لا يكون بينه وبين السماء سقف ففعلوا فمطروا حتى نبت العشب وسمنت الابل حتى تفتقت من الشحم *রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম এর রওজা মোবারকের ছাঁদ উন্মুক্ত করে দাও যেন নূরানী রওজা ও আসমানের মাঝে কোন বাধা না থাকে। অতঃপর লোকেরা এরুপই করল। তখন মুহুর্তের মধ্যে প্রবল বৃষ্টি শুরু হল এবং উদ্ভিদ জন্মালো ফলে উট গুলো এমন তাজা হল যে চর্বিতে ভরপুর হয়ে গেল (দারেমী শরিফ, ১ম খন্ড, ৫৬ পৃ:; মেসকাত, ৫৪৬ পৃ:; মাওয়াহেবুল্লাদুন্নিয়া, ৪র্থ খন্ড, ২৭৬ পৃ:; মেরকাত, ১১ তম খন্ড, ৯৫ পৃ:; নশরুত্তিব; আশিয়াতুল লুমআত; মেরআতুল মানাজিহ)।

*এই হাদিস দ্বারা বুঝা যায়, নবীজির রওজা মোবারক আকাশ থেকে বৃষ্টি পাওয়ার উছিলা। আল্লাহ পাক রওজা পাকের উছিলায় বৃষ্টি দেন। এখন ওহাবীদের জিজ্ঞাসা করি আপনারা বলেন উছিলার প্রয়োজন নেই, আল্লাহ সরাসরি'ই দিবেন। তাহলে অনাবৃষ্টির সময় আল্লাহ তা'লা উছিলার মাধ্যমে বৃষ্টি দিলেন কেন? তাহলে'ত বুজা যায় মহান আল্লাহ উছিলার পক্ষে। আহ! ওহাবীদেরই কপাল মন্দ!

*এমনিতেই সাহাবীগণ কোন সমস্যায় পরে গেলে নবী করিম ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম এর রওজা পাকে গিয়ে নালিশ করতেন ও দোয়া করতেন। যেমনঃ

#দলিলঃ ان الناس قاخطو فى خلافة عمر بن الخطاب فجاء بلال بن حارس الى قبر النبى صلى الله عليه وسلم فقال استسقا لى امتك يا رسول الله فانهم هلكوا.... *অর্থঃ একদা উমর (রাঃ) এর যুগে দূর্ভিক্ষ দেখা দেয়, অতঃপর হজরত বেলাল ইবনে হারেছ (রাঃ) নবীজির রওজা মোবারকে গেলেন ও বললেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার উম্মতের জন্য বৃষ্টি প্রার্থনা করুন, কেননা তারা ধংশ্ব হয়ে যাচ্ছে (বায়হাক্বী শরিফ; মাওয়াহেবুল্লাদুন্নিয়া, ৪র্থ খন্ড, ২৭৬ পৃ:; ইবনে আবী শায়বাহ, ঈমাম বুখারী তাঁর তারিখে, হাদিসের সনদ সহি)।

*এই হাদিস দ্বারা বুঝা যায়, কোন কঠিন সমস্যায় পরলে নবী পাকের মাজারে গিয়ে সরাসরি নবীর কাছেও নালিশ করতেন, ফলে নবীজি উম্মতের পক্ষে আল্লাহর কাছে রওজা পাক থেকেই প্রার্থনা করবেন।

*কিন্তু আফছোছ! একদল গন্ড মূর্খ আছে বলে বেড়ায় যে, সাহাবীগণ নাকি নবীর মাজারেও কোন সমস্যার কারনে যাইতেন না। অথচ হজরত ইবনে উমর (রাঃ) সফর থেকে ফিরেই নবীজির রওজা পাকে প্রবেশ করতেন। এ ব্যাপারে আমরা আলাদা একটি অধ্যায়ে আলোচনা করব।

#দলিলঃ عن علي قال قدم علينا اعرابي بعدما دفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث ايام فرمى بنفسه على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحثا على راسه من ترابه فقال : قلت يا رسول الله فسمعنا قولك الله عليك (ولو انهم اذ ووعيت عن الله فوعينا عنك وكان فيما انزل ظلموا انفسهم..) قد ظلمت نفسي و جءتك تستغفر لي فنودي من قبر انه قد غفر لك *অর্থঃ হজরত আলী (রাঃ) বর্ণনা করেন, হজরত মুহাম্মদ বিন হারব আল হেলালী (রাঃ) ঐ সময় নবীজির রওজা যিয়ারত করে হেলান দিয়ে বসে ছিলেন। এমন সময় নবীজি দাফনের ৩ দিন পরে একজন আরবী লোক এসে রওজা পাকের কাছে আছরে পরলেন, রওজা পাকের ধুলা-বালি নিয়ে তাঁর মাথায় মাসেহ করলেন, অতঃপর বললেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আল্লাহ থেকে বুঝেছেন আমরা আপনা থেকে বুঝেছি, আপনার উপর নাজিল হয়েছে: قد ظلمت نفسي وجءتك تستغفر لي فنودى من قبر انه قد غفر لك *ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আমার নফছের উপর জুলুম করেছি, আপনার কাছে এসেছি আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। অতঃপর রওজা পাক থেকে আওয়াজ আসল: তোমাকে অবশ্যই ক্ষমা করা হয়েছে (তারিখে ইবনে আছাকির শরিফ; তাফছিরে কুরতুবী শরিফ, ৫ম খন্ড, ২৩৩ পৃ:; তাফছিরে ইবনে কাছির সামান্য ব্যাবধানে; তাফছিরে রুহুল বয়ান; শুয়াইবুল ঈমান, ২য় খন্ড, ১৫১৭ পৃ: সামান্য ব্যাবধানে; নশরুত্তিব)।

*এই হাদিস দ্বারা বুঝা যায়, গোনাহ মাফের জন্য নবীজ ছাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়া ছাল্লাম হল উছিলা। সুতরাং উছিলার মাধ্যমে গোনাহ মাফ চাওয়া সুন্নাত।

#দলিলঃ ....ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءك فستغفرو الله *অর্থঃ যদি তারা নিজেদের উপর জুলুম করে আপনার কাছে আসে অতঃপর আল্লাহর কাছে তাওবা করে, রাসূল যদি তাদের পক্ষে তাওবা করে তাহলে অবশ্যই আল্লাহকে ক্ষমাশীল হিসেবে পাবে (সূরা: নিসা)।

*এই আয়াতে বলা হয়েছে, কোন লোক জুলুম করে আপনার কাছে আসে, এখানে বলা হয়নি মদিনায় আসে বরং বলা হয়েছে আপনার কাছে আসে। সুতরাং নবীজি যখন শরিয়তে জিবীত ছিলেন তখন লোকেরা নবীজির কাছে যাইত, এখন যেকোন জায়গা থেকে নবীজিকে উছিলা করে ক্ষমা প্রার্থনা করতে পারবে। যেমনঃ لما اعترف ادم بالخطيئة قال يا رب اسالك بحق محمد ان تغفرلى فقال الله تعالى يا ادم كيف عرفت محمدا ولم اخلقه .....

*অর্থঃ যখন আদম (আঃ) অপ্রত্যাশিত কাজটি করে বশল, তখন সে বলল হে এলাহী! আপনার কাছে প্রার্থনা করছি আমাকে মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম এর উছিলায় ক্ষমা করে দেন। আল্লাহ বললেন: হে আদম তুমি মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম কে কিভাবে চিনলে? অথচ আমি তাঁকে এখনো সৃষ্টি করিনি। رفعت راسى العرش مكتوبا لا اله الا الله محمد رسول الله فرايت على قوائم আদম বললেন: আপনি যখন আমাকে সৃষ্টি করলেন আমি মাথা উচু করে আরশে লিখিত দেখেছি: "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ"। অতঃপর আমি তাঁকে চিনতে পেরেছি।.... আল্লাহ বললেন: فقال الله صدقت يا ادم انه لاحب الخلق الي فغفرتلك ولو لا محمد ما خلقتك তুমি সত্যিই বলেছ কারন, নিশ্চয় এই সৃষ্টি আমার কাছে অধিক প্রিয় অতঃপর আমি তাঁকে ক্ষমা করে দিলাম, আমি যদি মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম কে না বানাইতাম, আদম! তোমাকেও বানাইতাম না (বায়হাক্বী তাঁর দালাইলুন্নবুয়ত কিতাবে সহি সনদে; মুস্তাদরাকে হাকেম, ৪র্থ খন্ড, ১৫৮৩ পৃ:; তাবারানী শরিফ; মাওয়াহেবুল্লাদুন্নিয়া, ১ম খন্ড; রুহুল বয়ান, ৭ম খন্ড, ২৬৪ পৃ:)।

*আদম (আঃ) দুনিয়া থেকেই আল্লাহর দরবারে নবীজির উছিলা দিয়ে দোয়া করেছেন, অতঃপর দোয়া কবুলও হয়েছে। আদম (আঃ) কিন্তু নবীজির রওজা মোবারকে গিয়ে দোয়া করেননি, কারন ঐ সময় রওজা মোবারকই ছিল না। অনেকে হয়ত ভাবেন কোন মানুষের উছিলা দিয়ে দোয়া করা জায়েয নয়, তাঁদেরকে জিজ্ঞাসা করতে চাই আদম (আঃ) কেন আমাদের নবীর ওছিলায় দোয়া করলেন? কিংবা আল্লাহ ঐ উছিলা কবুল করলেন কেন?

যেই নবী আসার আগেই উছিলা দিয়ে দোয়া করা গেছে, সেই নবীর ইন্তে কালের পরে কেন দোয়া করা যাবেনা?

#দলিলঃ ان اية ملكه ان ياتيكم التابوت فيه سكنة من ربكم وبقية مما ترك ال موسى وال هارون تحمله الملئكة *অর্থঃ {হজরত শামাউন (আঃ) বনী ইসরাইল জাতিকে বললেন} তালুত এর বাদশাহীর প্রমান এই যে, তাঁর নিকট তাবুত আসবে, যার মধ্যে রয়েছে রবের পক্ষ হতে মুসা (আঃ) ও হারুন (আঃ) এর বংশধরের রেখে যাওয়া 'ছাকিনা, আর ইহা ফেরেস্তারা বহন করে আনবে (সূরা বাকারা)।

* এই আয়াতের তাফছিরে উল্লেখ আছে: মুছা (আঃ) ও হারুন (আঃ) এর বংশের রেখে যাওয়া 'ছাকিনা' হল মুছা (আঃ) এর লাঠি এবং হারুন (আঃ) এর জামা ও পাগড়ী মোবারক যা ঐ সিন্দুকে ছিল। তাফছিরে উল্লেখ আছে: বাদশা তালুত ঐ সিন্দুকে রাখা লাঠি, জামা ও পাগড়ীর উছিলা ধরে যুদ্ধের ময়দানে বিজয় লাভ করতেন।

আল্লাহর কোরআন দ্বারা প্রমান হয় যে, নবী-রাসূলগণের ...দি তথা জামা, লাঠি ও পাগড়ীর ইত্যাদির উছিলায় দোয়া করা জায়েয বরং ফলপ্রসূ।

*বলতে পারবেন কি, যদি নবীদের ব্যাবহার কৃত জিনিসের উছিলা দিয়ে দোয়া করা জায়েয হয়, তবে নবী-রাসূলগণের উছিলা দিয়ে দোয়া করা জায়েয হবেনা কেন?

*এজন্যই'ত আমাদের প্রিয় নবী ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম এর রেখে যাওয়া একটি রুমাল হজরাত আসমা বিনতে আবু বকর (রাঃ) কাছে ছিল। হাদিসে উল্লেখ আছে ঐ রুমালের ধৌত করা পানি কাউকে পান করালে পেটের কঠিন রোগ ভাল হয়ে যাইত (সহি মুসলীম, মাদারেজুন্নবুয়ত, শিফা শরিফ)।

**একদা কোন এক যুদ্ধে জয় করার পর বাইতুল মালের গোদামে একজন নবীর লাশ মোবারক পাইলেন। ঐ লাশ মোবারক ছিল হজরত দানাইল (আঃ) এর ; লোকেরা ঐ লাশকে দূর্ভিক্ষের সময় খোলা মাঠে রাখলে বৃষ্টি হত (ইসলামী বিশ্বকোষ)।
এই দলিলটি দ্বারা দুটি বিষয় প্রমানিত হয়, ১/ ইন্তেকাল প্রাপ্ত নবীগণের দেহ মোবারকের উছিলা দিয়ে দোয়া করা জায়েয। ২/ নবীগণ ইন্তেকালের পরেও স্বশরিরে জিন্দা। কারন হজরত দানাইল (আঃ) ইন্তেকাল করেছেন উমর (রাঃ) জন্মের বহু পূর্বে, অথচ তাঁর লাশ মোবারক উমর (রাঃ) এর যুগেও অক্ষত ছিল।

***ফকিহ মুজতাহিদগণের ভাষ্যঃ**

قال امام الغزلى
*হুজ্জাতুল ইসলাম আল্লামা ঈমাম গাজ্জালী (রঃ) বলেনঃ (رح) من يستمد فى حياتى يستمد بعد مماتى *যার কাছে জিবীত অবস্থায় মদদ বা সাহায্য চাওয়া যায়, তার কাছে ওফাতের পরেও মদদ বা সাহায্য চাওয়া যায় (আশিয়াতুল লুমআত যিয়ারত অধ্যায়; মেসকাত, ১৫৪ পৃঃ হাঃ)।

*আল্লামা মোল্লা আরী ক্বারী (রঃ) বলেনঃ নবী-রাসূল ও আওলিয়াগণের উছিলা দিয়ে দোয়া করা মুস্তাহাব (আল হিরজুল ওয়াছেলীন শরহে হিসনে হাসিন)।

*শরহে ফেকহে আকবর ও মিয়াতে মাসাইলে উল্লেখ আছে, কোন বুজুর্গানে দ্বীনের নিকট এইরুপ দোয়া করা যেমন, হে আল্লাহ অমুক নবী এবং ওলীর উছিলায় দোয়া কবুল কর, এরুপ জায়েয (মেরাজুল আশেকীন)।

*দলিলঃ انى تبرك بابى حنيفة واجىء الى قبره فاذا عرضت لي حاجة صليت ركعتين وسالت الله تعالى عند قبره فتقضى سريعا *অর্থঃ ঈমাম শাফেঈ (রঃ) বলেন, নিশ্চয় আমি বরকত লাভের আশায় আবু হানিফা (রাঃ) এর মাজারে যাইতাম। যখন আমার কোন হাজত দেখা দিত আমি মাজারের কাছে ২ রাকাত নামাজ পড়তাম এবং তাঁর মাজারের কাছে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করতাম (ফতুয়ায়ে শামী, ১ম খন্ড, ১৪৯ পৃঃ মুকাদ্দমায়)।

*এই দলিল দ্বারা স্পষ্ট ভাবে প্রমানিত হয় যে, কোন সমস্যায় পরলে আল্লাহর প্রিয় বান্দাগণের মাজারে গিয়ে দোয়া করা জায়েয। কিন্তু ওহাবীরা বলে এরুপ করা জায়েয নেই, তাহলে তারা কি ঈমাম শাফেয়ী (রাঃ) এর চেয়ে বেশী বুঝেন?

*আল্লামা আবুল আলুছী আল বাগদাদী হানাফী (রঃ) বলেনঃ ففيه جعل الدعاء وسلة وهو جائز بل مندوب *অর্থাৎ, দোয়ার ভিতর উছিলা ধরা জায়েয বরং মুস্তাহাব (তাফছিরে রুহুল মায়ানী, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৪১৬ পৃঃ)।

#দলিলঃ اذا تحيرتم فى الامور فاستعينوا باهل المقابر اى اذا عجزتم فى تحصيل مقاصدكم فاسئلوا الله بوسيلة اصحاب القبور لتقبل ببر كتهم دعاء كم *অর্থঃ যখনই তোমরা কোন পেরেশানীতে পর, তখন কবর বাসীদের উছিলা দিয়ে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা কর। এই হাদিসের মর্মার্থ হলঃ যখন তোমরো কোন মকছুদ পূরনে ব্যর্থ হয়ে যাবে, তখন কবর বাসীর উছিলা দিয়ে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করবে-যেন তাঁদের বরকতে তোমাদের দোয়া কবুল হয় (মাজমুয়াউল ফাতুয়া, ১৪১-৪২ পৃঃ)।

*এজন্যেই ঈমাম শাফেঈ (রাঃ) বলেছেনঃ قال امام الشافعى: رحة الله تعالى قبر موسى الكاظم ترياق مجرب لاجابة الدعاء *অর্থঃ হজরত ঈমাম শাফেঈ (রাঃ) বলেছেনঃ হজরত মুছা কাজিম (রঃ) এর মাজার দোয়া কবুল হওয়ার এক আশ্চর্য্য জায়গা (মেসকাত শরিফ, ১৫৪ পৃঃ হাঃ; আশিয়াতুল লুময়াত, যিয়ারত অধ্যায়)।

#দলিলঃ ثم يسال النبى صلى الله عليه وسلم الشفاعة فيقول: يا رسول الله اسالك الشفاعة يا رسول الله اسالك الشفاعة واتوسل بك الى الله *অর্থঃ অতঃপর নবী পাক ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম এর নিকট শাফায়াত প্রার্থনা করবে, এবং এরুপ বলবেঃ হে আল্লাহর রাসূল! আপনার কাছে শাফায়াত প্রার্থনা করছি, আপনার কাছে শাফায়াত প্রার্থনা করছি। আমি আল্লাহর কাছে আপনাকে উছিলা করছি (ফাতহুল কাদির, ৩য় খন্ড, ১৬৯ পৃঃ)।

*সুতরাং নবী পাক (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) কে উছিলা করা জায়েয।

#দলিলঃ আল্লামা আশরাফ আলী থানভী সাহেব বলেছেনঃ অধিকাংশ ওলামায়ে কেরাম ওছিলা গ্রহন জায়েয বলেছেন, যদি তাতে শরিয়তের সীমারেখা লঙ্গন না করা হয় (নশরুত্তিব)।

***সর্বোপরি বলা যায়, নবী-রাসূল (আঃ) ও আউলিয়াকেরামের উছিলায় দোয়া করা জায়েয বরং সুন্নাতে রাসূল ও সুন্নাতে সাহাবা এবং সুন্নাতে আম্বিয়া (আঃ)। এর বিরুধিতা করা জায়েয নয় বরং চরম গোমরাহী।

***কোরআন-সুন্নাহর দৃষ্টিতেঃ**

***পবিত্র শবে বরাতঃ**

*মুসলীম জীবনে 'শবে বরাত' বা 'লাইলাতুল বরাত' একটি গুরুত্ব পূর্ণ আমল। যাকে বরকতময়-কল্যাণময় রজনী বলা হয় অথবা ভাগ্য রজনীও বলা

চলে। মহান আল্লাহ এই রাতে বান্দার ১ বৎসরের বাজেট তথা তক্দির পরিবর্তন-পরিবর্ধন করেন। হায়াত-মউত, রিজিক-সম্মান, সন্তান-সন্ততী, যাবতীয় বিষয় এ রাতেই লিপিবদ্ধ করা হয়।

*কিন্তু আফছোছ! একদল মোনাফেক বেড় হয়েছে যারা বলে বেড়ায় যে, শবে বরাত বলতে কিছুই নেই, আবার অনেকে বলে-বেড়ায় যে, শবে বরাতের ব্যাপারে সহি হাদিস নেই। অনেকে আবার বলে বেড়ায় যে, এ রাতে নফল বন্দেগী করার কোন দরকার নেই বা নফল বন্দেগী হাদিস দ্বারা প্রমানিত নয়। প্রথমেই জানা দরকার যে হাদিস সনদের বিবেচনায়: ৩ প্রকার, যথাঃ ১.সহি, ২. হাছান, ৩. দ্বাউফ।

*সহি ও হাছান এই দু'রকমের হাদিস আকাইদ ও ফাজাইল উভয় ক্ষেত্রেই দলিল দেওয়া যায়, আর দ্বাউফ সনদের হাদিস দ্বারা ফাজাইলের ক্ষেত্রে দলিল দেওয়া যায়। কোন ব্যাপারে যদি মাত্র একটি দ্বাউফ হাদিসও পাওয়া যায় তাহলে ঐ আমলকে এনকার করা যাবে না।

*এজন্যই ঈমামে আজম আবু হানিফা (রাঃ) বলছেনঃ قال ابو حنيفة: ضعيف الحديث اولى من القياس *দ্বাইফ সনদের হাদিস ক্বিয়াছ থেকেও উত্তম (ফাতুয়ায়ে শ্যামী, এলাউছ ছুনান)। মূলত কোন হাদিস দূর্বল নয়, বরং রাবী বা বর্ণনা কারীর দূর্বলতার কারনে হাদিসকে দূর্বল বলা হয়। সকল ফকিহ্ ও মুজতাহিদ্গণ একমত যে দ্বাইফ হাদিস দ্বারা আমল করা মুস্তাহাব।

*আরেকটি বিষয় লক্ষ্যনীয় যে, যদি একই ব্যাপারে একাধিক দ্বায়িফ হাদিস পাওয়া যায় তাহলে সবগুলো সনদ মিলে ক্বাবী বা শক্তিশালী হয়ে যায়।

*প্রথমেই জানা দরকার যে, শবে বরাত কি? 'শবে বরাত' ফারসী শব্দ, 'শব' অর্থ রাত, আর 'বরাত' হল বরকতময় বা কল্যাণময়, মোট অর্থ হয় 'বরকতময় বা কল্যাণময় রজনী'। যাকে আরবীতে 'লাইলাতুল মুবারাকা' বলা হয়। যার অর্থ বরকতময় বা কল্যাণময় রজনী। হাদিস ও কোরআনের তাফছির দ্বারা জানা যায় এ রাতে বান্দার ভাল-মন্দ, হায়াত-মউত, রিজিক-সম্মান, সন্তান-সন্ততী, ধণ-দৌলত ইত্যাদি লিপিবদ্ধ করা হয়, তাই এ-রাতকে 'ভাগ্য রজনীও' বলা হয়।

***পবিত্র কোরআনের আলোকেঃ**

#দলিলঃ حم. والكتاب مبين . ان انزلناه فى ليلة المباركة ان كنا منزرين. فيها يفرق كل امر حكيم *অর্থঃ হা মিম! সু-স্পষ্ট কিতাবের কসম! নিশ্চয় আমি কোরআন নাজিল করেছি বরকতময় বা কল্যাণময় রাতে, আমি'ত সতর্ককারী। এ রাতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্থিরকৃত করা হয় (সূরা দোখান, ১-৪)।

*এই আয়াতে ان انزلنه فى ليلة مباركة: *আমি কোরআন নাজিল করেছি 'লাইলাতুল মোবারাকায়'। এখানে 'লাইলাতুল মোবারাকা' নিয়ে এখতেলাফ রয়েছে।

*হজরত ইকরিমা (রাঃ) বলেছেন: 'লাইলাতুল মোবারাকা' বলতে: نصف من شعبان'নেছফে মিন শাবান' বা শবে বরাত কে বুজানো হয়েছে (তাফছিরে তাবারী শরিফ; তাফছিরে দূর্রে মানছুর, ৫ম খন্ড, ৭৬৪ পৃ:)।

*এই আয়াতের তাফছিরে উল্লেখ আছে,

#দলিলঃ هى ليلة نصف من شعبان *অর্থঃ ইহা হল শাবানের মধ্য রাত (তাফছিরে খাজেন, ৪র্থ খন্ড, ১১৬ পৃ:; তাফছিরে বাহরে মুহিত)।

#দলিলঃ আল্লামা আলাউদ্দিন আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ইব্রাহিম বাগদাদী (রঃ) উল্লেখ করেনঃ ليلة المباركة هى ليلة النصف من شعبان *অর্থঃ ইহা শাবানের মধ্য রাত (তাফছিরে মায়ালেমু তানজিল, ৫ম খন্ড, ৬৭ পৃ:)।

#দলিলঃ আল্লামা ঈমাম ফখরুদ্দিন রাজী (রঃ) উল্লেখ করেনঃ وقال عكرمة و طائفة اخرون انها ليلة البراة هى ليلة النصف من شعبان *অর্থঃ হজরত ইকরিমা ও শেষ যুগের আলিমগণ বলেছেন যে, ইহা লাইলাতুল বরাত আর তা হল শাবানের মধ্য রাত্রি (তাফছিরে কবির, ২৭ তম খন্ড, ২১০ পৃ:; তাফছিরে মায়ালেমু তানজিল, ৫ম খন্ড, ৬৭ পৃ:)।

#দলিলঃ আল্লামা ঈমাম কুরতুবী (রঃ) উল্লেখ করেনঃ انها ليلة النصف من شعبان *অর্থঃ নিশ্চয় ইহা শাবানের মধ্য রজনী (তাফছিরে কুরতুবী, ১৬ তম খন্ড, ১০০ পৃ:; তাফছিরে আবু ছাউদ, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৬৭ পৃ:)।

*লাইলাতুল বরাত ও লাইলাতুল মোবারাকা কি?

#দলিলঃ ان ليلة النصف من شعبان اربعة اسماء الليلة المباركة و ليلة البراة و ليلة الصك و ليلة الرحمن *অর্থঃ নিশ্চয় শাবানের মধ্য রজনীর চারটি নাম রয়েছে, যথা: লাইলাতুল মোবারাকা, লাইলাতুল বারাত, লাইলাতুচ্ছাক্ এবং লাইলাতুর রহমান (তাফছিরে কবির, ২৭ তম খন্ড, ২১১ পৃ:; তাফছিরে রুহুল বয়ান; তাফছিরে ফাতহুল কাদির, সূরা দূখানের ৩ নং আয়াতের তাফছির; তাফছিরে ছাবী, ৪র্থ খন্ড, ৫৫ পৃ:)।

#দলিলঃ يقال ليلة النصف من شعبان. و لها اربعة اسماء : الليلة المباركة و ليلة البراءة و ليلة الصك و ليلة القدر *অর্থঃ বলা হয় (কুরআন নাজিল হয়) শাবানের মধ্য রাতে। আর ইহার চারটি নাম রয়েছে যথা: লাইলাতুল মুবারাকা, লাইলাতুল বরাত, লাইলাতুচ্ছাক্ব ও লাইলাতুল কদর (তাফছিরে কুরতুবী, ১৬ তম খন্ড, ১০০ পৃঃ)।

#দলিলঃ هى ليلة النصف من شعبان وتسمى ليلة الرحمن وليلة المباركة وليلة الصك وليلة البراءة *অর্থঃ ইহা হল শাবানের মধ্য রাত। ইহার নাম হল লাইলাতুল রহমান, লাইলাতুল মুবারাকা, লাইলাতুছ ছাক্ব এবং লাইলাতুল বারাত (তাফছিরে রুহুল মায়ানী, ২৫ তম খন্ড, ১৪৭ পৃ:)।

*এই দলিল গুলোর আলোকে বলা যায়, আয়াতে ليلة المباركة'লাইলাতুল মোবারাকা' বলতে শবে বারাতকেই বুজানো হয়েছে,

কারন শবে বারাতের আরেকটি নাম হল 'লাইলাতুল মোবারাকা'। যেমন আরোও উল্লেখ আছে:

#দলিলঃ ان الليلة المباركة هى ليلة البراءة *অর্থঃ নিশ্চয় লাইলাতুল মোবারাকা হল লাইরাতুল বারাত (তাফছিরে রুহুল মায়ানী, ২৫ তম খন্ড, ১৫২ পৃ:)।

*নিশ্চয় 'লাউহে মাহফুজে' কোরআন নাজিল হয়েছে 'লাইলাতুল বরাতে, আর বাইতুল ইজ্জাতে ও দুনিয়ায় নাজিল হয়েছে কদরের রজনীতে।

*তবে রঈছুল মোফাচ্ছেরীন, নবীজির আপন চাচাত ভাই, হজরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ قال ابن عباس (رض) و غيره انزل الله القران جملة واحد من اللوح المحفوظ الى بيت العزة من السماء الدنيا ثم نزل مفصلا بحسب الوقاءع فى ثلاث و عشرين سنة على رسول الله *অর্থঃ হজরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও অন্যন্ন আলিমগণ বলেন: আল্লাহ পাক একত্রে পবিত্র কোরআন নাজিল করেছেন لوح محفوج 'লাউহে মাহফুজ' থেকে দুনিয়ার নিকটতম আসমানে بيت العزاة 'বাইতুল ইজ্জাতে, অতঃপর তেইশ বৎসরে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম এর উপর পর্যায়ক্রমে নাজিল হয় (তাফছিরে ইবনে কাছির, ৪র্থ খন্ড, ৬৫০ পৃ:; তাবারানী তাঁর কবীরে, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৩৯ পৃ:)।

দলিলঃ عن ابن عباس (رض) و غيره قال نزل ه الله تعالى ليلة القدر الى السماء الدنيا جملة ثم نجمه على محمد صلى الله عليه وسلم عشرين سنة و قيل ثلاث عشرين *অর্থঃ হজরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন: নিশ্চয় আল্লাহ তালা কুরআনকে একত্রে নাজিল করেছেন কদরের রজনীতে দুনিয়ার আসমানে, তারপর পর্যায়ক্রমে মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম এর উপর ২০ বছরে নাজিল করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন ২৩ বছর। (তাফছিরে বাহরে মুহিত, সূরা দূখান, ৩ নং আয়াতের তাফছির)।

#দলিলঃ هو اللوح محفوج الى البيت العزاة فى السماء الدنيا ثم انزله الله سبحانه على نبيه صلى الله عليه وسلم الليالى و الايام فى ثلاث وعشرين سنة *অর্থঃ ইহা (কুরআন) 'লাউহে মাহফুজ' হতে দুনিয়ার নিকটতম 'বাইতুল ইজ্জাতে' নাজিল করেন। অতঃপর আল্লাহ পাক (বাইতুল ইজ্জাত হতে) দীর্ঘ তেইশ বছরে নবী করিম ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম এর উপর কোরআন নাজিল করেছেন (তাফছিরে ফাতহুল কাদির, 'সূরা দূখানের' ৩ নং আয়াতের তাফছির)।

#দলিলঃ هى ليلة القدر او ليلة النصف من شعبان نزل فيها من ام الكتاب اى اللوح محفوج من السماء السباعة الى السماء الدنيا

*অর্থঃ ইহা শবে কদর অথবা শাবানের মধ্য রাত। উম্মুল কিতাব নাজিল করেছেন এই রাতে 'সপ্তম আসমান' হতে দুনিয়ার 'নিকটতম আসমানে' (তাফছিরে জালালাইন, ৪১০ পৃ:)।

*লক্ষ্য করুন! উপরের দলিল গুলো দ্বারা প্রমান হয়, পবিত্র কোরআন 'লাউহে মাহফুজ' থেকে পৃথিবীর আসমানে 'বাইতুল ইজ্জাতে' নাজিল হয়েছে কদরের রজনীতে। পৃথিবীতেও রমজানে কুরআন নাজিল হয়েছে, কারন আল্লাহ পাক বলেন: شهر رمضان الذي انزل فيه القران।

*তবে যা উল্লেখ করা নেই তা হল: 'লাউহে মাহফুজে' কোন সময় কুরআন নাজিল হয়েছে। যেহেতু 'শবে বরাতের' আরেক নাম 'লাইলাতুল মোবারাকা, আর লাইলাতুল মোবারকেও কোরআন নাজিল হয়েছে, সে দিকে লক্ষ্য করে বলা যায়, নিশ্চয় লাইলাতুল বরাতে 'লাউহে মাহফুজে' কুরআন নাজিল হয়েছে। আর এজন্যই হজরত ইকরিমা (রাঃ) ও অন্যন্ন আলিমগণ বলেছেনঃ ليلة المباركة هى ليلة النصف من شعبان يعنى ليلة البراءة *অর্থঃ 'লাইলাতুল মোবারক' মানে 'নেছফে মিন শাবান' তথা শবে বরাত। আর ঐ দিনই কোরআন নাজিল করা হয়েছে। তবে লাউহে মাহফুজে নাজিল হয়েছে; দুনিয়ায় বা বাইতুল ইজ্জাতে নয়।

فيها يفرق كل امر حكيم *অর্থঃ ইহাতে নির্ধারণ করা হয় সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তথা তাক্‌দির স্থিরকৃত হয়।

*এই আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অনেকে বলেন, কদরের রাতে বান্দার তকদির স্থির করা হয়, তাই 'লাইলাতুল মোবারাকা' বলতে কদরের রজনী হবে। তাদের কথার জবাব এরুপঃ

*শবে বরাতে তক্‌দির নির্ধারণের ব্যাপারে প্রিয় নবীজি ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম এর আপন চাচাত ভাই রঈছুল মোফাচ্ছেরীন হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ وروى ابو الضحى عن ابن عباس (رض) ان الله يقضى الاقضية فى ليلة النصف من شعبان ويسلمها الى اربابها فى ليلة القدر *অর্থঃ আবু দোহা, ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন: নিশ্চয় আল্লাহ শাবানের মধ্য রাতে সকল কিছু স্থির করেন এবং কদরের রজনীতে দ্বায়িত্বশীলদের কাছে অর্পন করেন (তাফছিরে মায়ালেমু তানজিল, ৫ম খন্ড, ৬৮ পৃ:; তাফছিরে মাজহারী, ৮ম খন্ড, ৩০৫ পৃ:; তাফছিরে খাজেন, ৪র্থ খন্ড, ১১৬ পৃ:)।

*সুতরাং, এই আয়াত দ্বারা 'লাইলাতুল বরাত' কেও বুজায়। কেননা এই রাতে বান্দার ব্যাপারে আল্লাহর হিকমতপূর্ণ নির্দেশ তথা বান্দার ভাল-মন্দ নির্ধারিত হয়।

*শবে বরাতের হাদিস সমূহঃ

#দলিলঃ عن قاسم بن محمد عن ابه او عمه عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ينزل الله*جل ثناؤه ليلة النصف من شعبان الى السماء الدنيا فيغفر لكلنفس الا انسان فى ليلة شحناء او مشركا بالله *অর্থঃ কাসেম ইবনে মুহাম্মদ তাঁর পিতা বা চাচা হতে দাদার সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসূলে করিম ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম বলেছেন: আল্লাহ তা'লা মধ্য শাবানের

রজনীতে প্রথম আসমানে নেমে আসেন এবং সকল মানুষকে ক্ষমা করে দেন, তবে মুশরীক ও অহংকার পূর্ণ ব্যক্তি ব্যাতিত (ইবনে জানযুইয়া, মুসনাদে বায্যার, তাফছিরে মায়ালেমু তানজিল, ৫ম খন্ড, ৬৭ পৃ:; দারে কুতনী; বায়হাক্বী শুয়াইবুল ঈমান, ৩য় খন্ড, ১৪০৩ পৃ:; গুনিয়াতুত্তালেবিন; তাফছিরে দূর্রে মানছুর, ৫ম খন্ড, ৭৬৫ পৃ:)। এই হাদিসের সনদ হাছান-সহি।

*যেহেতু এই রাতে আল্লাহ তাঁর বান্দাকে ক্ষমা করেন, সেহেতু এই রাত জেগে নফল বন্দেগী ও তাওবা ইস্তেগফার করাই উচিৎ।

#দলিলঃ قال عكرمة هى ليلة النصف من شعبان يبرم فيها امر السنة وينسخ الاحياء من الاموات ويكتب الحج فلا يزاد فيهم احد الا ينقص منهم احد *অর্থঃ হজরত ইকরিমা (রাঃ) বর্ণনা করেন: মধ্য শাবানের রাতে বছরের যাবতীয় বিষয় চূরান্ত করা হয় এবং মৃতদের থেকে জীবিতদের পৃথক করা হয়। ফলে তাদের মধ্যে একজনও কম-বেশী হয়না (তাফছিরে মাজহারী, ৮ম খন্ড, ৩০৫ পৃ:; তাফছিরে মারেফুল কোরআন, তাফছিরে কুরতুবী, ১৬ তম খন্ড, ১০০ পৃ:; তাফছিরে রুহুল মায়ানী, ২৫ খন্ড, ১৫২ পৃ:; তাফছিরে তাবারী, ইবনে আবী হাতেম, ইবনে মুনজির)।

#দলিলঃ عن عبد الله بن عمرو بن العاص ان رسول الله (ص) قال: يطلع الله تعالى الى خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لعباده الا اثنين: مشاحن و قاتل نفس *অর্থঃ হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আছ (রাঃ) বলেন: রাসূল পাক (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) বলেছেন: শাবানের মধ্য রাতে আল্লাহ তা'লা তাঁর সৃষ্টির প্রতি (ভাগ্য) উদিত করেন, অতঃপর ক্ষমা করেদেন সকল বান্দাকে, তবে দুই শ্রেণী ব্যতিত তারা হল: বিদ্বেষপূর্ণ ব্যক্তি ও মানুষ হত্যাকারী (তাফছিরে রুহুল মায়ানী, ২৫ তম খন্ড, মুসনাদে আহমদ, ১৭৬/২, হা: নং ৬৬৪২) ঈমাম আহমদ এই হাদিসকে সহি বলেছেন।

#দলিলঃ يقطع الاجال من شعبان الى شعبان حتى ان الرجل لينكح و يولدله و لقد خرج اسمه فى الموتى *ঈমাম বাগবী (রঃ) মুহাম্মদ ইবনে মায়সারা সূত্রে বর্ণনা করেন: এক শাবান থেকে অন্য শাবান পর্যন্ত সকলের আয়ু সম্পর্কে ফায়সালা করা হয়। ফলে একজন লোক বিবাহ করেছে, কি তার সন্তান জন্ম লাভ করেছে, অথচ মৃতদের মধ্যে তার নাম চলে এসেছে (তাফছিরে মাজহারী, ৮ম খন্ড, ৩০৫ পৃ:; ঈমাম বাগবী (রঃ) তাঁর 'শরহে সুন্নাহ' কিতাবে সনদ সহ, তাফছিরে কুরতুবী, ১৬ তম খন্ড, ১০০ পৃ:; তাফছিরে খাজেন, ৪র্থ খন্ড, ১১৬ পৃ:; বাহরে মুহিত; বায়হাক্বী শুয়াইবুল ঈমান, ৩য় খন্ড; তাফছিরে দূর্রে মানছুর, ৫ম খন্ড, ৭৬৫ পৃ:)।

#দলিলঃ عن عائشة (رض) عن النبى صلى الله عليه وسلم قال هل تدرين ما فى هذه اللسلة يعنى ليلة النصف من شعبان؟ قالت ما فيها يا رسول الله !فقال فيها ان يكتب كل مولد من بنى ادم فى هذه السنة و فيها

ان يكتب كل هالك من بنى ادم فى هذه السنة و فيها ترفع اعمالكم ز فيها تنزل ارزاقهم *অর্থঃ হজরাত আয়েশা (রাঃ) বলেন, একদা আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম তাঁকে বললেন, তুমি কি জান এই রাতে অর্থাৎ শবে বরাতে কি হয়? আয়েশা (রাঃ) বললেন কি হয় ইয়া রাসূলাল্লাহ? নবীজি ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম বললেন: এ রাতে নির্ধারিত হয় এই বৎসরে যত সন্তান জন্মিবে, যত মানুষ মারা যাবে, উঠানো হয় মানুষের আমল, সময় ও রিজিক সমূহ তাদেরকে অবতীর্ণ করা হয় (বায়হাক্বী শুয়াইবুল ঈমান, ৩য় খন্ড, ১৪০২ পৃ:;, মেসকাত, ১১৫ পৃ:; মেরকাত, আশিয়াতুল লুমআত শরহে মেসকাত, বাহরে মুহিত; জামে তিরমিজি শরিফ, ১ম জি: ১৫৬ পৃ:; ইবনে আবী শায়বাহ; তাফছিরে রুহুল মায়ানী, ২৫ তম খন্ড, ১৫২ পৃ:; তাফছিরে দূর্রে মানছুর, ৫ম খন্ড, ৭৬৫ পৃ:)।

#দলিলঃ عن ابن عمر (رض) قال خمس ليال لاترد فيهن الدعاء ليلة الجمعة واول ليلة من رجب وليلة نصف من شعبان وليلتى العيدين *অর্থঃ হজরত ইবনে উমর (রাঃ) বলেন: পাঁচটি রাতে দোয়া ফেরত আসেনা (অবশ্যই কবুল হয়) জুমআর রাত, রজবের প্রথম রাত, শাবানের মধ্য রাত ও দুই ঈদের দুই রাত (মুছান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক, ৪র্থ খন্ড, ২৪৬ পৃ:; গুনিয়াতুত্তালেবীন, ঈমাম আব্দুর রাজ্জাক (রঃ) এর সনদটি সহি)।

#দলিলঃ ان اجر ليلة النصف من شعبان مثل اجر ليلة القدر *অর্থঃ নিশ্চয় শাবানের মধ্য রাতের প্রতিদান, কদরের রাতের প্রতিদানের মত (মুছান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক, ৪র্থ খন্ড, ২৪৬ পৃ:) এই হাদিসের সনদ সহি।

#দলিলঃ হজরাত আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলে করিম ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম বলেছেন: শাবানের মধ্য রাতে জন্ম, মৃত্যু, জিবীকা ও মানুষের আমল আসমানে উঠানো হয় {গুনিয়াতুত্তালেবীন, কৃত: গাউছে পাক আব্দুল কাদের জিলানী (রাঃ)}

#দলিলঃ عن عثمان بن محمد بن المغيرة بن الاخنس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتع الاجال من شعبان الى شعبان حتى ان الرجل لينكح ويولد له وقد اخرج في الموتى *অর্থঃ উসমান ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মুগিরা ইবনে আখনাছ (রাঃ) বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম বলেছেন: এক শাবান হতে অন্য শাবান পর্যন্ত ভাগ্য বন্টন করা হয়। এমনকি অমুক ব্যক্তি বিবাহ করিবে ও সন্তান জন্ম লাভ করিবে ও মৃত ব্যক্তিদের তালিকা লিখিত হয় (তাফছিরে ইবনে কাছির, ৪র্থ খন্ড, ১৬৩ পৃ:; তাফছিরে দূর্রে মানছুর, ৫ম খন্ড, ৭৬৪ পৃ: হাদিসটি মুরছাল হিসেবে সহি)।

*যেহেতু এই রাতে ভাগ্য বন্টিত হয় সেহেতু এই রাতকে ভাগ্য রজনী বলে।

عن ابی موسی الاشعری عن الرسول صلی الله علیه وسلم
#দলিলঃ قال ان الله تعالی لیطاع فی لیلة النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقه الا
المشرکین و المشاحن *অর্থঃ হজরত আবু মুছা আশআরী (রাঃ) নবী করিম
ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম হতে বর্ণনা করেন, নবী করিম ছাল্লাল্লাহু
আলায়হি ওয়া ছাল্লাম বলেছেন: নিশ্চয় আল্লাহ শাবান মাসের মধ্যবর্তী রাতে
১ম আসমানে অবর্তীর্ণ হন এবং মাফ করে দেন সকল সৃষ্টিকে মুশরীক ও
বিদ্ধেষভাবাপন্ন লোক ব্যতিত (ইবনে মাজাহ, ৯৯ পৃ:; মেসকাত, ১১৫ পৃ:;
মেরকাত, ৩য় খন্ড, ৩৪৮ পৃ:; আশিয়াতুল লুমআত; মুছান্নাফে আব্দুর
রাজ্জাক, ৪র্থ খন্ড, ২৪৫ পৃ:; তাফছিরে দূর্রে মানছুর, ৫ম খন্ড, ৭৬৬ পৃ:)
সনদ সহি।

#দলিলঃ একদা আয়েশা (রাঃ) বিছানায় নবীজিকে না পেয়ে পরে
জান্নাতুল বাকীতে পেলেন এবং তিনি কবর যেয়ারত করছেন। অতঃপর নবী
ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম বলেছেনঃ فقال ان الله تعالی ینزل لیلة
النصف من شعبان الی السماء الدنیاء فیغفر لاکثر من عدد شعر غنم کلب
*অর্থঃ নিশ্চয় আল্লাহ শাবানের মধ্যরাত্রে অবর্তীর্ণ হন এবং বনী কালব
গোত্রের ছাগলের পশমের সমান সংখ্যক লোককে ক্ষমা করে দেন (তিরমিজি,
১ম জি: ১৫৬ পৃ:; ইবনে মাজাহ, ৯৯ পৃ:; মেসকাত, ১১৫ পৃ:; মুসনাদে
আহমদ, ২/২৩৮৯ নং; তাফছিরে কুরতুবী, ১৬ তম খন্ড, ১০১ পৃ:; আব্দুল্লাহ
ইবনে হুমাইদ তাঁর কিতাবে হাদিসটি উল্লেখ করেছেন ১৫০৯ নং; মেরকাত,
৩য় খন্ড, ৩৪৬ পৃ:; তাফছিরে কবির, ২৭ তম খন্ড, ২১১ পৃ:; আশিয়াতুল
লুমআত, তাফছিরে খাজেন, ৪র্থ খন্ড, ১১৬ পৃ:; তাফছিরে রুহুল মায়ানী, ২৫
তম খন্ড, ১৫১ পৃ:; তাফছিরে দূর্রে মানছুর, ৫ম খন্ড, ৭৬৫ পৃ:)।

*যেহেতু নবীজি শাবানের মধ্য রাত তথা শবে বরাতে কবর যিয়ারত
করেছেন সেহেতু শবে বরাতে কবর যিয়ারত করা সুন্নাত। হাদিসটি ঈমাম
বুখারী (রঃ) এর দৃষ্টিতে দ্বায়িফ হলেও সকল মোহাদ্দেছিনে কেরামের নিকট
দ্বায়িফ নয়। কারন ঈমাম তিরমিজি হাদিসটি উল্লেখ করে কোন মন্তব্য
করেননি শুধু ঈমাম বুখারীর মতটি উল্লেখ করেছেন। এছাড়াও দ্বায়িফ
হাদিসের উপর আমল করা জায়েয।

#দলিলঃ হজরত আলী (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলায়হি
ওয়া ছাল্লাম বলেছেন: মহান আল্লাহ মধ্য শাবানে অবর্তীর্ণ হন মুশরীক ও
বিদ্ধেষভাবাপন্ন লোক ব্যতিত সবাইকে ক্ষমা করে দেন (গুনিয়াতুত্তালেবীন,
কৃত: হুজুর গাউছে পাক আব্দুল কাদের জিলানী (রাঃ))।

#দলিলঃ من احیا لیلتی العیدین و لیلة النصف من شعبان لم یموت قلبه
یوم تموت القلوب *যে শাবানেরে মধ্য রাতে ও দু'ঈদের রাতে জাগ্রত

থাকবে, ক্বাল্ব মৃত্যুর দিনে তার ক্বাল্ব মরবে না (জামেউল মাসানেদেউ ওয়াছ
সুনান, ১০ম খন্ড, ২৯১৮ পৃ:; মুসনাদে আবু নুয়াইম)।

#দলিলঃ হজরাত আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি নবী করিম ছাল্লাল্লাহু
আলায়হি ওয়া ছাল্লাম কে বলতে শুনেছি প্রতি বৎসরে বান্দার জন্য চার দিন
রহমতের দরজা খুলে দেওয়া হয়, ইহা হল দুই ঈদের দুই রাত, শাবানের
মধ্য রাত ও আরাফার রাত (মাদারেজুন্নবুয়ত, কৃত: শেখ আব্দুল হক্ব
মোহাদ্দেছে দেহলভী (রঃ); গুনিয়াতুত্তালেবীন)।

*সুতরাং শাবানে মধ্য রাতে রহমতের প্রত্যাশী হয়ে রাত জেগে ইবাদত
করা ভাল, যেহেতু এই রাতে রহমতের দরজা খোলে দেওয়া হয়।

#দলিলঃ হজরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূল পাক ছাল্লাল্লাহু
আলায়হি ওয়া ছাল্লাম বলেছেন: শাবানের মধ্য রাতে জিব্রাইল এসে বললেন:
ওহে নবী আজ আপনার মাথা উপরে উঠান, কেননা আজ বরকতের রাত।
আমি জিজ্ঞাসা করলাম: কেমন বরকত? জিব্রাইল বললেন এই রাতে আল্লাহ
৩০০ রহমতের দরজা খোলে দেন (গুনিয়াতুত্তালেবীন)।

*এই হাদিসে বলা হয়েছে শাবানের মধ্য রাত বরকতের, আর 'বরকতের
রাত' এই শব্দটিকে ফারসীতে বলা হয় শবে বরাত।

عن علی بن ابی طالب (رض) قال قال رسول الله صلی الله
#দলিলঃ علیه وسلم اذا کانت لیلة النصف من شعبان فقوموا لیلها و صوموا نهارها
فان الله تعالی ینزل فیها لغرب الشمس الی السماء الدنیاء فیقول الا من
مستغفر فاغفرله الا من مسترزق فارزقه...الا کذا الاکذا حتی یطلع الفجر
*অর্থঃ হজরত আলী ইবনে আবী তালেব (রাঃ) বর্ণনা করেন, হজরত রাসূলে
করিম ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম বলেছেন: যখন শাবানের মধ্য রাত
তথা শবে বরাত আসবে তখন তোমরা দিনের বেলায় রোজা রাখ ও রাতে
নফল বন্দেগী কর, কেননা আল্লাহ তালা এই রাতে পৃথিবীর নিকটতম
আসমানে অবর্তীর্ণ হন এবং বলতে থাকেন তোমরা কে আছ ক্ষমা প্রার্থী আমি
তোমাদের ক্ষমা করব, কে আছ রিজিক প্রার্থী আমি তোমাদের রিজিক
দিব...এমনিভাবে ফজরের পূর্ব পর্যন্ত ডাকতে থাকেন (ইবনে মাজাহ শরিফ,
৯৯ পৃ:; মেসকাত শরিফ, ১১৪পৃ:; মেরকাত শরহে মেসকাত, ৩য় খন্ড, ৩৪৯
পৃ:; আশিয়াতুল লুমআত, তাফছিরে কুরতুবী, ১৬ তম খন্ড, ১০১ পৃ:;
বায়হাক্বী শুয়াইবুল ঈমান, ৩য় খন্ড, ১৪০২ পৃ:; তাফছিরে দূর্রে মানছুর, ৫ম
খন্ড, ৭৬৫ পৃ:; মাদারেজুন্নবুয়াত)।

*সুতরাং শবে বরাতের রাতে নফল বন্দেগী করা ও দিনে রোজা রাখা
সয়ং নবীজির নির্দেশ। আফছোছ! একদল লোক এই হাদিসটিকে শবে
বরাতের প্রতি বিদ্বেষ বশত জাল হাদিস বলে থাকে, কিন্তু তাদের জানা নেই
যে, এই হাদিসটি ছিহা ছিত্তার কিতাবের। ছিহা ছিত্তার মধ্যে কোন জাল

হাদিস নেই, কারন ছিহা ছিত্তা অর্থই হল 'ছয়টি সহি কিতাব'। হ্যাঁ আলিমগণের কিয়দাংশ এই হাদিসটিকে দ্বাইফ বলেছেন, কিন্তু কেউ জাল বলেননি। হাদিসটি দ্বাইফ হলেও এর উপর আমল করা জায়েয, কারন দ্বাউফ হাদিসের উপর আমল করা মুস্তাহাব। এ ছাড়াও ভারত উপ-মহাদেশে যিনি সর্ব প্রথম জাহাজ ভরে কিতাব এনেছেন সেই আল্লামা শেখ আব্দুল হক মোহাদ্দেছে দেহলভী (রঃ) এই হাদিসটিকে সহি বলেছেন।

#দলিলঃ ঈমাম ইছবাহানী (রঃ) মুয়াজ বিন জাবাল (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, নবী করিম (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) বলেছেন: যে পাঁচ রাতে রাত জাগরণ করেবে তাঁর জন্যে জান্নাত ওয়াজিব। রাতগুলো: জিলহজ্ব এর ৮,৯ ও ১০ তারিখের রাত্রি, ঈদুল ফিতরের রাত এবং শাবানের মধ্য রাত অর্থাৎ শবে বরাত (বাহারে শরিয়াত, ৪র্থ খন্ড, ১৪০ পৃ:)।

*হুজুর গাউছে পাক আব্দুল কাদের জিলানী (রাঃ) তাঁর কিতাবে একটি হাদিস উল্লেখ করেন যে, মা আয়েশা (রাঃ) বলেন নবীজি ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম শবে বরাতের রাতে এত নফল নামাজ পড়তেন যে নবীজির পা মোবারক ফুলে যাইত (গুনিয়া তুত্তালেবীন)। সুতরাং শবে বরাতে নফল নামাজ পড়া সুন্নাত।

***ফকিহ্ গণের ভাষ্যঃ**

*হুজুর গাউছে পাক আব্দুল কাদের জিলানী (রাঃ) বলেন: শবে বারাতে নফল বন্দেগী করা মুস্তাহাব (গুনিয়াতুত্তালেবীন)।

*আল্লামা শেখ আব্দুল হক্ব মোহাদ্দেছ দেহলভী (রঃ) বলেন: শবে বারাতে ইবাদত করা ও দিনে রোজা রাখা সহি হাদিস দ্বারা প্রমানিত (মাদারে জুন্নবুয়ত)।

*আল্লামা আমজাদ আলী আজমী (রঃ) বলেন: শাবানের ১৫ তারিখ রাত্রে ইবাদত করা মুস্তাহাব (বাহারে শরিয়ত)।

*তাবেঈ গণের ভিতর হজরত খালিদ বিন মাদান (রঃ), নুমান বিন আমির (রঃ), হজরত হাছান বছরী (রঃ), হজরত মাকহুল (রঃ) ও ঈমাম আবু হানিফা (রাঃ) প্রমূখ শবে বারাতের রাত্রে মসজিদে অবস্থান করতেন ও বেশী বেশী ইবাদত করতেন এবং ভাল কাপড় পরিধান করিতেন (মাদারে জুন্নবুয়ত)।

***ছওয়াল-জবাবঃ**

***ছওয়ালঃ শবে বারাত কি?**

*জবাবঃ পূর্বেই আমরা উল্লেখ করেছি যে 'শবে বারাত' শব্দটি ফারসী শব্দ, যাকে আরবীতে লাইলাতুল মোবারাকা ও লাইলাতুল বারাত বলা হয়। কারন 'শবে বারাতের' একটি নাম রয়েছে তা হল 'লাইলাতুল বারাত'।

অর্থাৎ, শাবান মাসের মধ্য রাত্রিকে লাইলাতুল বারাত বা শবে বারাত বলা হয়, যা বিভিন্ন তাফছির কিতাবে'ই রয়েছে।

'শব' অর্থ রাত্র, যাকে আরবীতে 'লাইলুন' বলা হয়।

'বারাত' অর্থ কল্যাণময় বা বরকতময়, যাকে আরবীতে 'মোবারাকা' বা 'বারাত' বলা হয়।

*সুতরাং শবে বারাত বা লাইলাতুল বারাত অর্থ কল্যানের বা বরকতের রজনী। শবে বারাত ও লাইলাতুল বারাত একই কথা, শুধু ভাষার ব্যাবধান। শাবান মাসের মধ্য রাতকেই 'শবে বরাত' বা 'লাইলাতুল বরাত' বলা হয়। হাদিস দ্বারা প্রমানিত এই রাতে মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন-পরিবর্ধন করা হয়, তাই এই রাতকে ভাগ্য রজনীও বলা হয়।

#ছওয়ালঃ মানুষের তাকদির পৃথিবী সৃষ্টির ৫০'০০০ বছর পূর্বেই লিপিবদ্ধ করা হয়ে গেছে, তাহলে শবে বরাতে আবার কোন তাকদির লিখা হয়?

#জবাবঃ এর ২ টি জবাবঃ *১.মানুষের তাকদির পৃথিবী সৃষ্টির ৫০'০০০ বছর পূর্বে লিখা হয়েছে সত্য, তবে ইহা দ্বায়িত্বশীল ফেরেস্তাদের হাঁতে দেওয়া হয়েছে কি-না তা উল্লেখ করা হয়নি। শবে বরাতে মহান আল্লাহ ঐ ১ বৎসরের তক্দির আলাদা করেন অতঃপর কদরের রাতে দ্বায়িত্বশীল ফেরেস্তাদের কাছে সোপর্দ করেন।

*২.হাদিস শরিফে উল্লেখ আছে যে, لا يرد التقدير الا الدعاء *অর্থঃ তক্দির পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হয়না তবে দোয়া দ্বারা হয় (আবু দাউদ)। আমরা সারা বৎসর যে সকল দোয়া বা আরজি পেশ করি এবং শবে বরাতের রাতের দোয়া ও ইস্তেগফারের খাতিরে আমাদের তকদির বাড়ানো-কমানো হয়, যেহেতু শবে বরাতের রাতে রহমতের দরজা খোলা থাকে। আর ঐ বাজেট প্রাথমিক ভাবে ঘোষনা হয় শবে বরাতের রাতে, শবে কদরে ইহা ফেরেস্তাদের কাছে সমর্পন করা হয়।

*যদি শবে বরাতে ও শবে কদরে বান্দার হায়াত মউত, রিজিক, ধণ-দৌলত, ইত্যাদি লিখার ব্যাপারে প্রশ্ন তুলেন, তাহলে বলব ৫০'০০০ বছর পূর্বে তক্দির লিখার হয় এটা যেমন হাদিস, শবে বরাতে ও শবে কদরে তক্দির পেশ করা হয় এ গুলোও হাদিস। বলুন কোন গুলো মানবেন আর কোন গুলো বাদ দিবেন? এ জন্যই মহান আল্লাহ শবে বরাতে বা শবে কদরে তক্দির স্থিরকৃতের ব্যাপারে বলেনঃ فيها يفرق كل امر حكيم *অর্থঃ আর ইহাতেই (শবে বরাতে ও কদরে) স্থির করা হয় প্রজ্ঞা সম্পন্ন নির্দেশ (সূরা দূখান, ৪)।

*পবিত্র কোরআন বলছে কদর ও বরাতে তকদির নির্ধারিত হয়, তাহলে কি কোরআনকে অস্বীকার করা যাবে? (নাউজুবিল্লাহ)

#ছওয়ালঃ শবে বরাতের ব্যাপারে বর্ণিত হাদিস গুলো দ্বায়িফ।

#জবাবঃ সেই পুরুনো বাসি প্রলাপ! আমি পূর্বে অনেক গুলো হাদিস উল্লেখ করেছি যার মধ্যে অনেক গুলো সহি হাদিসও রয়েছে। যদি সব গুলো

হাদিস দ্বায়িফও হয় তদাপিও এর উপর আমল করা যাবে, কারন ফাজায়েলের ক্ষেত্রে দ্বায়িফ হাদিসের সনদের উপর আমল করা মুস্তাহাব। (এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে হলে অঙ্গুলি চুম্বনের অধ্যায় দেখুন) উসূলে হাদিসের আইন হল যদি একই ব্যাপারে কয়েকটি দ্বায়িফ সনদ বর্ণিত হয় তাহলে সব গুলো সনদ মিলে ক্বাবী বা শক্তিশালী হয়ে যায়। আর শবে বরাতের ব্যাপারে ৯ জন সাহাবী থেকে হাদিস বর্ণিত আছে। বলুন! এতগুলো রেওয়াত কি মিলে ক্বাবী বা শক্তিশালী হয়না? ঈমামে আজম আবু হানিফা (রাঃ) বলেছেনঃ ضيف الحديث اولى من القياس *অর্থঃ দ্বায়িফ হাদিস ক্বেয়াস থেকে উত্তম (ফতুয়ায়ে শামী; এলাউছ ছুনান)।

*ইসলামী শরিয়াতের দৃষ্টিতেঃ
কদমবুছি

*আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের দৃষ্টিতে কদমবুছি একটি গুরুত্বপূর্ণ আমল। 'কদম' অর্থ পা; আর 'বুছি' ফারছি শব্দ যার অর্থ 'চুম্বন করা'। অর্থাৎ 'কদম বুছি' অর্থ পায়ে চুম্বন করা। মা-বাবা, আপন মোর্শেদ কিংবা ঐ রকম সম্মানী ব্যক্তির পায়ে সম্মানার্থে চুম্বন করাকে 'কদম বুছি' বলা হয়। কদম বুছি সর্ব সাধারণের জন্যে প্রযোজ্য নয়, বরং বিশেষ সম্মানী ব্যক্তিগেণের জন্যেই প্রযোজ্য। এ ব্যাপারে পবিত্র হাদিস শরিফে উল্লেখ আছেঃ-

#দলিলঃ عن زارع وكان فى وفد عبد القيس قال لما قدمنا المدينة فجعلنا نتبادر من رواحلنا فنقل يد رسول الله صلى الله عليه وسلم و رجليه *অর্থঃ হজরত জারে (রাঃ) বলেন, তিনি ছিলেন আব্দুল কায়েস গোত্রের প্রতিনিধি। তিনি বলেন: আমরা যখন মদিনায় পৌছিলাম দ্রুত ছাওয়ারী থেকে অবতরন করলাম অতঃপর প্রিয় নবীজি (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) এর হাঁত ও পাঁ মোবারক চুম্বন করলাম (আবুদাউদ শরিফ, ৭০৯ পৃঃ; মেসকাত শরিফ, ৪০২ পৃঃ, মেরকাত, ৮ম খন্ড, ৫০৩ পৃঃ; আশিয়াতুল লুমআত)।

*এই হাদিস দ্বারা প্রমান হয় সয়ং সাহাবীগণ কদম বুছি করছেন।

#দলিলঃ عن صفوان بن عسال ان قوما من اليهود قبلوا يد النبى صلى الله عليه وسلم ورجليه *অর্থঃ হজরত সাফওয়ান ইবনে আস্সান (রাঃ) বর্ণনা করেন, একদল লোক এসে রাসূল (ছাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) এর হাঁত ও পাঁ মোবারক চুম্বন করলেন (ইবনে মাজাহ শরিফ, ২৬৩ পৃঃ)।

*এই হাদিস দ্বারাও প্রমান হয় লোকেরা রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) এর কদম বুছি করতেন।

#দলিলঃ قدمنا فقيل ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخذنا بيده و رجليه فقبلها *অর্থঃ হজরত ওয়াজে ইবনে আমের (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমরা মদিনায় প্রবেশ করলাম আমাদেরকে বলা হল ইনি আল্লাহর রাসূল

(ছাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়া ছাল্লাম)। অতঃপর আমরা তাঁর হাঁত ও পাঁ মোবারক জড়িয়ে ধরলাম এবং উভয় চুম্বন করলাম (ঈমাম বুখারী কৃত: 'আল আদাবুল মুফরাদ': ৪৩৭ পৃ:)।

*এই হাদিস দ্বারাও প্রমান হয় সাহাবীগণ নবীজির কদম বুছি করতেন।

#দলিলঃ একদা এক ইহুদি নবীজিকে বললেন আমাকে একটি মোজেজা দেখান, নবীজি (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) বললেন ঐ বড় গাছটির নিকট গিয়ে বল আমি ডাকছি। সে তাই করল, অতঃপর ঐ গাছটি ডানে-বামে, সামনে-পিছনে ঝুকে পরলেন ফলে শিকর ভেঙ্গে গেল উড়ে এসে নবীজির সামনে দাড়ালেন এবং সালাম দিলেন " فقالت السلام عليك يا رسول الله" ইহুদী বললেন আদেশ করুন যাতে গাছটি আগের জায়গায় গিয়ে বসে। فقال الاعرابى اءذن لى اسجد لك قال لو امرت احدا ان يسجد لاحد لامرت المراة ان يسجد لزوجها *অতঃপর ইহুদী বললেন আমাকে আদেশ করুন আপনাকে সেজদা করি। নবীজি বললেন আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে সেজদা করার অনুমতি থাকলে আমি প্রত্যেক স্ত্রীকে তার স্বামীকে সেজদা করার অনুমতি দিতাম। قال فاذن لى ان اقبل يديك ورجليك فاذن له *অতঃপর লোকটি বলল তাহলে আমাকে অনুমতি দিন যেন আপনার হাঁত ও পাঁ মোবারক চুম্বন করি. فاذن له নবীজি তাকে অনুমতি দিলেন (মাদারেজুন্নবুয়ত, শিফা শরিফ)।

*এই হাদিস দ্বারাও প্রমান হয় নব্য মুসলীম সাহাবীগণ প্রিয় নবীজির কদম বুছি করতেন।

#দলিলঃ عن صهيب رضى الله عنه قال رايت عليا يقبل يدا العباس و رجليه *অর্থঃ হজরত ছুহাইব (রাঃ) বলেন, আমি হজরত আলী (রাঃ) কে দেখলাম তিনি হজরত আব্বাস (রাঃ) এর হাঁত ও পাঁ চুম্বন করলেন (ঈমাম বুখারী কৃত: 'আল আদাবুল মুফরাদ' ৪৩৭ পৃ:, ফতহুল বারী ১১তম খন্ড, ৫৭ পৃ:)।

*এই হাদিস দ্বারাও স্পষ্ট প্রমান হয় কদম বুছি শুধু নবীজির জন্য সতন্ত্র নয়, বরং সাহাবীগণ অন্য সাহাবীদেরকে কদম বুছি করতেন।

#দলিলঃ غضب رسول الله يوما من الايام فقال خطينا فقال سلونى ... فقام اليه رجل ... يقال له عبد الله بن حذافة فقال يا رسول الله من ابى قال ابوك فلان (حذيفة) فقام اليه عمر فقبل رجله وقال يا رسول الله رضعنا بالله ربا وبك نبيا وبالاسلام دينا وبالقران اماما... অর্থঃ একদা নবীজি (ছাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) রাগান্বিত অবস্থায় মিম্বরে দাড়ালেন এবং বললেন আমাকে প্রশ্ন কর, প্রশ্ন কর? একজন বললেন: পরকালে আমার স্থান কোথায়? নবীজি বললেন: জাহান্নামে। আব্দুল্লাহ দাড়ালেন এবং বললেন আমার পিতা কে? নবীজি বললেন তোমার পিতা 'হুজায়ফা (রাঃ)'। فقالم اليه

عمر فقبّل رجله *অতঃপর হজরত উমর (রাঃ) হাটু গেরে বসলেন এবং পদচুম্বন করে বললেন, আমরা রব হিসেবে আল্লাহকে, নবী হিসেবে হুজুরকে, বিধান হিসেবে কুরআনকে ও ধর্ম হিসেবে ইসলাম পেয়ে খুশি আছি, আমাদের ক্ষমা করুন (তাফছিরে তাবারী শরিফ, ৭ম খন্ড, ৮৯ পৃঃ)।

*এই হাদিস দ্বারা প্রমান হয় ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হজরত উমর (রাঃ) কদম বুছির পক্ষে ছিলেন।

*উল্লেখিত দলিল গুলো দ্বারা প্রমান হয়ে গেল সাহাবীগণ বিভিন্ন সময় প্রিয় নবীজির কদমবুছি করেছেন। যা মোট ৬ জন সাহাবী থেকে বর্ণনা পাওয়া যায়। সুতরাং কদমবুছি আমলটি তাওয়াতুর পর্যায়ের বা অকাট্য।

ফকিহ ও মুজতাহিদগণের ভাষ্য

* মুসলীম শরিফের ব্যাখ্যাকার আল্লামা ঈমাম নববী (রঃ) বলেনঃ اذا اراد تقبيل يد غيره ان كان ذلك لزهده وصلاحه او علمه او شرفه وصيانته او نحو ذلك من الامور الدينية لم يكن بل يستحب *অর্থঃ যদি কারো পরহেজগারী, যোহদতা, ঈলিম, ভদ্রতা ও সত্যবাদিতা বা দ্বীনি কাজ করতে দেখে তার হস্ত ও পদ চুম্বন করে তবে মাকরুহ হবেনা বরং মুস্তাহাব (আল আজকার, ২২৪ পৃঃ, মেসকাত শরিফ, ৪০২ পৃঃ হাশিয়া)।

* আল্লামা শিহাবুদ্দিন খুফ্ফাজী (রঃ) বর্ণনা করেনঃ (فاذن له) فى تقبيل يديه ورجليه فقبلهما وفيه دليل على جواز تقبيل اليد و الرجل عن الفاضل المفضول اذا كان لزهده وصلاحة او علمه و شرفه وليس بمكروه بل يستحب *অর্থঃ রাসূল (ছালাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) ইহুদীকে কদমবুছি করার অনুমতি দিয়েছিলেন। ইহুদী নবীজির পদচুম্বন করেছিলেন। এই হাদিস দ্বারা সম্মানি ব্যক্তির পদচুম্বন জায়েজ বলে প্রমানিত হয়। যদি এই চুম্বন লোকের যোহদতা, ভদ্রতা, ইলিম, পরহেজগারীর জন্য করা হয় তাহলে মাকরুহ নয় বরং মুস্তাহাব (নাছিমুর রিয়াদ্ব, ৩য় খন্ড, ৪৮ পৃঃ)।

* মাওলানা আশরাফ আলি থানভী সাহেবের পীর ভাই এবং মৌলভী ইলিয়াস দেওবন্দির পীর, মাওলানা রশিদ আহমদ গাংগুহী বলেনঃ দ্বীনদার বুজুর্গের সম্মানে দাড়ানোও জায়েজ এবং তাদের পদচুম্বন করাও জায়েজ (ফতুয়ায়ে রশিদিয়া, ১ম খন্ড, ৫৪ পৃঃ)।

*মন্তব্যঃ রশিদ আহমদ গাংগুহী দেওবন্দের শায়েখ ছিলেন।।

*উদাহরণ স্বরূপ এই দলিল গুলো উল্লেখ করলাম। সুতরাং, কদমবুছি মুস্তাহাব এতে আর কোন সন্দেহ নেই।

***কিছু প্রশ্নের জবাবঃ-**

*প্রশ্ন ঃ কদমবুছি করতে গেলে মাথা নত হয়ে যায় যা সেজদার মত, আর সেজদা হারাম ও শিরিক?

*উত্তর ঃ- মাথা নত হলেই সেজদা হয়না বরং সেজদার জন্য শর্ত হল ৮টি অঙ্গ জমীনে লাগতে হবে যথাঃ দুই হাতের তালু, দুই হাটু, দুই পায়ের আঙ্গুল, নাক-কপাল। এর যেকোন একটি অঙ্গ বাদ পরলে সেজদা পরিপূর্ণ হবেনা। আর কদমবুছির সময়'ত এরকম হয়না। তাহলে কদমবুছি সেজদা হল কিভাবে?

আর মাথা নত হলেই শিরিক হয়না, কারণঃ انما العمل بالنية *সকল আমল নিয়তের উপর নির্ভরশীল (বুখারী শরিফ ১ম খন্ড, ২ পৃঃ; নাসাঈ শরিফ, ১ম জিঃ)।

*যদি মাথা নত করার সময় নিয়ত থাকে যে 'আল্লাহ', কিংবা 'আল্লাহর মত' তাহলে শিরিক হবে, নচেৎ শিরিক হবেনা।

*সেজদা ব্যাতিত অন্য প্রয়োজনে মাথা নিচু হলেও শিরিক হবেনা। যেমন মানুষ ধান কাটতে গেলেও মাথা নিচু হয়, জমীন থেকে কোন কিছু উপরে উঠাতে হলেও মাথা নিচু হয়।

*নামাজের সময় ঈমামের মাথা নিচু হয় ওয়ালের সামনে, আর মুসল্লিদের মাথা নিচু হয় ঈমাম সাহেবের পিছনে, আর দ্বিতীয় কাতারের লোকজনের মাথা নিচু হয় প্রথম কাতারের পিছনে। বলুন! তাহলে কি ঈমাম সাব ওয়ালকে সেজদা করছে ? আর প্রথম কাতার ঈমাম সাবকে সেজদা করছে? দ্বিতীয় কাতার প্রথম কাতারকে সেজদা করছে?

*সুতরাং, মাথা নত করলেই শিরিক হয়না। ইহা নিয়তের উপর নির্ভশীল। কদমবুছি একটি আমল, আর সেজদা আরেকটি আমল। দুটি এক জিনিস নয়। কদমবুছি যদি শিরিক হইত তাহলে সাহাবীগণ কেন কদমবুছি করলেন, কিংবা নবীজিই কেন নিষেধ করলেন না ? আপনারা কি নবী পাকের ও সাহাবীগণের চেয়ে বেশী বুঝেন? (নাউজুবিল্লাহ) যদি বলেন 'কদমবুছি' হারাম, তাহলে প্রিয় নবীজির সাহাবীগণ কি হারাম কাজ করেছেন? (নাউজুবিল্লাহ)

*এখন আমরা কি নবীর হাদিস মানব, না আপনাদের ফতুয়া মানব?

*প্রশ্নঃ কদমবুছি ইহা নবীজির জন্য স্বতন্ত্র । ইহা অন্যদের জন্য জায়েজ নেই।

*উত্তর ঃ- শেষ পর্যন্ত মানলেন যে কদমবুছি জায়েজ , কিন্তু স্বতন্ত্র বলে আর একটি প্যাচ লাগিয়ে দিলেন। আচ্ছা, কদমবুছি যদি স্বতন্ত্র হয়, তাহলে ইসলামের ৪র্থ খলিফা শেরে খোদা হজরত আলী (রাঃ) যে নবীজির চাচা হজরত আব্বাস (রাঃ) এর কদমবুছি করলেন সেটা কি হবে? কিংবা ফকিহগণ যে ফতুয়া দিয়ে গেলেন কদমবুছি করা মুস্তাহাব, তারই কি হবে?

*আমরাত অনেক হাদিস উল্লেখ করলাম কদমবুছি জায়েজ বলে, আপনারা শুধু হারাম হারাম বলেই গেলেন কোন একটিও হাদিস উল্লেখ করলেন না। এখন আপনারা অন্তত একটি হাদিস উল্লেখ করুন যে কদমবুছি নবীজি নিষেধ করেছেন (সেজদা ও কদমবুছি কিন্তু এক নয়)।

*ইসলামী শরিয়াতের দৃষ্টিতেঃ

*গরু-ছাগল ও উট নজরানা বা হাদিয়াঃ

*আপন মুর্শিদ'কে কিংবা সম্মানিত ব্যক্তিকে গরু-ছাগল ও উট নজরানা দেওয়া জায়েয কি-না, এ নিয়ে অনেক আলোচনা সমালোচনা রয়েছে। নজরানার বস্তু বিভিন্ন রকম হইতে পারে যেমনঃ গরু, ছাগল, ভেড়া, দুম্বা, উট, হাঁস, মোরগ, (হালাল প্রাণী) এবং যে কোন ভাল দ্রব্যাদি এবং অর্থ।

*প্রথমেই আমরা জানব, নজরানার ব্যাপারে মহান আল্লাহ কি বলেন।

#দলিলঃ يا ايها الذين امنوا اذا نجيتم الرسول..... *অর্থাৎ, হে ঈমানদার সকল! তোমরা যদি আমার হাবিবের সাথে একা একা কথা বলতে চাও তাহলে তাঁকে নজরানা পেশ কর.....(সূরা মোজাদেলা, ১১ নং আয়াত)।

* এই আয়াত দ্বারা প্রমানিত হয় যে, নজরানা দেওয়ার নিয়ম সয়ং আল্লাহ শিক্ষা দিয়েছেন। বলুন! আল্লাহ কি ভুল শিক্ষা দিয়েছেন? (নাউজুবিল্লাহ)

*নবীজির সাথে একা একা কথা বলতে হলে নজরানা দেওয়ার সামর্থ্য সকল সাহাবীর নেই, তাই পরবর্তীতে নবীজির প্রতি এই হুকুম রহিত করা হয়েছে, অর্থাৎ, সামর্থ্য না থাকার কারনে পরবর্তীতে নজরানা ছাড়াই কথা বলার হুকুম দিয়েছেন। কিন্তু নজরানার নিয়ম রহিত হয়নি।

*এই আয়াত নাজিল হওয়ার পর সর্ব প্রথম হজরত আলী (রাঃ) নবীজিকে নজরানা দিয়েছিলেন, এবারতটি এরুপঃ عن مجاهد قال نهى عن مناجاة صلى الله عليه وسلم حتى يتصدقوا فلم يناجه الا علي بن ابى طالب قدم دينارا صدقة تصدق به ثم ناجى النبى صلى الله عليه وسلم فساله عن عشر خصال ثم انزلت الرخصة (তাফছিরে কবীর, ইবনে কাছির, ৪র্থ খন্ড, ৩৮৮ পৃ:)।

*সুতরাং নজরানা দেওয়া সয়ং আল্লাহ তা'লার শিক্ষা।

*মুরিদ তার পীরকে উল্লেখিত প্রাণী ও দ্রব্যাদি নজরানা হিসেবেও দিতে পারবে এবং হাদিয়া হিসেবেও দিতে পারবে। কারন হাদিয়া দেওয়া নেওয়া উভয়টিই সুন্নাতে রাসূল। [হাদিয়া হিসেবে যা দেওয়া জায়েয, নজরানা হিসেবেও তা দেওয়া জায়েয] যেমনঃ

#দলিলঃ عن عطاء الخراسانى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تصافحوا يذهب الغل و تهادوا اتحابوا وتذهب الشحناء *অর্থাৎ, হজরত আ'তা খোরসানী (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) বলেছেন তোমরা পরস্পর মোছাফা কর, ইহাতে অন্তরের হিংসা বিদ্বেষ দূর হয়। পরস্পরে হাদিয়া প্রদান কর, ইহাতে ভালবাসা বৃদ্ধি হয় ও বৈরিতা দূরিভূত হয় (মুয়াত্তা ঈমাম মালেক, হা: নং ১৬; মেসকাত শরিফ, ৪০৩ পৃ:; আশিয়াতুল লুমআত; মেরকাত শরহে মেসকাত, ৮ম খন্ড, ৫০৬ পৃ:)।

#দলিলঃ عن عائشة (رض) ان النبى صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية و يثيب عليها *অর্থাৎ, হজরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) হাদিয়া কবুল করতেন ও হাদিয়া দিতেন (সহি বুখারী; আবু দাউদ, ২য় খন্ড, ৪৯৮ পৃ:; তিরমিজি, ২য় খন্ড. ১৬ পৃ:; মেসকাত, ১৬১ পৃ: যাকাত অধ্যায়)।

*ঈমাম তিরমিজি বলেন هذا حديث صحيح *এই হাদিস সহি। এ ব্যাপারে হজরত আবু হুরায়রা (রাঃ), হজরত আনাছ (রাঃ), ইবনে উমর (রাঃ) ও জাবের (রাঃ) থেকেও হাদিস বর্ণিত আছে। সুতরাং হাদিয়া দেওয়া ও নেওয়া উভয়টিই সুন্নাত, কারন নবীজি (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) নিজে হাদিয়া দিতেন এবং হাদিয়া নিতেন। এ ব্যাপারে ৬ জন সাহাবী থেকে হাদিস বর্ণিত আছে।

* প্রিয় নবীজি যা কিছু হাদিয়া দিতেন ও নিতেনঃ-

#দলিলঃ عن انس (رض) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو اهدى الى كراع لقبلت ولو دعيت عليه لاجبت *অর্থাৎ, হজরত আনাছ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) বলেছেন: আমাকে যদি বকরীর পায়ের একটি খুরও হাদিয়া দেওয়া হয় তবুও গ্রহন করব। আর তা আহারের জন্য যদি আমাকে দাওয়াত করা হয় তাতেও আমি সারা দিব (মুয়াত্তায়ে ঈমাম মালেক; সহি বুখারী; তিরমিজি শরিফ, ১ম খন্ড, ২৪৮ পৃ:; মেসকাত, ১৬১ পৃ: যাকাত অধ্যায় হজরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে)।

*এ ব্যাপারে হজরত আলী (রাঃ), মা আয়েশা (রাঃ), মুগীরা ইবনে শুবা (রাঃ), সালমান ফারছী (রাঃ), মুয়াবিয়া ইবনে হায়দা (রাঃ), আব্দুর রহমান ইবনে আলকামা (রাঃ) থেকেও হাদিস বর্ণিত আছে।

**উল্লেখ্য যে, এই হাদিসের দ্বারা প্রমান হয় পীরের বাড়িতে হালাল প্রাণীর গোস্থ খাবার জন্য দাওয়াত দিলে ঐ গোস্থ খাওয়ার জন্য যাওয়া ও খাওয়া উভয়টিই জায়েয। কারন আল্লাহর নবী বলছেন ولو دعيت عليه لاجبت: *আমাকে বকরীর পায়ের খুর খাওয়ার জন্য কেও দাওয়াত দিলে আমি দাওয়াত কবুল করব।

*বর্তমানে কিছু জ্ঞান পাপী বের হয়েছে যারা বলে বেড়ায় পীরের বাড়িতে গরুর গোস্থ খাওয়া হারাম, যদি হারাম হয়, তাহলে পরের বাড়ির মুরগীর রান, গরুর ভূনা খাওয়া জায়েয কিভাবে?

আল্লাহর নামে যবেহ্ কৃত হালাল প্রাণী খাওয়া জায়েয, ইহা পীরের বাড়িতেই হোক আর শশুর বাড়িতেই হোক।

#দলিলঃ عن ابن بريد عن ابيه ان النجاشى اهدى الى النبى صلى الله عليه وسلم خفين اسودين ساذجين فلبسهما *অর্থাৎ, হজরত ইবনে বুরায়দা (রাঃ) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন, বাদশা নাজ্জাসী নবী করিম

(ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) কে এক জোড়া মোজা হাদিয়া দিয়েছেন। নবী (ছাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) ইহা পরিধানও করেছেন (ইবনে মাজাহ, ৫৪৯ নং হা:; তিরমিজি, হা: নং ২৮২০; মেসকাত শরিফ, ৩৮০ পৃ:; মেরকাত, ৮ম খন্ড, ২৬৯ পৃ:: মুসনাদে আহমদ, ৩৫২/৫)।

#দলিলঃ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, সাদ ইবনে জাচ্ছামা (রাঃ) নবী (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) এর জন্য গাদার গোস্থ হাদিয়া পাঠিয়েছিলেন, তখন নবী করিম (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) ইহরাম অবস্থায় ছিলেন। বর্ণনাকারী বলেন: এজন্য তিনি এগুলো ফেরত দিলেন এবং বললেন আমরা যদি মুহরীম না হইতাম তাহলে অবশ্যই তা কবুল করতাম (মুসলীম শরিফ).।

#দলিলঃ হজরত মুয়াজ ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে উসমান তায়মী তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন, আমরা ইহরাম অবস্থায় তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ (রাঃ) এর সঙ্গে ছিলাম, তাঁকে পাখির গোস্থ হাদিয়া দেওয়া হয়েছিল (মুসলীম শরিফ)।

#দলিলঃ عن عائشة (رض) قالت ماغرت على احد من ازواج النبى صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة ومابى ان اكون ادركتها وما ذالك الا لكثرة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لها ان كان ليذبح الشاة فيتبع بها هداءق خديجة فيهديها لهن *অর্থাৎ, হজরাত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন, নবীয়ে পাক (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) এর বিবিগণের মধ্যে খাদিজার মত ঈর্ষা হয়নি। কারন রাসূল (ছাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) তাঁর কথা খুব বলতেন। তিনি কোন বকরী যবাহ্ করলে খাদিজা (রাঃ) এর বান্ধবীদের তালাশ করে তাঁদেরকে ইহা হাদিয়া দিতেন (সহি তিরমিজি, ২য় জি:, ২২ পৃ:)।

** এই দলিল গুলো দ্বারা প্রমানিত হয় যে হাদিয়া হিসেবে গোস্থ দেওয়া ও ইহা খাওয়ার জন্য দাওয়াত দেওয়া উভয়ই জায়েয।

*এখন প্রশ্ন হল বকরী কিংবা হালাল প্রাণীর গোস্থ হাদিয়া দেওয়া জায়েয বুঝলাম, কিন্তু বকরী, গরু, উট ইত্যাদি হাদিয়া দেওয়া যাবে কি-না। নিচের দলিল গুলো লক্ষ্য করুনঃ-

[বিঃ দ্রঃ হাদিয়া হিসেবে যা দেওয়া জায়েয, নজরানা হিসেবেও তা দেওয়া জায়েয]

#দলিলঃ একদা গ্রাম্য এক লোক নবী করিম (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) কে একটি উষ্ট্রি হাদিয়া দিয়েছেন, ফলে নবী (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) তাঁকে ৫টি উষ্ট্রি হাদিয়া দিলেন (আবুদাউদ, ৪র্থ খন্ড, ৪২৬ পৃ: হাশিয়া, ছা:- ই: ফা:)।

#দলিলঃ عن عباض بن حمار انه اهدى للنبى صلى الله عليه وسلم هدية له او ناقة *অর্থাৎ, হজরত ইয়াদ্ব ইবনে হিমার (রাঃ) বর্ণনা করেন, তিনি নবী করিম (ছাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) কে কিছু হাদিয়া অথবা একটি উষ্ট্রি হাদিয়া দিয়েছেন (তিরমিজি শরিফ, ১ম জি: ৬৮২ পৃ:)।

*এই হাদিস দ্বারা বুজা যায় উষ্ট্রি ও গরু হাদিয়া দেওয়া জায়েয। উভয়ের গরু ও উট এর হুকুম একই, যেহেতু কোরবানীর বেলায় উভয়ের হুকুম এক রকম।

#দলিলঃ عن عبد الله بن بسر (رض) قال اهد للنبى صلى الله عليه وسلم شاة *অর্থাৎ, হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে বুশর (রাঃ) বলেন, আমি নবী করিম (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) কে একটি বকরী হাদিয়া দিয়েছি (ইবনে মাজাহ শরিফ, ২৩৫ পৃ:)।

*বকরী ও ছাগল উভয়ের হুকুম একই। সুতরাং বকরী ও ছাগল হাদিয়া হিসেবে দেওয়া জায়েয, যা হাদিস দ্বারা প্রমানিত।

*ছুওয়াল-জবাবঃ

*ছুওয়ালঃ মাজারে বা পীরের দরবারে গরু জবাহ করা জায়েয আছে কি?

*জবাবঃ মাজারের উদ্দেশ্যে গরু কেউ জবাহ করেনা বরং মাজারের কাছে মেহমান, মোছাফির ও এতিম-মিসকিন যারা থাকে তাদেরকে খাওয়ানোর জন্য গরু জবাহ করা হয়। আর মানুষকে খাওয়ানো যে ভাল কাজ তা সবাই জানে। শুধু নিকটাত্মীয়দের খাওয়ানো নাম ইসলাম নয়, বরং সব বয়সের গরীবদের খাওয়ানোই ভাল কাজ, তা যে কোন জায়গায়ই হোক। হ্যাঁ কোন নির্দিষ্ট জায়গায় কোন আমল করবে এরুপ মান্নত করা জায়েয, আর গরু কোরবানী ও যবেহ্ করাও একটি আমল।

*দলিলঃ عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان امرأة اتت النبى صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله انى انذرت ان اضرب على راسك بالدف قال اوفى بنذرك قالت انى نذرت ان اذبح بمكان كذا كذا مكان كان يذبح فيه اهل الجاهلية قال لصنم قالت لا قال بوثن قالت لا قال اوفى بنذرك *আমর ইবনে শুয়াইব (রাঃ) নিজের পিতা ও দাদা সূত্রে বর্ণনা করেন: একদা জৈনিক মহিলা নবী করিম (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) এর নিকট এসে বললেন ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনার সামনে দফ বাজানোর মানত করেছি। নবীজি বলেন তুমি তোমার মানত পুরা কর। এরপর সে বলে আমি অমুক অমুক স্থানে কোরবানী করার নিয়ত করেছি। সে স্থানে জাহেলী যুগে কোরবানী করা হত। নবী করিম (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) বললেন তোমার এ কোরবানী কি মূর্তির জন্য? সে বলল না। নবীজি বললেন: তবে কি কোন দেব দেবীর জন্য? সে বলল না। নবীজি বললেন তবে তুমি তোমার মান্নত পুরা কর (আবু দাউদ, ২য় জি: ৪৬৯ পৃ:)।

*সুতরাং কোন গাইরুল্লার জন্য না হয়ে আল্লাহর জন্য কোরবানী করলে তা নির্দিষ্ট জায়গায় হলেও অসুবিধা নেই। তাই কোন নেক বান্দার মাজারে বা দরবারে আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে হালাল প্রাণী কোরবানী করা জায়েয। আর ইহা ক্বাউলী হাদিস দ্বারা প্রমানিত।

*ছওয়ালঃ মাজারে গরু নজরানা বা হাদিয়া দেওয়া জায়েয আছে কি?

*জবাবঃ মাজারে কেউ গরু-ছাগল ইত্যাদি নজরানা দেয়না বরং কোন মাজারে কোন নেক বান্দা থাকলে তাকেই নজরানা দেওয়া হয়। আর নেক বান্দাকে নজরানা দেওয়া অবশ্যই জায়েয।

হ্যাঁ মাজারে শায়িত নেক বান্দার রুহে সওয়াব রেছানীর উদ্দেশ্যে কোন গরীবকে বা মিছকীনকে কিংবা কোন আলিমকে গরু হাদিয়া-নজরানা, ইত্যাদি ইত্যাদি দেওয়া জায়েয।

***কুরআন-সুন্নাহ এর দৃষ্টিতেঃ**

***বাবা কয় শ্রেণীঃ**

* আপন পীরকে বা মোর্শেদ'কে বাবা বললেই কিছু লোক তিরস্কার ও ঠাট্টা-বিদ্রুপ করেন। এই জন্যে এই অধ্যায়ে বাবা কয় শ্রেণী সে বিষয়ে আলোচনা করা হলঃ

**যেনে রাখা দরকার যে, বাবা বা পিতা মোট আট শ্রেণীর। এই আট শ্রেণী পিতাকেই 'বাবা' বলে সম্বোধণ করা জায়েয আর তা কুরআন হাদিস মোতাবেক প্রমানিত। নিচে লক্ষ্য করুনঃ-

***আট শ্রেণীর পিতাঃ

১/ ابو الحقِيقَة (আবুল হাকিকাত) তথা হাকিকী পিতাঃ তিনি হজরত রাসূলে পাক (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম)।

*দলিলঃ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا ابو الارواح و انا من نور الله والمؤمنون من فيض نوری *অর্থঃ রাসূলে পাক (ছাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) বলেনঃ আমি সকল রুহের পিতা, আর আমি আল্লাহর নুর থেকে সৃষ্টি ও মু'মিনগণ আমার নুরের ফয়েজ থেকে সৃষ্টি (তাফছিরে রুহুল বয়ান, ২য় খন্ড, ৩৭১ পৃ:)।

*দলিলঃ عن ابن عباس قال: النبى اولى بالمؤمنين من انفسهم وازوجه امهاتهم وهو اب لهم *অর্থঃ নবী মু'মিনের জানের চেয়েও নিকটে আর নবীর স্ত্রীগণ মু'মিনের মা এবং তিনি মু'মিনদের পিতা (তাফছিরে রুহুল মায়ানী, ১ম খন্ড, ৫৭ পৃ:; মুস্তাদ্রাকে হাকেম, ৪র্থ খন্ড, ১৩৩৫ পৃ: হাদিস নং ৩৫৫৬; বায়হাক্বী সুনানে কুবরা, হা: নং ১৩১৯৮) হাদিসের সনদ সহি।

*যেহেতু নবীজি সকল সৃষ্টির মূল এবং নবীজির উছিলায় সব কিছু সৃষ্টি হয়েছে সেহেতু তিনি সব কিছুর রুহানী ভাবে হাকিকী পিতা।

২/ ابو الشريعة (আবুশ শরিয়া) তথা শরিয়াতের পিতা হজরত নূহ (আঃ)।

*দলিলঃ ابو الشريعة هو عبد الغفار اى نوح عليه السلام *অর্থঃ শরিয়তের পিতা তিনি আব্দুল গাফ্ফার অর্থাৎ নূহ (আঃ) (তাফছিরে রুহুল বয়ান)।

*পূর্ণাঙ্গ শরিয়তের প্রবর্তন হয় সর্ব প্রথম হজরত নূহ (আঃ) এর জামানায়, তাই তাঁকে শরিয়তের পিতা বলা হয়।

৩/ ابو لتحصيل المعرفة (আবু লিতাহছিলুল মারেফাত) তথা মারেফাত হাছিলের পিতাঃ তিনি হজরত আলী (রাঃ)।

*দলিলঃ انا مدينة العلم و علي بابها *অর্থঃ রাসূলে পাক (ছাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) বলেন আমি এলেমের (এলমে মারেফাতের) শহর তথা সাগর, হজরত আলী (রাঃ) তাঁর দরজা (হাকেম শরিফ, ৫ম খন্ড, ১৭৪৪ পৃ:; জামে তিরমিজি, ১ম জি:; তাফছিরে রুহুল বয়ান, ৫ম খন্ড, ৩১১ পৃ:; মেসকাত শরিফ, ৫৬৪ পৃ:; মেরকাত, ১১ম খন্ড, ২৫২ পৃ:; জামেউছ ছাগীর, ১ম জি: ১৬১ পৃ:; মাকাছিদুল হাছানাহ, ৯৭ পৃ:)।

*সুতরাং ইল্‌মে মারেফাতের শহরে কিংবা মারেফাতের সাগরে প্রবেশ করতে হলে হজরত আলী (রাঃ) কে দরজা হিসেবে লাগবে। কারন প্রিয় নবীজি (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) বলেছেনঃ انا مدينة العلم و علي بابها فمن اراد العلم فليأته من بابه *অর্থাৎ, আমি এলেমে (মারেফতের) শহর, আলী (রাঃ) তার দরজা। যে এলেম (মারেফাত) অর্জন করতে চায় তাহলে সেই দরজা হয়েই অর্জন করতে হবে (মুস্তাদরাকে হাকেম, ৫ম খন্ড, ১৭৪৪ পৃ:; মেরকাত শরহে মেসকাত, ১১তম খন্ড, ২৫২ পৃ:)।

এই জন্যে হজরত আলী (রাঃ) কে মারেফাত হাছিলের জন্য পিতা বলা হয়। আপন মোর্শেদ যদিও মারেফাত দান করবেন, তবে ইহা হজরত আলী (রাঃ) এর সেই দরজা হয়েই মারেফাত এনে দিবেন।

৪/ ابو الطريقة (আবুত ত্বারিকাত) তথা ত্বরিকতের পিতাঃ তিনি আপন মোর্শেদ বা আপন পীর।

*দলিলঃ وما يضلل فلن تجد له وليا مرشدا *অর্থঃ আর যাকে পথভ্রষ্ট বা ত্বরিকাভ্রষ্ট করি সে কোন ওলীকে মোর্শেদ হিসেবে পাবেনা (সূরা কাহাফ, ১৭ নং আয়াত)।

* 'পথ' শব্দটাকে আরবীতে বলা হয় 'ত্বরিকা'। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ বলছেন, যে পথভ্রষ্ট তথা ত্বরিকাভ্রষ্ট তার কোন মোর্শেদ নেই। তাহলে বুঝা যায় সঠিক পথ বা সঠিক ত্বরিকার জন্য মোর্শেদে কামেল একমাত্র উপায়, কারন সঠিক পথের জন্য মোর্শেদে কামেল তেমন, যেমন সন্তানদের কল্যানের জন্য তার পিতা। এই কারনে আপন মোর্শেদকে ত্বরিকতের পিতা বলা হয়।

৫/ ابو البشر (আবুল বাশার) তথা মানব জাতির পিতা, তিনি হজরত আদম (আঃ)। বাবা আদম (আঃ) যে আদি পিতা এ ব্যাপারে কারোও কোন দ্বিমত নেই।

#দলিলঃ (خلقنكم) يعنى من تراب الارض ابانكم ادم *অর্থঃ (খালাক্বনাকুম) অর্থাৎ তোমাদের বাবা 'আদম'কে আমি জমীনের মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছি (তাফছিরে মাজহারী, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৭৩ পৃ:)।

*সুতরাং হজরত আদম (আঃ) আমাদের আদি পিতা।

৬/ ابو لمسليم ملة (আবু লি মুছলীম মিল্লাত) তথা মুসলীম জাতীর পিতা তিনি হজরত ইব্রাহিম (আঃ)।

*দলিলঃ ملة ابيكم ابراهيم هو سمى كم المسلمين *অর্থঃ তোমাদের (মুসলীমদের) জাতীর পিতা ইব্রাহিম আর সেই তোমাদের নাম রেখেছেন মুসলমান (আল কোরআন)। সুতরাং মুসলমানদের জাতীর পিতা হজরত ইব্রাহিম (আঃ)।

৭/ ابو الولد (আবুল ওয়ালাদ) তথা জন্মদাতা পিতা: নিজের জন্মদাতাই এই শ্রেণীর পিতা।

৮/ ابو لتعظيم والتكريم (আবু লিত তাজিম ওয়া তাক্করীম) তথা সম্মান ও তাজিম কিংবা স্নেহের কারনে কাউকে আব্বু বা বাবা বলা। এই শ্রেণীতেই পরেন শশুর মশাই। শশুরকে পিতার মত সম্মানী বলেই বাবা বলা হয়। নিজের ছেলেকে আব্বু বলা, ছোট বাচ্চাদেরকে মুরব্বীরা 'বাবা' বলে ডাক দেওয়া, রিক্সা ড্রাইভারকে আরহীগণ 'বাবা আস্তে চালাও' বলা, দাদার পিতাকে 'বড় আব্বা' বলা ইত্যাদি এগুলো এই স্তরের অন্তর্ভূক্ত। যদিও তাঁরা পিতা নয় তবুও সম্মান, তাজিম ও স্নেহের কারনে পিতা বলা হয়।

**যেনে রাখা দরকার যে, আপন পীরকে বাবা বলা ফরজ, ওয়াজিব কোনটিই নয় বরং ইহা একটি 'আদব'।

*ছুওয়াল-জবাবঃ

*ছুওয়ালঃ হাদিস শরিফে আছে: কেউ যদি নিজের পিতাকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে পিতা ডাকে তাহলে জাহান্নামী হবে। তাহলে পীরকে আমরা বাবা বলব কেন?

*জবাবঃ হাদিস শরিফে বলা হয়েছে যে নিজের বাবাকে বাদ করে অন্যকে বাবা বললে অপরাধ। অর্থাৎ, কেউ তার জন্মদাতাকে বাবা ডাকেনা কিন্তু অন্য কাউকে জন্মদাতা হিসেবে বাবা ডাকে এরুপ ব্যক্তিকে জাহান্নামী বলা হয়েছে। যদি জন্মদাতা ব্যতিত অন্য কাউকে বাবা বলা নিষেধ হয়, তাহলে পবিত্র কোরআনে আছে হজরত ইব্রাহিম (আঃ) মুসলমানদের বাবা, তাহলে তাঁকে কি ডাকবেন? আদি পিতা আদম (আঃ) কে কি ডাকবেন? নিজের শশুরকে কি ডাকবেন?

*ছুওয়ালঃ পীরকে বাবা বলা হয় কোন দৃষ্টিতে?

*জবাবঃ শশুরকে বাবা বলবেন কোন দৃষ্টিতে? হয়ত বলবেন তিনি আমার স্ত্রীর পিতা তাই তিনি আমার পিতার মত সম্মানী। তাহলে আমরা বলব পিতার মত সম্মানী হলে যদি বাবা বলা যায় তাহলে আপন পীর অবশ্যই মুরীদের কাছে পিতার মত সম্মানী। তাহলে পীরকে বাবা বলবেনা কেন?

এখন যদি প্রশ্ন করি পিতা তার ছেলেকে কোলে নিয়ে আব্বু আব্বু বলে ডাকে কোন দৃষ্টিকোন থেকে?

নাকি সন্তানও পিতার মত সম্মানী? না, বরং সন্তানকে আদরের জন্য আব্বু আব্বু বলে ডাকা হয়। কথায় বলে: لا مقدمة فى الحب মহব্বতের কাছে কোন মোকাদ্দমা চলে না।

*পবিত্র কোরআনের বহু জায়গায় উল্লেখ আছে এবং হাদিসের কিতাবের অনেক জায়গায় উল্লেখ আছে: يا بني ইয়া বুনাইয়া! অর্থাৎ, হে বৎসগণ কিংবা হে বাবা!

যে সন্তান নয় তাকে যদি يا بني বা হে বৎস বা হে বাবা! বলে ডাক দেওয়া যায়, তাহলে বুঝা যায় আদর করে কাউকে হে বৎস বা হে বাবা! বলা জায়েয। يا بني এর আরেক অর্থ হল: হে বাবা! যেমন হাদিস শরিফে বলা হয়েছে يا بني ইয়া বুনাইয়া বা হে বৎস!

*দলিল: عن انس قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني ان تصبح وتمسى وليس فى قلبك غش لاحد فافعل ثم قال يا بني وذلك من سنتى ومن احب سنتى فقد احبنى ومن احبنى كان معى فى الجنة *অর্থঃ হজরত আনাছ (রাঃ) বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) আমাকে বললেনঃ 'বাবা' তুমি যদি এরুপে সকাল-সন্ধ্যা কাটাতে পার যে, তোমার অন্তরে কারোও ব্যাপারে হিংসা-বিদ্বেষ নাই, তবে তাই কর। অতঃপর হজরত বললেন; 'বাবা'! ইহা আমার সুন্নাতের অন্তর্গত এবং যে আমার সুন্নাতকে ভালবাসে সে আমাকেই ভালবাসে, আর যে আমাকে ভালবাসবে সে বেহেস্থে আমার সাথে থাকবে (মেসকাত শরিফ, ৩০ পৃ:; সহি তিরমিজি শরিফ; মেরকাত, ১ম খন্ড, ৩৮৩ পৃ:)। [বিঃ দ্রঃ এমদাদিয়া পুস্তকালয় থেকে প্রকাশিত মেসকাতে এই হাদিসের এরুপই অর্থ করা হয়েছে; মেরকাত শরহে মেসকাত, ১ম খন্ড]

*সুতরাং প্রমান হয়ে গেল কাউকে আদর করে 'বাবা' বলে ডাক দেওয়া সুন্নাতে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম)। কারন সয়ং রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) আনাছ (রাঃ) কে 'বাবা' বলে সম্বোধণ করেছেন।

**এরুপ অনেক আয়াত ও হাদিস রয়েছে। বুঝার জন্য শুধু একটি রেওয়াত উল্লেখ করলাম।

*ইসলামী শরিয়াতের দৃষ্টিতেঃ
*নেক বান্দাগণের কবরকে 'রওজা' বলাঃ

*নেক বান্দাগণের কবরকে 'রওজা' বলা পুণ্যের কাজ। পবিত্র হাদিসে এরুপ প্রমান রয়েছে। এর বিরুধীতা করা জায়েয নয়। নিচে এ ব্যাপারে সংক্ষিপ্ত আকারে আলোচনা করা হল:

#দলিলঃ عن ابى سعيد رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القبر روضة من رياض الجنة او حفرة من حفر النران *অর্থঃ হজরত আবু ছাইদ (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলে করিম (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি

ওয়া ছাল্লাম) বলেছেন, কবর হয়'ত জান্নাতের বাগানের মধ্যে একটি 'রওজা' বা বাগান হবে অথবা জাহান্নামের আগুনের মধ্যে একটি আগুন হবে (সহি তিরমিজি শরিফ, ২৪৬০; তাফছিরে কবির শরিফ, ৪র্থ জিঃ ১৪৪ পৃ:; মাকাছিদুল হাছানাহ, ৩০২ পৃ:)।

*এই হাদিসে স্পষ্ট বলা হয়েছে মানুষের কবরের দুটি অবস্থা যথা: হয় 'রওজা' হবে অথবা আগুন হবে। আল্লাহর বন্ধু যারা তথা নেক বান্দাগণের কবরকে অবশ্যই আল্লাহ রওজা করে দেন। আর আল্লাহ যা রওজা করে দেন, তাকে রওজা বললে কোন অসুবিধা নেই কারন ইহা সয়ং আল্লাহ'ই রওজা বানিয়ে দিয়েছেন।

#দলিলঃ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وان مات فى طلبه مات شهيدا وكان قبره روضة من رياض الجنة ويوسع له قبره مد بصره *অর্থঃ রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) বলেছেন, যে ব্যক্তি এলেম অর্জন করতে গিয়ে মারা যাবে সে শহিদী দরজা লাভ করবে এবং তাঁর কবরকে জান্নাতের বাগান সমূহের মধ্যে একটি 'রওজা' বা বাগান করে দেওয়া হবে এবং তাঁর কবরকে প্রশস্থ করে দেওয়া হবে যতটুকু তাঁর দৃষ্টিশক্তি যায় (তাফছিরে কবির শরিফ, ২য় খন্ড, ১৮৯ পৃ:)।

*এই হাদিস দ্বারাও বুঝা যায়, একজন তালেবে ইলিমের কবরকে যদি আল্লাহ খুশি হয়ে 'রওজা' বানিয়ে দেন তাহলে আল্লাহর ওলীগণের কবরকে কেন রওজা বানিয়ে দিবেন না?

*যেনে রাখা আবশ্যক যে, 'রওজা' শব্দের অর্থ বাগান তথা জান্নাতের বাগান। আল্লাহর প্রিয় বান্দাগণের কবরকে যে জান্নাতের বাগানে পরিণত করেন তা পবিত্র হাদিসে আরোও প্রমান রয়েছে:

#দলিলঃ عن انس (رض) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم .... قد ابدلك الله به مقعدا من الجنة *অর্থঃ হজরত আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) বলেন....... (ফেরেস্তার কবরে নেককার মৃত ব্যক্তিকে বলবেন) অবশ্যই আল্লাহ তোমার এই স্থান তথা কবরকে জান্নাতে বা বাগানে পরিবর্তন করে দিয়েছেন (সহি বুখারী, হাঃ নং ১৩৩৮; ও মুসলীম শরিফ; নাসাঈ, হাঃ নং ২০৫১; আবু দাউদ, ৪৭৫২; মেসকাত শরিফ, ২৫ পৃ:; মেরকাত, ১ম খন্ড, ৩১৪ পৃ:)।

*এই হাদিসে বলা হয়েছে ফেরেস্তার প্রশ্নের জবাব দিতে পারলে আল্লাহ তার কবরকে বাগান বা রওজা বানিয়ে দিবেন। বাগান শব্দকে আরবীতে 'রওজা' কিংবা 'জান্নাত' বলা হয়।

*একজন সাধারণ মানুষের কবর যদি বাগান তথা 'রওজা' হয় তাহলে আল্লাহর বন্ধুর কবর কি বাগান বা রওজা হবেনা?

*সবচেয়ে উত্তম 'রওজা' হল রাসূলে করিম (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) এর কবর শরীফ। যেমন: ان قبره صلى الله عليه وسلم روضة من

رياض الجنة بل افضلها *অর্থঃ নিশ্চয় নবী করিম (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) এর কবর শরীফ আল্লাহর বাগানের মধ্যে উত্তম রওজা, বরং এর চেয়ে আরোও উত্তম (মাওয়াহেবুল্লাদুন্নিয়া, ৪র্থ খন্ড, ৫৯১ পৃ:)।

*পবিত্র হাদিসের দৃষ্টিতেঃ

*তারাবী নামাজ ২০ রাকাতঃ

*বর্তমানে একদল দুনিয়াদার আলেম বেড় হয়েছে তাদের আকিদা হল তারাবী নামাজ ২০ রাকাত নয়, ৮ রাকাত পড়লেই চলে। মানুষকে তারা কিছু ভ্রান্ত ব্যাখ্যা দিয়েও বুঝায়। আমি এবার এই মাছআলা নিয়ে আলোচনা করলাম। নিচে লক্ষ্য করুনঃ-

#দলিলঃ عن ابن عباس قال كان النبى صلى الله عليه وسلم يصلى فى رمضان فى غير جماعة بعشرين ركعة *অর্থঃ হজরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, নিশ্চয় নবী করিম (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) রমজান মাসে জামাত ব্যতিত ২০ রাকাত তারাবী নামাজ পড়তেন (বায়হাক্বী সুনানে কুবরা, ৩য় খন্ড, ১৮৭ পৃ:: তাবারানী তাঁর কবির ও তাঁর 'আওছাতে' ১ম খন্ড, ২৩৩ পৃ:: আল মাজমুয়ায়ে, ৩/১৭২: ফাতহুল কাদির, ১ম খন্ড, ৪৮৫ পৃ:)।

#দলিলঃ عن ابن عباس (رض) انه عليه الصلوة و السلام كان يصلى فى رمضان عشرين ركعة و الوتر *অর্থঃ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) রমজানে ২০ রাকাত তারাবী আদায় করতেন (বুখারী শরিফ, ১ম জিঃ ১৫৪ পৃ: হা:; মুছান্নাফে ইবনে আবী শায়বাহ, ২য় খন্ড, ২৮৬ পৃ:; মেরকাত, ৩য় খন্ড, ৩৪৫ পৃ:)।

#দলিলঃ عن السائب بن يزيد قال كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب (رض) فى شهر رمضان بعشرين ركعة *অথঃ হজরত সাইব ইবনে ইয়াজিদ (রাঃ) বলেন, হজরত উমর (রাঃ) এর যুগে আমরা রমজানে ২০ রাকাত আদায় করতাম (বায়হাক্বী সুনানে কুবরা, ৩য় খন্ড, ১৮৮ পৃ:; মেরকাত, ৩য় খন্ড, ৩৪৫ পৃ:) সনদ সহি।

#দলিলঃ عن يزيد بن رومان قال كان الناس يقومون فى زمان عمر بن الخطاب (رض) فى رمضان بثلاث و عشرين ركعة *অর্থঃ হজরত ইয়াজিদ ইবনে রুমান (রাঃ) বলেন হজরত উমর (রাঃ) এর জামানায় লোকেরা ২৩ (বিতির সহ) রাকাত নামাজ পড়ত (বুখারী শরিফ, ১ম খন্ড, ১৫৪ পৃ: হা:; বায়হাক্বী সুনানে কুবরা, ৩য় খন্ড, ১৮৮ পৃ:; মুয়াত্তা ঈমাম মালেক, ৪০ পৃ:; ফাতহুল কাদির, ১ম খন্ড, ৪৮৫ পৃ:; মেরকাত, ৩য় খন্ড, ৩৪৫ পৃ:) সনদ সহি।

#দলিলঃ عن ابو الخصين قال كان يؤمنا سويد بن غفلة فى رمضان خمس ترويحات عشرين ركعة *অর্থঃ হজরত আবুল হুছাইন বলেন সুহাইদ ইবনে গাফালা (রাঃ) আমাদেরকে নিয়ে পাঁচ তারাবী বা ২০ রাকাতে ইয়ামতি করতেন (বায়হাক্বী সুনানে কুবরা, ৩য় খন্ড, ১৮৮ পৃ:) সনদ সহি।

*এই হাদিসের মধ্যেই তারাবী শব্দটি রয়েছে অথচ একদল মূর্খ আলিম বের হয়েছে তারা বলে বেড়ায় যে, 'তারাবী' শব্দটি কোন কিতাবে নেই। অথচ অধিকাংশ কিতাবে باب تراويح নামেই এই অধ্যায়ের নাম করন করা হয়েছে। এক তারাবী হল 8 রাকাত, সুতরাং পাঁচ তারাবী হবে ২০ রাকাত।

#দলিলঃ ان عمر (رض) جمع اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان على ابي ب كعب (رض) فصلى بهم في كلى ليلة عشرين ركعة *অর্থঃ নিশ্চয় উমর (রাঃ) নবীজির সাহাবীদের কে রমজানে উবাই ইবনে কাবের পিছনে একত্রে করলেন। অতঃপর সে তাদেরকে নিয়ে ২০ রাকাত তারাবী আদায় করতেন (কিতাবুল বাদাউস সানায়ে, ১ম খন্ড, ৬৪৪ পৃ:; এলাউস সুনান; কানজুল উম্মাল, ৮ম খন্ড, ১৭২ পৃ:; আল মাজমুয়াই, 8/৩২) সনদ সহি।

#দলিলঃ عن شتير بن شكل و كان من اصحاب علي (رض) انه كان يؤمهم في شهر رمضان بعشرين ركعة و يوتر بثلاث *অর্থঃ হজরত সাতির ইবনে শিকল বলেন, হজরত আলী (রাঃ) নিশ্চয় তিনি রমজানে ২০ রাকাতে ইমামতি করতেন এবং বিতির ৩ রাকাত (বায়হাক্বী সুনানে কুবরা, ৩য় খন্ড, ১৮৮ পৃ:) সনদ সহি।

*এই হাদিসে তারাবী ২০ রাকাত ও বিতির ৩ রাকাত প্রমানিত হয়।

#দলিলঃ عن ابي عبد الرحمن السلمي عن على (رض) قال دعا القراء في رمضان فامر منهم رجلا يصلى بالناس عشرين ركعة *অর্থঃ হজরত আবী আব্দুর রহমান ছুলামী হজরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি রমজানে ক্বারীদের আহ্ববান করলেন, অতঃপর তাকে লোকজনকে ২০ রাকাত নামাজ পড়ার নির্দেশ দিলেন (বায়হাক্বী সুনানে কুবরা, ৩য় খন্ড, ১৮৮ পৃ:) সনদ দ্বায়িফ।

*এই হাদিস দ্বারা প্রমান হয় আলী (রাঃ) ২০ রাকাত তারাবী পড়তেন এবং এই হাদিস দ্বারাও 'তারাবী' শব্দটি পাওয়া যায়।

#দলিলঃ عن شتير بن شكل انه كان يصلى في رمضان عشرين ركعة *অর্থঃ হজরত সাতির ইবনে শিকল (রাঃ) বলেন, নিশ্চয় লোকজন রমজানে ২০ রাকাত নামাজ পড়তেন (মুছান্নাফে ইবনে আবী শায়বাহ, ২য় খন্ড, ২৮৫ পৃ:) সনদ হাছান।

#দলিলঃ عن ابي الحسناء ان عليا امر رجلا يصلى بهم في رمضان عشرين ركعة *অর্থঃ হজরত আবুল হাছনা (রাঃ) বলেন, নিশ্চয় আলী (রাঃ) রমজানে লোকজনকে ২০ রাকাত নামাজ পড়ার নির্দেশ করতেন (মুছান্নাফে ইবনে আবী শায়বাহ, ২য় খন্ড, ২৮৫ পৃ:; কানজুল উম্মাল, ৮ম খন্ড, ১৭২ পৃ:) সনদ সহি।

#দলিলঃ عن ابي الحسناء ان علي بن طالب (رض) امر رجلا ان يصلى بالناس خمس ترويحات عشرين ركعة *অর্থঃ হজরত আবুল

হাছনা বলেন নিশ্চয় আলী (রাঃ) লোকদের নির্দেশ দিতেন পাঁচ তারাবী ২০ রাকাত পড়ার জন্য (বায়হাক্বী সুনানে কুবরা, ৩য় খন্ড, ১৮৯ পৃ:) সনদ দ্বায়িফ।

#দলিলঃ عن نافع بن عمر قال كان ابن ابي مليكة يصلى بنا في رمضان عشرين ركعة *অর্থঃ হজরত নাফে ইবনে উমর (রাঃ) বলেন, হজরত আবী মোলাইকা (রাঃ) আমাদের কে নিয়ে ২০ রাকাত আদায় করতেন (মুছান্নাফে ইবনে আবী শায়বাহ, ২য় খন্ড, ২৮৫ পৃ:) সনদ সহি।

#দলিলঃ كان ابي ابن كعب يصلى بالناس في رمضان بالمدينة عشرين ركعة و يوتر بثلاث *অর্থঃ হজরত উবাইয়া ইবনে কা'ব (রাঃ) মদিনা শরিফে রমজানে ২০ রাকাত আদায় করতেন ও বিতির ৩ রাকাত পড়তেন (মুছান্নাফে ইবনে আবী শায়বাহ, ২য় খন্ড, ২৮৫ পৃ:) সনদ হাছান।

#দলিলঃ عن ابي اسحاق عن الحرث انه كان يؤم الناس في رمضان بالليل بعشرين ركعة و يوتر بثلاث *অর্থঃ হজরত আবী ইছহাক হারেছ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, নিশ্চয় তিনি রমজানে রাতে লোকজনদের নিয়ে ২০ রাকাতে ইমামতি করতেন ও বিতির ৩ রাকাত (মুছান্নাফে ইবনে আবী শায়বাহ, ২য় খন্ড, ২৮৫ পৃ:)।

#দলিলঃ عن السائب بن يزيد قال كنا نقوموا في زمن عمر بن الخطاب (رض) بعشرين ركعة والوتر *অর্থঃ হজরত সাইব ইবনে ইয়াজিদ (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমরা উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) এর যুগে ২০ রাকাত তারাবী পড়তাম ও বিতির (বায়হাক্বী তার 'মারেফা' গ্রন্থে ও সুনানে; ফাতহুল ক্বাদির, ১ম খন্ড, ৪৮৫ পৃ:; উমদাদুল ক্বারী শরহে বুখারী, ৫ম খন্ড, ৩০৭ পৃ:; ইমাম নববী (র:) ও সকলেই বলেছেন এই হাদিসের সনদ সহি)।

#দলিলঃ عن عطاء قال ادركت الناس وهم يصلون ثلاثا و عشرين ركعة بالوتر *অর্থঃ হজরত আতা (রঃ) বলেন, আমি লোকজনকে দেখতাম তারা বিতির সহ তেইশ রাকাত পড়তেন (মুছান্নাফে ইবনে আবী শায়বাহ, ২য় খন্ড, ২৮৫ পৃ:) সনদ সহি।

#দলিলঃ عن شعيد بن عبيد ان علي بن ربيعة كان يصلى بهم في رمضان خمس ترويحات و يوتر بثلاث *অর্থঃ হজরত সাঈদ ইবনে উবাইদ বলেন, আলী ইবনে রবীয়া লোকদের নিয়ে পাঁচ তারানী আদায় করতেন ও বিতির ৩ রাকাত পড়তেন (মুছান্নাফে ইবনে আবী শায়বাহ, ২য় খন্ড, ২৮৫ পৃ:) সনদ সহি;

*চার রাকাতে এক তারাবী, সুতরাং পাঁচ তারাবী হল ২০ রাকাত।

#দলিলঃ روى محمد بن نصر من طريق عطاء قال ادركتهم يصلون عشرين ركعة و ثلث ركعات للوتر *অর্থঃ মুহাম্মদ ইবনে নছর বিশিষ্ট তাবেঈ হজরত আতা (রঃ) এর সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন আমি লোকদেরকে তারাবী ২০ রাকাত ও বিতির ৩ রাকাত পড়তে দেখেছি (ফাতহুল মুলহীম শরহে মুসলীম, ২য় খন্ড, ২৯১ পৃ:)।

#দলিলঃ كان عبد الله بن مسعود يصلى لنا فى شهر رمضان فينصرف وعليه ليل قال الاعمش كان يصلى عشرين ركعة *অর্থঃ রাবী বলেন ইবনে মাসউদ (রাঃ) আমাদেরকে নিয়ে রমজান মাসে নামাজ আদায় করতেন ও রাতে চলে যাইতেন। আমশী (রঃ) বলেন: তিনি ২০ রাকাত নামাজ আদায় করতেন (উমদাদুল ক্বারী শরহে বুখারী, ৫ম খন্ড, ৩৫৫ পৃ:)।

**উল্লেখিত দলিল গুলো দ্বারা প্রমান হয় যে, তারাবীর নামাজ ২০ রাকাত, ইহা রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) ও তাঁর প্রিয় সাহাবীগণের আমল দ্বারা প্রমানিত। একদিকে নবীজি ২০ রাকাত তারাবীর নামাজ পড়েছেন তাই ২০ রাকাতই সুন্নাত। অপর দিকে নবীর সাহাবীগণ ও বিশেষ করে খোলাফায়ে রাশেদীনগণের মধ্যে হজরত উমর (রাঃ), হজরত উসমান (রাঃ), এবং শেরে খোদা হজরত আলী (রাঃ) ২০ রাকাত তারাবী পড়তেন। তাই বলা যায়, ২০ রাকাত তারাবী সুন্নাতে মোয়াক্কাদা যেনে পড়া পড়া আবশ্যক, কারন ইহা নবী করিম (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) এর খলিফাগণের সুন্নাত। আর নবী করিম (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) বলেছেন: عليكم بسنة و سنة الخلفاء الرشدين المهدين *অর্থঃ তোমাদের জন্য আমার ও আমার খলিফাগণের সুন্নাত পালন করা আবশ্যক (বুখারী, আবু দাউদ, ৪৬০৭; ইবনে মাজাহ, ৪২ নং; তিরমিজি, ২৬৭৬; সহি ইবনে হিব্বান; ফাতহুল কাদির, ১ম খন্ড, ৪৮৪ পৃ:; শিফা শরিফ, ২য় জি: ৩৭২ পৃ:; কিতাবুল ফিকহ্ আলা মাজহাবিল আরবা, ১ম খন্ড, ৩১০ পৃ:)।

*অপর দিকে লক্ষ্য করা যায় যে, প্রিয় নবীজির অন্যন্ন সাহাবীগণের আমলও ছিল ২০ রাকাত তারাবী। এ মর্মে নবী করিম (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) বলেছেন:

#দলিলঃ اصحابى كالنجوم فبايهم اقتديتم اهتديتم *অর্থঃ আমার সাহাবীরা আকাশের তারকার মত, তোমরা যে কারোও অনুসরণ করলে হেদায়েতের রাস্থা পেয়ে যাবে (মেসকাত শরিফ, ৫৫৪ পৃ:; রাজিন, মেরকাত, ১১ তম খন্ড, ১৬৩ পৃ:; আশিয়াতুল লুমআত, মাউজুয়াতুল কাবির; শিফা শরিফ, ২য় জি: ৪১০ পৃ:)।

*এর সমর্থনে আরো একটি সহি হাদিস রয়েছে, যেমনঃ مثل اصحابى كمثل النجوم فى السماء من اخذ بنجم من اهتدى *অর্থঃ আমার সাহাবীগণের মেছাল হল আকাশের তারকার মত, যে তারকাকে গ্রহন করবে সে সঠিক পথ প্রাপ্ত হবে (কিতাবুস সুন্নী, মাউজুআতুল কাবির; দায়লামী শরিফ)।

*সুতরাং সাহাবীগণ যেহেতু ২০ রাকাত তারাবী পড়েছেন আমরা তাঁদের অনুসরণের জন্য ২০ রাকাত তারাবী পরা উচিৎ। কারন সাহাবাগণ নবীজির পূর্ণ অনুসারী ছিলেন এবং নবীজি (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) যেভাবে আমল করেছেন তাঁরা সেভাবেই আমল করেছেন। আর সাহাবীগণ থেকে দেখে তাবেঈগণ আমল করেছেন। তাই তাঁদের পথ ও মতই হল সঠিক ও মুক্তির পথ।

*ফকিহ্ ও ঈমাম গণের ভাষ্যঃ

*ঈমাম তিরমিজি (রঃ) বলেন: واكثر اهل العلم على ما روى عن علي و عمر و غيرهما من اصحاب النبى (ص) عشرين ركعة وهو قول سغيان الثورى و ابن مبارك والشافعى وقال الشافعى ادركت ببلد مكة يصلون عشرين ركعة *অর্থঃ অধিকাংশ আলিমের আমল এর উপর যা হজরত উমর ও আলী (রাঃ) ও অন্যন্ন সাহাবীগণ থেকে ২০ রাকাত বর্ণিত আছে। আর এটা সুফিয়ান ছাওরী, ইবনে মোবারক ও ঈমাম শাফেয়ী এর অভিমত। ঈমাম শাফেঈ (রঃ) বলেন: আমি মক্কা বাসীদেরকে ২০ রাকাত তারাবী পড়তে দেখেছি (তিরমিজি শরিফ, ১ম জি: ১৬৬ পৃ:)।

#দলিলঃ قال ابن عبد البر وهو قول جمهور العلماء وبه قال الكوفيون والشافعى واكثر الفقهاء وهو الصحيح عن ابى ابن كعب من غير خلاف من الصحابه *অর্থঃ ইবনুল বার (রঃ) বলেন: ২০ রাকাত তারাবীই অধিকাংশের মত। এটা কুফা বাসী ও ঈমাম শাফেয়ী এবং অধিকাংশ ফকিহ্ গণ বলেছেন। আর এটাই সহি যা উবাই ইবনে কাব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। এ ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামগণের মধ্যে কোন মতানৈক্য নেই (উমদাদুল ক্বারী শরহে বুখারী, ৫ম খন্ড, ৩৫৫ পৃ:)।

#দলিলঃ আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী (রঃ) বলেন: فصار اجماعا لماروى البيهقى باسناد صحيح كانوا يقيمون على عهد بعشرين ركعة وعلى عهد عمرو عثمان و علي *অর্থঃ ২০ রাকাত তারাবী এর ব্যাপারে সকল মুছলমানের ঐক্যমত রয়েছে। যেমন বায়হাক্বীর সহি সনদে বর্ণনা রয়েছে: সাহাবীগণ ও সকল মুছলমান হজরত উমর, উছমান ও আলী (রাঃ) এর সময়ে ২০ রাকাত তারাবী পড়তেন (শরহে নেকায়া)।

#দলিলঃ আল্লামা ইবনে হাজর মাযরামী (রঃ) বলেন: اجمع الصحبة على ان التراويح عشرين ركعة *অর্থঃ সকল সাহাবীগণ এ ব্যাপারে একমত যে তারাবী ২০ রাকাত।

#দলিলঃ মাওলানা আব্দল হাই লাখনভী (রঃ) বলেন: اجماع الصحابة على ان التراويح عشرين ركعة *অর্থঃ সাহাবীগণের ইজমা হয়েছে যে তারাবী ২০ রাকাত (মজমুয়ায়ে ফাতওয়া, ১ম খন্ড, ১৮২ পৃ:)।

**ফকিহ্ ও ঈমাম গণ তারাবী নামাজ যে ২০ রাকাত সে ব্যাপারে একমত ছিলেন, কারন এ ব্যাপারে প্রিয় নবীজির সাহাবীগণের ইজমা সংঘঠিত হয়েছে। আর ইজমা হল শরিয়তের অকাট্য দলিল যা অস্বীকার বা এনকার করলে কাফির।

#দলিলঃ وقد ثبت ان صلاو التراويح عشرون ركعة سوى الوتر *অর্থঃ নিশ্চয় ছাবিত হয়েছে যে, তারাবী বিতির ব্যতিত ২০ রাকাত (কিতাবুল ফিকহ্ আলা মাজহাবিল আরবা, ১ম খন্ড, ৩১০ পৃ:)।

*তারাবী নামাজের জামাতঃ

*নবী করিম (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) এর জামানায় তারাবী নামাজের জামাত সারা মাসে প্রচলিত ছিল না, কিন্তু তারাবী প্রচলিত ছিল। নবীজি অনেক সময় তারাবী জামাতে পড়তেন আবার অনেক সময় একা একা পড়তেন। যেমন:

#দলিলঃ عن زيد بن ثابت ان النبى صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة فى المسجد من الحصير فصلى فيها ليالى حتى اجتمع عليه ناس ثم فقدوا صوته ليلة وظنوا انه قد نام فجعل بعضهم يتنحنح ليخرج اليهم فقال ما زال بكم الذى رايت من صنيعكم حتى خشيت ان يكتب عليكم ولو كتب عليكم ماقمتم به

*অর্থঃ হজরত জায়েদ ইবনে ছাবেত (রাঃ) বর্ণনা করেন, নবী করিম (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) একবার মসজিদে মাদুর দ্বারা হুজরা তৈরী করলেন এবং তথায় কয়েক রাত্রি অবস্থান করলেন। ফলে লোকজন নবীজির নিকট একত্রিত হতে লাগল। এক রাতে সাহাবীগণ তাঁর কোন সারা শব্দ পেল না এবং ধারণা করল তিনি হয়ত ঘুমিয়ে আছেন, অতঃপর তাঁরা কেহ কেহ গলা খাকরাইতে লাগলেন যেন তিনি তাঁদের নিকট (জামাতের জন্য) বের হয়ে আসেন। ইহা দেখে নবীজি বললেন: আমি তোমাদের বরাবরের (আগ্রহের) অবস্থা দেখেছি এবং আশংকা করতেছি যেন ইহা তোমাদের জন্য ফরজ হয়ে না যায়। যদি ফরজ হয়ে যায় তাহলে তোমরা তা পালন করতে পারবে না (সহি বুখারী; সহি মুসলীম; মেসকাত, ১১৪ পৃঃ; ফাতহুল কাদির, ১ম খন্ড, ৪৮৪ পৃঃ; মেরকাত, ৩য়, ৩৩২ পৃঃ)।

*এই হাদিস দ্বারা বুজা যায় নবীজি কিছু দিন তারাবী জামাতে পড়েছিলেন, কিন্তু পরবর্তীতে ফরজ হওয়ার আশংকায় জামাত ত্যাগ করেছেন। কিন্তু এখন যেহেতু ফরজ হওয়ার কোন আশংকা নেই তাই জামাত ত্যাগ করা যাবে না।

#দলিলঃ عن ابى ذر قال صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم بنا شيءا من الشهر حتى بقى سبع فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل فلما كانت السادسة لم يقم بنا فلما كانت الخامسة قام بنا حتى ذهب شطر الليل.....

*অর্থঃ হজরত আবু যর গেফারী (রাঃ) বলেন, আমরা রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) এর সাথে রোজা রেখেছি কিন্তু তিনি মাসের কোন অংশেই আমাদের নিয়ে নফল নামাজ জামাতে পড়েন নাই যাবৎ না মাসের মাত্র ৭ রাত্র বাকী রয়েছে। সপ্তম রাতে তিনি আমাদের নিয়ে নামাজ পড়িতে লাগিলেন যাতে রাতের এক তৃতীয়াংশ শেষ হয়ে গেল। যখন ষষ্ঠ রাত আসল তিনি (তারাবী) নামাজ পড়লেন না। অতঃপর ৫ম রাত্র আসলে তিনি আমাদের নিয়ে নামাজ পড়তে লাগল যাতে অর্ধ রাত্রি চলে গেল। ....(আবু দাউদ, ১ম জিঃ ১৯৫ পৃঃ; তিরমিজি, ১ম জিঃ ১৬৬ পৃঃ; নাসাঈ; ইবনে মাজাহ, ৯৪ পৃঃ; মেসকাত, ১১৪ পৃঃ; মেরকাত)।

*এই হাদিসের দ্বারাও প্রমানিত হয় যে, নবী করিম (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) তারাবী নামাজের জামাত মাঝে মাঝে পড়েছেন। তবে কত রাকাত পড়েছেন তার কোন নির্দিষ্টতা এখানে নেই। কিন্তু অন্য হাদিস দ্বারা আমরা জানতে পাই যে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) তারাবী রমজানে ২০ রাকাতই পড়েছেন।

#দলিলঃ عن عبد الرحمن بن عبد القارى قال خرجت مع عمر بن الخطاب ليلة الى مسجد فاذا الناس اوزاع نتفرقون يصلى الرجل لنفسه ويصلى الرجل فيصلى بصلوته الرهط فقال عمر لوجمعت هؤلاء على قارى واحد لكن امثل ثم عزم فجمعهم على ابى بن كعب قال ثم خرجت معه ليلة اخرى والناس يصلون بصلوة قارءهم قال عمر نعمت البدعة هذه

*অর্থঃ হজরত আব্দুর রহমান ইবনে আব্দুল ক্বারী (রাঃ) বলেন: এক রাতে আমি উমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) এর সাথে মসজিদে নববীতে গেলাম, দেখলাম লোক সকল বিভিন্ন দলে বিভক্ত। কেহ একা নামাজ পড়তেছে আবার কারো ক্ষুদ্র এক দল একত্রে নামাজ পড়তেছে। ইহা দেখে উমর (রাঃ) বলিলেন: যদি তাঁদের আমি একজন ঈমামের পিছনে একত্রে করে দেই তা হলে অনেক ভাল হবে। অতঃপর এ ব্যাপারে তিনি দৃঢ় ইচ্ছা ও পূর্ণ সংকল্প গ্রহন করেন এবং তাঁদেরকে হজরত উবাই ইবনে কাব (রাঃ) এর পিছনে একত্র বা জামাত করে দেন।

অতঃপর আরেকদিন তাঁর সাথে মসজিদে গেলাম দেখলাম লোকজন তাঁদের ঈমামের পিছনে নামাজ পড়তেছে। ইহা দেখে হজরত উমর (রাঃ) বললেন "ইহা কি উত্তম বেদআত" ....(সহি বুখারী, ২০১০; মেসকাত, ১১৪ পৃঃ; মেরকাত; মুয়াত্তা ঈমাম মালেক, ৪০ পৃঃ; বায়হাক্বী সুনানে কুবরা, ৩য় খন্ড, ১৮৩ পৃঃ; ফাতহুল কাদির, ১ম খন্ড, ৪৮৪ পৃঃ)।

#দলিলঃ عن هشام بن عروة عن ابه ان عمر بن الخطاب (رض) جمع الناس على قيام شهر رمضان الرجل على ابى بن كعب (رض)

*অর্থঃ হজরত হিশান ইবনে উরওয়া তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন, নিশ্চয় উমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) রমজানে তারাবী নামাজে লোকজনকে উবাইয়া ইবনে কাব (রাঃ) এর পিছনে জমাত করে দেন (বায়হাক্বী সুনানে কুবরা, ৩য় খন্ড, ১৮৩ পৃঃ)।

*এই রেওয়াত গুলো দ্বারা বুজা যায় যে, নবী পাক কিছু দিন তারাবী জামাতে পড়েছেন: ويصلى بالجماعة فى الفرائض و التراويح *অর্থ: নবী (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) ফরজ ও তারাবী নামাজ জামাতে আদায় করেছেন (মেরকাত শরহে মেসকাত, ৩য় খন্ড, ৩৩৩ পৃঃ)। কিন্তু সারা মাসে ফরজ হওয়ার ভয়ে পড়েননি।

তারাবী নামাজের জামাত রমজানে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আনুষ্ঠানিক ভাবে জামাত হজরত উমর (রাঃ) এর যুগে প্রচলিত হয়, যা সাহাবীদের ইজমা বা ঐক্যমতের মাধ্যমে।

*নবী করিম (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) ও হজরত উমর (রাঃ) যুগের মাঝে ব্যবধান হল, নবীজি ফরজ হয়ে যাওয়ার ভয়ে মাঝে মাঝে তারাবী জামাতে পড়তেন, আর হজরত উমর (রাঃ) এর জামানার যেহেতু ফরজ হওয়ার ভয় নেই তাই তিনি সাহাবীদের নিয়ে সারা মাসেই জামাতে পড়তেন।

*তারাবী জামাতে পড়া নবীজির সুন্নাত, তবে সারা মাস জামাতে পড়া খোলাফায়ে রাশেদীন তথা সাহাবীগণের সুন্নাত।

*প্রশ্নোত্তরঃ

*প্রশ্নঃ বিভিন্ন কিভাবে সহি হাদিস দ্বারা জানা যায়: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد فى رمضان ولا فى غيره على احدى عشر ركعات *অর্থঃ মা আয়েশা (রাঃ) এক প্রশ্নের জবাবে বলেছিলেন: রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) রমজানে ও রমজানের বাইরে ১১ রাকাতের অতিরিক্ত (নামাজ) পড়তেন না। এই হাদিস দ্বারা বুজা যায় যে, বিতির ৩ রাকাত ও তারাবী ৮ রাকাত। তাই ৮ রাকাত পড়াই সুন্নাত।

*জবাবঃ গভীরভাবে লক্ষ্য করুন! হাদিসটি তারাবী সম্পর্কীত নয় বরং তাহাজ্জুদ সম্পর্কীত। কারন তারাবী শুধু রমজানে পড়া হয় আর তাহাজ্জুদ রমজান ও রমজানের বাইরে সকল মাসেই পড়া হয়। আর এই হাদিসে বলা হয়েছে: فى رمضان ولا فى غير *রমজানে ও রমজানের বাইরে সকল মাসে। এখন বলুন! রমজানের বাইরে কোন তারাবী নামাজ আছে কি?

*হয়ত ভাববেন, তাহলে মা আয়েশা (রাঃ) কে রমজানে রাসূলের রাতের নামাজ সম্পর্কে প্রশ্ন করার পর এই জবাব দিলেন কেন? তাহলে বলব, এটা মা আয়েশা (রাঃ) ই ভাল জানেন। তদাপিও মা আয়েশা (রাঃ) এর হাদিসেই উল্লেখ আছে ইহা তাহাজ্জুদ নামাজ। কারন ঐ হাদিসের শেষে উল্লেখ আছে: ثم يصلى ثلاثا ৪ রাকাত করে ৮ রাকাত নামাজ পড়তেন অতীব সুন্দর করে, *অতঃপর ৩ রাকাত (বিতির) পড়তেন। অর্থাৎ ১১ রাকাত এক সাথে আদায় করতেন। অতঃপর উল্লেখ আছে: মা আয়েশা (রাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اتنام قبل ان توتر فقال يا عائشة ان عينى تنامان ولا ينام قلبى *অর্থঃ হে আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) আপনি কি বিতির না পড়েই ঘুমিয়ে যান? নবীজি বললেন: হে আয়েশা! আমার চোখ ঘুমায় কিন্তু ক্বাব ঘুমায় না (সহি তিরমিজি, ১ম জি: ৯৯ পৃ:)।

*সুতরাং প্রমান হয়ে গেল, নবীজি রাতে ঘুমাতেন ও ঘুম থেকে উঠার পর এই ১১ রাকাত নামাজ পড়তেন, কারন হাদিসেই স্পষ্ট বলা আছে নবীজি এক সাথেই ৮ রাকাত পড়ার পরপরই ৩ রাকাত আদায় করতেন। আর আমরা সবাই জানি তারাবী হল ঘুমে যাওয়া পূর্বে, পরে নয়।

*তাছাড়া ঈমাম তিরমিজি (রঃ) এই হাদিসটি তাহাজ্জুদ সম্পর্কীয় নামাজের অধ্যায়ে এনেছেন, তারাবী সম্পর্কীত অধ্যায়ে নয়। সুতরাং ইহা তাহাজ্জুদ নামাজ।

*আরেকটি বিষয় লক্ষ্যনীয় যে, মা আয়েশা (রাঃ) এর হাদিস দ্বারা জানা যায়, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) রাতের নামাজ ১১ রাকাতের অতিরিক্ত করতেন না। অথচ অন্য অনেক সহি হাদিস দ্বারা জানা যায় নবীজি ১৩ রাকাত কিংবা এর বেশীও পড়েছেন, যেমন: عن ابن عباس قال كان النبى صلى الله عليه وسلم يصلى من الليل ثلاث عشرة ركعة *অর্থঃ হজরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, নবী করিম (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) রাতে ১৩ রাকাত নামাজ আদায় করতেন (তিরমিজি, ১ম জি: ৯৯ পৃ:)। হাদিসের সনদ সহি।

*এমনকি মা আয়েশা (রাঃ) এর মুসনাদে একটি হাদিস রয়েছে:
#দলিলঃ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى من الليل تسع ركعات *অর্থঃ রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) রাতের নামাজ ৯ রাকাত পড়তেন (মুসনাদে আয়েশা রা:, ৮০ পৃ:)।

*এই হাদিস দ্বারা বুজা যায় নবীজি সব সময় শুধু ১১ রাকাত নামাজই পড়তেন না বরং এর কম-বেশী পড়তেন।

*এখন বলুন! মা আয়েশা (রাঃ) বলতেছেন ১১ রাকাতের বেশী কোন মাসেই পড়তেন না, আর ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলছেন ১৩ রাকাত পড়তেন ও মা আয়েশা (রাঃ) এর মুসনাদেই উল্লেখ আছে তিনি এর কমও পড়তেন। কোনটা সঠিক?

*উভয়টিই সঠিক। মা আয়েশা (রাঃ) দেখেছেন নবীজি ১১ রাকাত পড়তেন, আর ইবনে আব্বাস (রাঃ) দেখেছেন নবীজি ১৩ রাকাতও পড়েছেন। সুতরাং বর্ণনার ভিন্নতা আসতেই পারে। মা আয়েশা (রাঃ) হয়ত দেখেননি যে নবীজি ১৩ রাকাত পড়েছেন তাই তিনি বর্ণনাও করেননি কিন্তু ইবনে আব্বাস (রাঃ) ইহা দেখেছেন। আর সেই ইবনে আব্বাস (রাঃ)ই দেখেছেন ও বর্ণনা করেছেন انه عليه الصلوة والسلام كان يصلى فى رمضان عشرين ركعة অর্থাৎ নিশ্চয় নবী (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) রমজানে ২০ রাকাত তারাবী পড়েছেন। এই হাদিসটি এক যোগে ঈমাম তাবারানী, ঈমাম ইবনে আবী শায়বাহ, ঈমাম বায়হাক্বী, ঈমাম আব্দ ইবনে হুমাইদ, ঈমাম বগবী (রঃ) প্রমূখ যার যার সনদে বর্ণনা করেছন। আর হাদিসের সাথে অনেক সহি হাদিসের মিল রয়েছে এবং সকল সাহবীগণ এরুপই আমল করতেন।

*যদি তারাবী ৮ রাকাত হত তাহলে মা আয়েশা (রাঃ) জিবীত থাকা কালিন হজরত উমর ও অন্য সাহাবীরা (রাঃ) ২০ রাকাত তারাবী পড়লেন কিন্তু তিনি বাধা দিলেন না কেন?

*প্রশ্নঃ এক হাদিসে আছে: انه قال امر عمر بن الخطاب ابي بن كعب و تميم الدارى ان يقوم للناس باحد عشرة ركعة *অর্থঃ তিনি বলেন: নিশ্চয় উমর (রাঃ) উবাই ইবনে কাব (রাঃ) কে লোকদেরকে ১১ রাকাত নামাজ পড়াতে নির্দেশ দিতেন। এই হাদিস দ্বারা বুঝা যায় উমর (রাঃ) ৮ রাকাত তারাবীও পড়েছেন, তাহলে আমরা ৮ রাকাত পড়লে অসুবিধা কি?

*জবাবঃ এই হাদিসের রাবী মুহাম্মদ ইবনে ইউছুফ এর বর্ণনার মধ্যে গরমিল রয়েছে। মুয়াত্তা ঈমাম মালেকের বর্ণনায় ১১ রাকাতের কথা বলেছেন, আবার ঈমাম আব্দুর রাজ্জাক এর নিকট ২১ রাকাতের কথা বলেছেন ও ঈমাম মুহাম্মদ ইবনে নাছর এর নিকট ১৩ রাকাতের কথা বলেছেন (ফাতহুল বারী, ৪র্থ খন্ড, ১৮০ পৃ:)।

এক লোক যদি তিন জনের নিকট তিন রকম কথা বলে তাহলে এরূপ বর্ণনা কারীর উপর নির্ভর করা যায় না। অপর দিকে ২০ রাকাতের ব্যাপারে নির্ভর যোগ্য অনেক রেওয়াত রয়েছে যা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। উছুলে হাদিসের আইন মোতাবেক যদি একই ব্যাপারে একাদিক রেওয়াত পাওয়া যায় তখন অধিকাংশ রেওয়াতের উপর আমল করতে হয়। আমরা এ ব্যাপারে অনেক গুলো রেওয়াত উল্লেখ করেছি যার উপর আমল করতে কোন সন্দেহ নেই।

*প্রশ্নঃ ঈমাম মালেক (রঃ) এর বর্ণিত এক হাদিসে আছে: و كان القارى يقرا بسورة البقرة فى ثمان ركعات فاذا اقامها فى اثنى عشرة ركعة راى الناس انه خفف *অর্থঃ ক্বারী ৮ রাকাতে সূরা বাকারা তেলাওয়াত করতেন, যখন ইহা ১২ রাকাতে তেলাওয়াত করলেন লোকেরা বুজতে পারল তাঁদের উপর সহজ হয়ে গেল। *এই হাদিস দ্বারা প্রমান হয়ে যায় যে, সাহাবীগণ ৮ রাকাত তারাবীও পড়েছেন।

*জবাবঃ এই হাদিসে বলা হয়েছে "সূরা বাকারা" ৮ রাকাতে তেলাওয়াত করা হত, কিন্তু বলা হয়নি যে নামাজ ৮ রাকাত পড়া হত। হাদিসে বলা আছে يقراء পড়তেন, কিন্তু কোন দিন বা কত দিন পড়তেন তা উল্লেখ নেই। সুতরাং প্রতিদিনই সূরা বাকারা দিয়ে ৮ রাকাত নামাজ পড়তেন। পরে যখন ১২ রাকাতে "সূরা বাকারা" পড়লেন তাতে মনে হল নামাজ সহজ করা হয়েছে। ইহাই স্বাভাবিক যে, "সূরা বাকারা" যখন ৮ রাকাতে শেষ করা হবে তখন নামাজ অনেক লম্বা হয়ে যাবে, আর যখন ঐ একই সূরা ৮ রাকাতের জায়গায় ১২ রাকাতে পড়া হবে তখন নামাজ সংক্ষিপ্ত বা সহজ মনে হবে। ইহাই হাদিসের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। নচেৎ বলুন হাদিসের কোন জায়গায় বলা আছে তারাবী ৮ রাকাত? বরং বলা হয়েছে একটি বড় সূরা ৮ রাকাতে তেলাওয়াত করা হত, পরে ঐ সূরা ১২ রাকাতে পড়া হলে লোকদের জন্য সহজ হয়ে গেল।

যদি ধরেও নেই যে, কোন এক সময় ৮ রাকাত ছিল। তাহলে বলব প্রিয় নবীজির খলিফাগণ সকল সাহাবীদের উপস্থিতিতে ইজমা বা ঐক্যমতের

মাধ্যমে ২০ রাকাত সাব্যস্থ করেছেন সেটা মানেন না কেন? ইজমা শরিয়তের অকাট্য দলিল, যা অস্বীকার করলে কাফের হয়ে যায়। নবীজি (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) তারাবী পড়েছেন, সাহাবাগণের কেউ না কেউ নবীজিকে ২০ রাকাত পড়তে দেখেছেন বলেই তাঁরা এই মতের উপর স্থির হতে পারলেন।

নচেৎ কেউ না কেউ প্রতিবাদ করতেন।

**এমন কেউ আছেন কি? যে অন্তত একটি সুস্পষ্ট জয়ীফ হাদিস দেখাবেন যাতে বলা আছে রমজানের রাতের তারাবী নামাজ ৮ রাকাত? সহি হলে আরোও ভাল।

*কুরআন-সুন্নাহ এর দৃষ্টিতেঃ

মাজার যিয়ারত

*মুসলীম জীবনে মাজার যিয়ারত একটি গুরুত্বপূর্ণ এবাদত। যে জায়গা যেয়ারত করা হয় ঐ জায়গাকে বলা হয় 'মাজার'। প্রথমেই আমাদের জানতে হবে মাজার বা কবর যিয়ারতের ব্যাপারে প্রিয় নবীজি (ছাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) কি বলেছেন।

#দলিলঃ عن ابن بريدة عن ابه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فان فى زيارتها تذكرة *অর্থঃ ইবনে বুরাইদা তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন, রাসূল পাক (ছাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) বলেছেন: আমি ইতিপূর্বে তোমাদের কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম এখন থেকে তোমরা কবর যিয়ারত কর (আবুদাউদ ২য় জি:, ৪৬১ পৃঃ; মেসকাত শরিফ, ১৫৪ পৃ:; মেরকাত, ৪র্থ খন্ড, ২১৪ পৃ:; সহি মুসলীম; সুনানে নাসাঈ, হা: নং ২০৩২; মুসনাদে আহমদ, ১৪৫/১)।

#দলিলঃ عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص فى زيارة القبور *অর্থঃ হজরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) কবর যিয়ারতের অনুমতি দিয়েছেন (ইবনে মাজাহ, ১১৪ পৃঃ; এ ব্যাপারে ইবনে মাসউদ (রাঃ) ও আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকেও হাদিস বর্ণিত আছে)।

#দলিলঃ عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انى نهيتكم عن زيارة القبور فانه قد اذن لمحمد فى زيارة قبر امه فزوروها تذكركم الاخرة *অর্থঃ হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলে পাক (ছাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়া ছাল্লাম)
বলেছেন: ইতিপূর্বে তোমাদের কবর যেয়ারত নিষেধ করেছিলাম, নিশ্চয় ইহা মুহাম্মদের মনে তাঁর মায়ের কবর যিয়ারতে কষ্ট যুগিয়েছে, এখন থেকে কবর যিয়ারত করতে পার, কেননা ইহা আখেরাতের কথা মনে করিয়ে দেয় (মুছান্নাফে ইবনে আবী শায়বাহ, ৩য় খন্ড, ২২৪ পৃঃ)।

*এ জন্যেই আল্লামা ঈমাম কুস্তলানী (রঃ) উল্লেখ করেন: وقد اجمع المسلمون على استحباب زيارة القبور *অর্থঃ কবর যিয়ারত উত্তম কাজ এ ব্যাপারে সকল মুসলমাদের মাঝে ইজমা হয়েছে (মাওয়াহেবুল্লাদুন্নিয়া, ৪র্থ খন্ড, ৫৭২ পৃ:)।

#দলিলঃ عن ابی هريرة (رض) ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج الى ال... *অর্থঃ হজরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, নিশ্চয় ...। (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) কবরের দিকে বের হলেন এবং বললেন:..... فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين (বায়হাকী সুনানে কুবরা, ১ম খন্ড, ২০৯ পৃঃ; জামেউল মাছানেদেউ ওয়াছ ছুনান, ১ম জি: ৩০৪ পৃ:)।

#দলিলঃ عن ابی هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم اذا خرجوا الى المقابر السلام عليكم اهل الديار ...... *অর্থঃ হজরত বুরায়দা (রাঃ) বলেন, রাসূলে করিম (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) তাঁদেরকে এই শিক্ষা দিতেন, যখন তাঁরা কবর যিয়ারতে বের হতেন, তখন বলতেন: "তোমাদের প্রতি ছালাম হোক হে নগরবাসী মুসলমানগণ....(মেসকাত শরিফ, ১৫৪ পৃঃ; সহি মুসলীম; মুসনাদে আহমদ, ৩৫৩/৫; মেরকাত শরহে মেসকাত, ৪র্থ খন্ড, ২১৭ পৃঃ; আশিয়াতুল লুমআত)।

**উল্লেখিত দলিল গুলো দ্বারা স্পষ্ট প্রমান হয়ে যায় কবর বা মাজার যিয়ারত একটি পূণ্যময় কাজ এবং এ ব্যাপারে রাসূলে পাক (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম)
এর নির্দেশ রয়েছে, পাশাপাশি সয়ং নবী পাক (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) ও তাঁর প্রিয় সাহাবীগণ কবর বা মাজার যিয়ারত করেছেন।

***দ্বিতীয়ত: যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফরঃ**

#দলিলঃ عن ابی هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج الى المقابر *হজরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, নিশ্চয় রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে বের হতেন এবং সালাম দিতেন এভাবে السلام عليكم دار قوم مؤمنين وانا ان شاء الله بكم لاحقون (আবুদাউদ ২য় খন্ড, ৪৬১ পৃঃ)।

*এই হাদিস দ্বারা প্রমান হয়, সয়ং রাসূলে পাক (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে বের হতেন।

#দলিলঃ عن الاصبغ بن نباتة : ان فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تاتى قبر حمزة *অর্থঃ ইবনে নাবিলা বর্ণনা করেন, নিশ্চয় রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) এর কন্যা ফাতেমা (রাঃ) হজরত আমীর হামজা (রাঃ) এর মাজার যিয়ারতে এসেছিলেন (মুছান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক, ৩য় খন্ড, ৩৮১ পৃ:) সনদ সহি।

*এই হাদিস দ্বারা প্রমান হয়, নবী করিম (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) এর মেয়ে জান্নাতের মহিলাদের ছর্দারনী মা ফাতেমা (রাঃ) মাজার যিয়ারতের উদ্দেশ্যে হজরত আমীর হামজা (রাঃ) এর মাজারে গিয়েছিলেন।

#দলিলঃ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه يأتى البقيع يسلم على ..... *অর্থঃ নিশ্চয় নবী করিম (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) এবং তাঁর সাহাবীগণ 'বাকী' নামক কবর স্থানে আসতেন (মেসকাত, ১৫৪ পৃঃ হাঃ)।

*এই দ্বারা প্রমান হয় নবী পাক (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) ও সাহাবীগণ কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে 'জান্নাতুল বাক্বী' কবরস্থানে যাইতেন।

#দলিলঃ عن عبد الله بن ابی مليكة قال توفى عبد الرحمن بن ابی بكر بحبشى قال فحمل الى مكة فدفن فيها فلما قد مت عائشة اتت قبر عبد الرحمن بن ابی بكر فقال .... *অর্থঃ হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুলায়কা (রাঃ) বলেন, হজরত আব্দুর রহমান ইবনে আবু বকর (রাঃ) ইন্তেকাল করলেন হাবশায়। ইবনে জুরাইয বলেন 'হাবশা' মক্কা হতে ১২ মাইল দূরে, অতঃপর তাঁকে মক্কায় দাফন করা হয়। যখন মা আয়েশা (রাঃ) (মদিনা হতে) এখানে আসতেন তাঁর কবরে আসতেন অতঃপর বলতেন, (একটি কবিতা) (তিরমিজি, ১ম জি: ২০৩ পৃ:; মুছান্নাফে ইবনে আবী শায়বাহ, ৩য় খন্ড, ২২৪ পৃ:; মেসকাত শরিফ, ১৪৯ পৃ:; মেরকাত শরহে মেসকাত, ৪র্থ খন্ড, ১৭৪ পৃ:; আশিয়াতুল লুমআত)।

*এই হাদিস দ্বারা প্রমান হয়, সূদুর মদিনা থেকে ৫০০ কি: মি: রাস্তা সফর করে মা আয়েশা (রাঃ) মক্কায় নিজের ভাই এর মাজার যিয়ারত করতে এসেছিলেন।

#দলিলঃ ان النبى صلى الله عليه وسلم كان يأتى قبور الشهداء باحد على راس كل حول وكان ابو بكر و عمر و عثمان يفعلون ذلك *অর্থঃ হজরত ইব্রাহিম তায়মী (রাঃ) বলেন, নিশ্চয় নবী (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) প্রতি বৎসরের শুরুতে উহুদ যুদ্ধের শহীদগণের মাজার যিয়ারত করতে যাইতেন, হজরত আবু বকর, হজরত উমর ও হজরত আলী (রাঃ)ও এরকম করতেন (ইবনে আবী শাইবাহ; মুছান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক, ৩য় খন্ড, ৩৮১ পৃ:; কবীর শরিফ; তাফছিরে দূর্রে মানসুর; ফাতুয়ায়ে শামী, ২য় খন্ড ১৫০ পৃ:)।

*এই হাদিস দ্বারা প্রমান হয়, সয়ং রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) ও খোলাফায়ে রাসেদগণ শোহাদায়ে কেরামের মাজার যিয়ারতের উদ্দেশ্যে উহুদ পাঁহাড়ে যাইতেন।

#দলিলঃ عن ابن بريدة عن ابه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرج الى المقابر قال السلام على اهل الديار من المسمين *অর্থঃ ইবনে বুরায়দা (রাঃ) তার পিতা হতে বর্ণনা করেন, নবী করীম (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) কবর যিয়ারতে বের হতেন এবং বলতেন السلام على اهل الديار من المسلمين..... (মুসনাদে ঈমামে আজম, ২৬৮ পৃ:; মেসকাত, ১৫৪ পৃ:)।

*এই হাদিসটিও নবী পাকের কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে বের হওয়া প্রমান করে।

#দলিলঃ একদা হজরাত ফাতেমা খাজারিয়া (রাঃ) শুহাদায়ে উহুদের যেয়ারতে গিয়ে হজরত আমীর হামজা (রাঃ) এর মাজার যিয়ারত করেন এবং সালাম প্রদান করেন। অতঃপর মাজার থেকে সালামের জবাবও এসেছে।

এমনিভাবে তিনি সাদ বিন আবী ওয়াক্কাস (রাঃ) এবং অন্যদের যিয়ারতে যাইতেন (ঈমাম জালালুদ্দিন ছিয়ূতী (রঃ) কৃত: "নূরুস সুদুর")।

#দলিলঃ যখন মক্কা বিজয় হল হজরত উমর (রাঃ) হজরত কাব ইবনে আহবার (রাঃ) কে বললেন আপনি কি আমার সাথে নবীজির মাজার যিয়ারতে যাইবেন? তিনি বললেন হ্যাঁ। অতঃপর তারা মদিনায় এসে নবীজির রওজায় এসে সালাম জানান (ফতুয়ায়ে শামী)। এই হাদিস নিয়ত করে যিয়ারতের গুরুত্বপূর্ণ দলিল।

দলিলঃ عن ابى هريرة قال اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبر امه فبكى وابكى من حوله فقال استاذنت ربى تعالى على ان استغفر لها فلم يأذن لى فاستاذنت ان ازور قبرها فاذن لى *অর্থঃ হজরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, একদিন রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) তাঁর মায়ের মাজার যিয়ারতের জন্য গমন করলেন। এ সময় তিনিও কাঁদলেন এবং তাঁর সাথিরাও কাদলেন। এরপর তিনি বললেন, আমি আমার রবের নিকট আমার মায়ের ইস্তেগ্‌ফার কামনা করেছি তিনি অনুমতি দেননি, অতঃপর আমি তাঁর কবর যিয়ারত করতে চাইলে আমাকে অনুমতি দান করা হয়েছে (আবুদাউদ, ২য় খন্ড, ৪৬১ পৃঃ; মেসকাত, ১৫৪ পৃ::; সহি মুসলীম; মেরকাত, ৪র্থ খন্ড, ২১৬ পৃ:: মুসনাদে আহমদ, ৪৪১/২; সুনানে নাসাঈ, হাঃ নং ২০২৪; ইবনে মাজাহ, ১৫৭২ নং হা:)।

*এই হাদিস দ্বারা প্রমান হয় রাসূলে পাক (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) সাহাবীগণের একটি জমাত নিয়ে স্বীয় মায়ের মাজার যিয়ারতের উদ্দেশ্যে গিয়েছেন। সুতরাং দলবদ্ধভাবে মাজার যিয়ারতে যাওয়া সুন্নাত।

#দলিলঃ ان بلالا راى فى المنامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول له ما هذه الجفوة يا بلال؟ اما ان لك تزورنى يا بلال ....فركب رحلته وقصد المدينة فاتى قبر النبى صلى الله عليه وسلم فجعل يبكى عنده ويمنرغ وجهه عليه *অর্থাৎ, হজরত বেলাল (রাঃ) রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম)
কে সপ্নে দেখেন। নবীজি তাকে বললেন, হে বেলাল এ কেমন বিষন্নতা ও বিধুরতা? বেলাল! এখনো কি তোমার সময় হয়নি আমার যিয়ারতের? অতঃপর তিনি ভারাক্রান্ত চিত্তে জাগ্রত হলেন, সাথে সাথে ছাওয়ারির উপর আরোহন করলেন এবং মদিনার রওজার দিকে রওয়ানা দিলেন। অতঃপর রওজা পাকের কাছে গিয়ে কাঁদতে লাগলেন এবং তাঁর চেহারা তথায় ঘষতে লাগলেন (ঈমাম তকী উদ্দিন সুবকী (রঃ) কৃত: 'সিফাউস সিকাম') হাদিসটি বিশুদ্ধ।

*এই হাদিস দ্বারা স্পষ্ট প্রমান হয়ে যায়, নিয়ত করে মাজার যিয়ারত ইহা সাহাবীর সুন্নাত।

দলিলঃ হজরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয় নবীজি (দঃ) বলেন: শেষ যুগে হজরত ঈসা (আঃ) সিরিয়া হতে বহু অলি গলি পার হয়ে

হজ্ব পালনে আসবে এবং মদিনা এসে আমার রওজায় সালাম দিবে আমি তাঁর সালামের জবাবও দিব (মুসতাদ্‌রাকে হাকেম, সহি সনদে)।

#দলিলঃ হাফিজ ইবনে আসাকির (রঃ) তাঁর গ্রন্থে আহমদ ইবনে কাছির (র:) এর জীবনী প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন যে, তিনি একজন পূণ্যবান লোক ছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ (দঃ) আবু বকর (রাঃ) ও উমর (রা:) এবং হাবিলকে সপ্নে দেখেন। তিনি হাবিলকে কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করেন যে, এখানেই তাঁর রক্তপাত করা হয়েছে কিনা। তিনি শপৎ করে স্বীকার করেন এবং বলেন যে, তিনি আল্লাহর নিকট দোয়া করেছিলেন, যেন এ স্থানটিকে সব দোয়া কবুলের স্থান করেদেন। আল্লাহ তাঁর দোয়া কবুল করেছেন। আর রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) এ ব্যাপারে সমর্থন দান করে বলেন: আবু বকর ও উম (রাঃ) প্রতি বৃহ:বার এ স্থানটি যিয়ারত করেন (আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া, ১ম খন্ড, ২১৯ পৃ::; কৃত: হাফেজ ইবনে কাছির (র:)।

*সহি হাদিসে রয়েছে, রাসূলে পাক (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) বলেন: من رانى فى المنام فقد رانى *অর্থঃ যে আমাকে সপ্নে দেখল সে যেন আমাকেই দেখল (সহি বুখারী, ইবনে মাজাহ)। তাই রাসূলে পাক (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) এর সপ্ন সত্য। সপ্নের মাধ্যমে নবীজি কোন কথা বললে তাও বাস্তবের মত সত্য। কারন নবীজিকে সপ্নে দেখা আর বাসতবে দেখা একই কথা। কারন নবী পাক (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) বলেছেন: لا تمثل الشيطان فى صورتى *অর্থঃ শয়তান আমার ছুরাত ধারণ করতে পারেনা (সহি বুখারী; খাছায়েছুল কবরা; ইবনে মাজাহ)। সুতরাং রাসূলে করিম (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) বলেছেন: হাবিলের রক্তপাতের স্থানটি দোয়া কবুলের স্থান, আর ঐ স্থানটি যেয়ারতের জন্যে হজরত আবু বকর ছিদ্দীক (রাঃ) ও হজরত উমর (রাঃ) প্রতি বৃহ:বার যাইতেন।

*এই দলিল দ্বারা প্রমান হয়ে যায়, বিশেষ জায়গায় দোয়া কবুলিয়াতের উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট দিনে সফর করে যাওয়া সুন্নাত।

*ফকিহ্ গণের ভাষ্যঃ

দলিলঃ وهل تندب الرحلة لها كما اعتيد من الرحلة الى زيارة خليل الرحمن وزيارة السيد البدوى لم ارمن صرح به من ائمتنا ومنع منه بعض الائمة الشافعية قياسا على منع الرعلة بغير المسجد الثلث ورده البغزالى بصوضوح الفرق *অর্থঃ দূরবর্তী স্থানে কবর যিয়ারতের নিয়তে যাওয়া মুস্তাহাব। যেমন আজকাল হজরত খলিলুর রহমান (রঃ) ও আল্লামা সৈয়দ বদ্দবী (রঃ) এর মাজার যিয়ারতের সফরে করা হয়। তবে শাফেয়ী মাজহাবের কয়েকজন আলিম 'তিন মসজিদ ভিন্ন সফর নিষেধ' এই হাদিসের উপর অনুমান করে নিষেধ করেছেন, কিন্তু হুজ্জাতুল ইসলাম ঈমাম গাজ্জালী (রঃ) ইহা খন্ডন করে বিশ্লেষন করেছেন (ফতুয়ায়ে শামী, ৩য় খন্ড, ১৫১ পৃঃ)।

*সুতরাং মাজার যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করা জায়েয ও এর বিরুধীদের মতামত সঠিক নয়।

দলিলঃ ...... ولا فرق في الزيارة بين كون المقابر قريبة او بعيدة بل يندب السفر لزيارة الموتى خصوصا الصالحين .* অর্থঃ কবর যিয়ারতের ব্যাপারে কাছে বা দূরে কোন পার্থক্য নেই..... বরং মৃত ব্যক্তি বিশেষ করে নেক্‌কার লোকের কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করা মুস্তাহাব (কিতাবুন ফিক্‌হু আলা মাজহাবিল আরবা, ১ম খন্ড, ৪৯১ পৃঃ)।

*মাজার যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর যে জায়েয এই দলিলের পরেও কি কোন কথা থাকতে পারে?

যারা কোন দলিল মানেনা তাদের সাথে কোন কথাই নেই।

দলিলঃ আল্লামা ইবনে হাজর আস্‌কালানী (রঃ) বলেন: জানা দরকার যে কবর যিয়ারত (কাছে হোক আর দূরে হোক) করা মুস্তাহাব (শরহে বুখারী ফাতহুল বারী, ৩য় খন্ড, ১১৮পৃঃ)।

#দলিলঃ انى تبرك بابى حنيفة واجى الى قبره فاذا عرضت لى حاجة صليت ركعتين وسالت الله عند قبره فتقضى سريعا *অর্থাৎ, ঈমাম শাফেয়ী (রাঃ) বলেন: আমি ঈমাম আবু হানিফা (রাঃ) মাজার থেকে বরকত লাভের প্রত্যাশায় আগমন করতাম। যখন আমার কোন সমস্যা দেখা দিলে আমি ২ রাকাত নামাজ আদায় তাঁর মাজারে গিয়ে দোয়া করতাম, তখন আমার হাজত পুরণ হয়ে যাইত (ফাতুয়ায়ে শামী, ১ম খন্ড, ১৪৯ পৃ:)।

*এখানে তিনটি বিষয় লক্ষ্য করা যায়, ১/ নেক বান্দাগণের মাজারের কাছে হাজত পূরণের জন্য নামাজ পড়া যায়। ২/ বরকত হাছিলের জন্য নেক বান্দাগণের মাজারে যাওয়া জায়েয। ৩/ নেকবান্দা গণের ওছিলা দিয়ে দোয়া করা যায়।

*এ ব্যাপারে উল্লেখ আছে:

#দলিলঃ قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا *অর্থঃ তাঁরা যে কাজে (ইবাদতে) নিয়োজিত ছিল তাঁদের সেই স্মৃতির উদ্দেশ্যে মসজিদ নির্মান করবে (সূরা কাহাফ)।

*এই আয়াত দ্বারার প্রমান হয় যে, নেক বান্দার কবরের পাশে ইবাদতের জন্য ঘর বা মসজিদ তৈরী জায়েয। কারন 'আসহাফে কাহাফ' এর মাজারের কাছে মসজিদ নির্মান করা হয়েছিল ইবাদতের জন্য।

*এই আয়াতের তাফছিরে উল্লেখ আছেঃ يصلى فيه المسلمون و يتبركون بمكانهم *জনগণ সেখানে (মসজিদে) নামাজ আদায় করবে ও তাঁদের কাছ থেকে বরকত লাভ করবে। সুতরাং মাজারের কাছে বরকত হাছিলের জন্যে যাওয়া জায়েয।

দলিলঃ قال الامام غزل (رح) من يستمد فى حياتى يستمد بعد مماتى *অর্থঃ যার কাছে জিবীত অবস্থায় (যিয়ারতের মাধ্যমে) মদদ চাওয়া যায় তাঁর কাছে ইন্তেকালের পরেও মদদ চাওয়া যায় (মেসকাত, ১৫৪ পৃ: হা:; কিমিয়ায়ে সাদৎ, ২য় খন্ড, ১৬১ পৃঃ; আশিয়াতুল লুময়াত, যিয়ারত অধ্যায়)।

দলিলঃ আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী (রঃ) বলেন: রাসূল পাক (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) এর যিয়ারতে যাওয়া মুস্তাহাব আর এটা আমার কাছে বিশুদ্ধ (ফাতহুল বারী, ২য় খন্ড, ৪৩৩পৃঃ)।

দলিলঃ আল্লামা আমজাদ আলী আজমী (রঃ) বলেন, আওলিয়া কেরামের মাজার যিয়ারত করা মুসলমানের জন্য বরকতময় ও কল্যাণময় (বাহারে শরিয়ত, ১ম খন্ড)।

দলিলঃ আল্লামা জালালুদ্দিন সিয়তী (রঃ) বলেন: যদি যিয়ারত কারী কবরের কাছে কোন বেদয়াতে লিপ্ত হয় তাহলে কবর যিয়ারত নিষিদ্ধ নয় (ঈমাম সিয়তী কৃত "নূরুস সুদুর")।

#দলিলঃ মাওলানা আশরাফ আলী থানভী সাহেব বলেন: বুযুর্গানে দ্বীনের কবর যিয়ারতের নিয়তে যাওয়া জায়েয (এমদাদুন ফাতুয়া)।

উপরোক্ত দলিল গুলো দ্বারা স্পষ্ট প্রমান হয়ে যায় যে, মাজার জায়েয। কারন স্বয়ং নবী (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) কবর যিয়ারতে বের হতেন, সাহাবীগণও কবর যিয়ারতে বের হয়েছেন, যা উপরে উল্লেখিত দলিল গুলো লক্ষ্য করলেই বুজা যাবে।

মহিলাদের কবর যিয়ারত প্রসঙ্গে

মহিলাদের কবর যিয়ারত প্রসঙ্গে হাদিস শরিফে লানৎ তথা হুশিয়ারী এসেছে, তবে জেনে রাখুন! এগুলো মানছুখ বা রহিত হাদিস। প্রিয় নবীজি (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) বলেন: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها *অর্থাৎ, আমি ইতিপূর্বে তোমাদেরকে কবর যিয়ারত নিষেধ করেছিলাম এখন থেকে তোমরা কবর যিয়ারত কর (আবু দাউদ, ২য় খন্ড, ৪৬১ পৃ:; ইবনে আবী শাইবাহ, ৩য় খন্ড, ২২৩ পৃঃ; মেসকাত, ১৫৪ পৃঃ; মুসলীম, ১ম জি: হা: নং ১০৬; হাকেম শরিফ, ২য় খন্ড, ৫৩৫ পৃঃ; মেরকাত, ৪র্থ খন্ড, ২১৪ পৃ:; নাসাঈ শরিফ; মুসনাদে আহমদ, ১৪৫/১)।

*এখানে লক্ষ্যনীয় যে نهيتكم *অর্থাৎ, (আমি তোমাদেরকে নিষেধ করেছিলাম) نهيتكم দ্বারা مطلقا পুরুষ-মহিলা সকলের জন্যই নিষিদ্ধ বোজায়; আর فزوروها (এখন থেকে যিয়ারত কর) দ্বারাও পুরুষ-মহিলা সকলকেই জায়েয বুযায়। কারন এই শব্দটি কোন কিছুর সাথে مقيد বা শর্ত যুক্ত নয়।

*যদি পরবর্তীতে মহিলাদের জন্য নিষিদ্বতা থাকত তাহলে অবশ্যই মা আয়েশা (রাঃ) ও হজরাত ফাতেমা (রাঃ) প্রমূখ কবর যিয়ারতে যাইতেন না।

*এজন্যই তিরমিজিতে "মহিলা কবর যিয়ারত কারীদের উপর লানৎ" এই হাদিসের ব্যাপারে উল্লেখ রয়েছেঃ ان هذا كان قبل ان يرخص النبى صلى الله عليه وسلم فى زيارة القبور فلما رخص دخل فى رخصته الرجال و النساء *অর্থঃ এই হাদিসটি নবীজি কতৃক কবর যিয়ারতের অনুমতি প্রদানের পূর্বেকার। সুতরাং অনুমতি দানের পরে পুরুষ-মহিলা সকলেই এর অন্তর্ভূক্ত (সহি তিরমিজি শরিফ, ১ম জিঃ ২০৩-৪পৃঃ)।

#দলিলঃ عن انس قال مر النبى صلى الله عليه وسلم بامراة تبكى عند قبر فقال اتقى الله واصبرى *অর্থঃ হজরত আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করেন, একদা নবী পাক (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) পথ চলতে চলতে এমন এক মহিলার কাছে উপস্থিত হলেন যে একটি কবরের নিকট কাঁদতে ছিল। হুজুর (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) বললেন: আল্লাহকে ভয় কর ও ধৈয্য ধর (মেসকাত শরিফ, ১৫০ পৃ:; মেরকাত, ৪র্থ খন্ড, ১৮৪ পৃ:; সহি বুখারী; মুসনাদে আহমদ, ১৩০/৩; জামে তিরমিজি, হা: নং ৯৮৭; নাসাঈ; আশিয়াতুল লুমআত)।

*মহিলারা কবর যিয়ারত করাতে কোন দূষ নেই বরং বিলাপ করা নিষেধ। এজন্যেই নবীজি (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) ঐ মহিলাকে কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেননি বরং ধৈয্য ধরতে বলেছেন। যদি মহিলাদের কবর যিয়ারত নিষেধ হত তাহলে অবশ্যই নবী পাক (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) নিষেধ করতেন।

দলিলঃ والاصح ان الرخصة ثابتة لهن *অর্থঃ নিশ্চয় অধিক সহি হল মহিলাদের কবর যিয়ারত নিষিদ্ধতা রুখছত বা রহিত হয়ে গেছে (ফতুয়ায়ে শামী, ২য় খন্ড, ১৫০ পৃঃ)।

#দলিলঃ وكما تندب زيارة القبور للرجال تندب ايضا للنساء العجائز اللاتى لا يخشى منهن الفتنة *অর্থঃ পুরুষ লোকের জন্য কবর যিয়ারত যেমন মুস্তাহাব তেমনি বৃদ্ধা মহিলাদের জন্যেও কবর যিয়ারত মুস্তাহাব, যদি তাদের থেকে ফিতনার আশংকা থাকে (কিতাবুল ফেক্বহ্ আলা মাজহাবিল আরবা, ১ম খন্ড, ৪৯১ পৃ:)।

#দলিলঃ ঈমাম আহমদ রেজা খাঁ বেরলবী (রঃ) বলেনঃ কয়েকটি কারনে মহিলাদের কবর যিয়ারত মিষেধ,তবে শর্ত সাপেক্ষ জায়েয। নিষেধ করা যাবেনা আদব শিক্ষা দিতে হবে, বিলাপ কারীদের জন্য কবর যিয়ারত জায়েয নেই (আলা হজরত কৃত: 'ইরফানে শরিয়ত, ১১৯ পৃঃ)।

#দলিলঃ لا فرق فى زيارته صلى الله عليه وسلم بين الرجال والنساء *অর্থঃ নবী করিম (ছাল্লাল্লাহু আরায়হি ওয়া ছাল্লাম) এর রওজা মোবারক যিয়ারতেব ব্যাপারে পুরুষ-মহিলার কোন পার্থক্য নেই (মাওয়াহেবুল্লাদুন্নিয়া, ৪র্থ খন্ড, ৫৭৩ পৃ:)।

#দলিলঃ হানাফী মাজহাবে মহিলাদের কবর যিয়ারত জায়েয (ফতুয়ায়ে আলমগীরি) [মুসনাদে ঈমামে আজম, ২৬৮ পৃঃ]।

#দলিলঃ قال النبووى واجمعوا على ان زيارتها سنة لهم وهل تكره للنساء ؟ *অর্থঃ ঈমাম নববী (রঃ) বলেন: সকল উলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে ঐক্যমত পোষন করেছেন যে, তাদের (পুরুষের-মহিলা) জন্য কবর যিয়ারত করা সুন্নাত, তবে মহিলাদের ক্ষেত্রে মাকরুহ হবে কেন? (মেরকাত শরহে মেসকাত, ৪র্থ খন্ড, ২১৫ পৃ:)।

#দলিলঃ আল্লামা মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী (রঃ) বলেন: মহিলাদের কবর যিয়ারতের ব্যাপারে ৩টি মত পাওয়া যায়, ১/নিষেধ, ২/জায়েয, ৩/ ব্যাপক ভাবে মহিলারা কবর যিয়ারত নিষেধ, যারা ধৈয্য ধারণ করতে অক্ষম। তবে খাছ মহিলাদের জন্য কবর যিয়ারত করা জায়েয। যারা শরিয়তের বিধি বিধান সম্পর্কে জ্ঞাত আছেন ও সে অনুযায়ী আমলও করে (মেরআত শরহে মেসকাত, ২য় খন্ড, ৫২৭ পৃ: হা:)।

#দলিলঃ আল্লামা জালালুদ্দিন সিয়ূতী (রঃ) বলেন: যদি কোন বৃদ্ধ রমনী মৃত্যুর স্বরণের জন্য এবং মৃতদের সওয়াব রেছানীর জন্য যিয়ারত করে তাহলে জায়েয (নূরুছ্‌সুদুর, ২২২ পৃঃ)।

*সুতরাং মহিলাদের কবর যিয়াবত করতে হলে সম্পূর্ণ পর্দা সহকারে এবং আদবের সাথে করতে হবে। কারনঃ-

#দলিলঃ عن عائشة قالت كنت ادخل بيتى الذى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وانى واضع ثوبى واقول انما هو زوجى وابى فلما دفن عمر معهم فوالله ماد خلته الا وانا مشدودة على ثيابى حياء من عمر *অর্থাৎ, হজরত আয়েশা (রাঃ) বলেন: আমি আমার সেই ঘরে প্রবেশ করতাম যে ঘরে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) শুয়ে আছেন, অথচ তখন আমি আমার চাদর রেখে দিতাম ও বলিতাম ইনি আমার স্বামী ও অপরজন আমার আমার পিতা। কিন্তু যখন হজরত উমর (রাঃ) কে সেখানে দাফন করা হল, আল্লাহর কসম! তখন থেকে আমি কখনোও আমার শরীরে বস্ত্রে না ঢাকিয়া তথায় প্রবেশ করি নাই উমর (রাঃ) থেকে লজ্জার কারনে (মেসকাত শরিফ, ১৫৪ পৃ:; তিরমিজি; মেরকাত শরহে মেসকাত, ৪র্থ খন্ড, ২২২ পৃ:; নাসাঈ; ইবনে মাজাহ, হা নং ১৫৭৫; মুসনাদে আহমদ, ৪৪২/৩; মেরআতুল মানাজিহ)।

*সুতরাং নবীজি ও তাঁর দুই সাহাবী রওজাপাক হতেও বাইরের অবস্থা দেখেন, তাইত মা আয়েশা (রাঃ) সেখানে ঐরুপ ধারণা রেখেই প্রবেশ করতেন।

*নবী(ছাল্লাল্লাহ আলায়াহি ওয়া ছাল্লাম)এর রওজা যিয়ারতের নিয়তঃ

*আফছুছ হলেও সত্য যে একদল আবু জাহেলের দল বেড় হয়েছে, তারা বলে বেড়ায় নবী করিম (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) এর মাজার যিয়ারতের নিয়তেও যাওয়া হারাম, পীর-ফকিরের মাজার'ত দূরের কথা। এখন আমরা জানব নবী করিম (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) এর রওজা পাক যেয়ারতের নিয়তে যাওয়াব ব্যাপারে ইসলাম কি বলেঃ

#দলিলঃ عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زار قبرى وجبت له شفاعتى *অর্থাৎ হজরত ইবনে উমর (রাঃ) বলেন, নবী করিম (ছাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) বলেছেন: যারা আমার কবর শরিফ যিয়ারত করবে তার জন্য আমার শাফায়াত ওয়াজিব (দারে কুতনী শরিফ, ৩য় খন্ড, ৩৩৩ পৃ:; শিফা শরিফ, ১ম জি: ৪৪৪ পৃ:; জামেউল মাসানেদেউ ওয়াছ ছুনান, ২৮ তম খন্ড, ৭৬৮৯ পৃ:; মুসনাদে বাযযার শরিফ, মুসনাদে

ইবনে আদী, ৬/৩৫১; কানজুল উম্মাল, ১৫ তম খন্ড, ২৭৪ পৃ:; ঈমাম হায়ছামী তাঁর "মাজমুয়ায়ে জাওয়াহেদ" কিতাবের ২/৪; মাওয়াহেবুল্লাদুন্নিয়া, ৪র্থ খন্ড, ৫৭০ পৃ:; তাফছিরে দূররে মানছুর, ২৩৭/ ১; আল ঈজা ফি মানাছিকাল হাজ্জ-ঈমাম নববী (রঃ) কৃত: ৪৮৮ পৃ:; নাওয়াদেরুল উসূল, ৪৮ পৃ:; ঈমাম আল উকাইলী (রঃ) কৃত: "আদ দ্বোয়াফা" ৪র্থ খন্ড, ১৭০ পৃ:)।

*এই হাদিসের সনদ এর ব্যাপারে ঈমাম তক্বী উদ্দিন ছুবুকী (রঃ) ও ঈমাম যাহাবী (রঃ) বলেছেন ইহা সনদ "হাছান"।

** এই হাদিস দ্বারা প্রমান হয় নবীজির রওজা মোবারক যিয়ারত করলে নবীজির সাথে জান্নাকে যাওয়া যাবে, আর ওহাবীরা বলে হারাম।

#দলিলঃ عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم من زار قبرى حلت له شفاعتى *অর্থঃ হজরত ইবনে উমর (রাঃ) নবী (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেন, যারা আমার রওজা যিয়ারত করবে তার জন্য আমার শাফায়াত অবধারিত (মুসনাদে বায্যার)।

*এই হাদিসের সনদে 'আব্দুল্লাহ ইবনে ইব্রাহিম' নামক রাবী রয়েছে। যাকে ঈমাম আবু দাউদ, ইবনে আদী, ঈমাম বায্যার (রঃ) বলেছেন কোন নির্ভর যোগ্য রাবী তাঁর অনূরুপ বর্ণনা করেননি"। "আব্দুর রহমান ইবনে জায়েদ" সম্পর্কে ইবনে আদী (রঃ) "হাছান" বলেছেন আর ঈমাম হাকেম তাঁকে ছিকাহ বা বিশুদ্ধ বলেছেন। সুতরাং এই হাদিসটিকে হাছান পর্যায়ের বলা যায়।

#দলিলঃ عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جاءنى زائرا لا يعمله الا زيارتى كان حقا علي ان اكون له شفيعا *অর্থঃ হজরত ইবনে উমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) বলেছেন: যারা আমার যিয়ারতে আসবে অন্য কোন কারনে নয়, তার জন্য আমি ক্বিয়ামতের দিন শাফায়াত করা আমার জন্য আবশ্যক (দারে কুতনী শরিফ, ৩য় খন্ড, ৩৩৩ পৃ:; তাবারানী তাঁর কবিরে এবং তাবারানী তাঁর আওছাতে ৩য় খন্ড, ২৬৬ পৃ:; ফাতুয়ায়ে শামী, ৩য় খন্ড, ৫৪ পৃ:; তারিখে ইবনে আছাকির, ২য় খন্ড, ৪০৬ পৃ:; মাওয়াহেবুল্লাদুন্নিয়া, ৪র্থ খন্ড, ৫৭১ পৃ:)।

*এই হাদিসের সনদ সম্পর্কে ঈমাম সাইয়্যেদ মুহাম্মদ আলভী মালেকী (রঃ) বলেন: উসূলে হাদিসের পরিভাষায় ইহা "হাছান স্তরের"। ঈমাম বুছিরী (রঃ) একে "সহি" বলে দাবী করেছেন। তিনি বলেন ঈমাম ত্বায়ালুছী জিহালত বশত: ইহা দূর্বল সনদে বর্ণনা করেছেন, আসল কথা হল ঈমাম তাবারানী ও আবু ইয়ালা শরিফে এর বিশুদ্ধ সনদে উক্ত হাদিসের شاهد রয়েছে।

#দলিলঃ عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم من حج فزار قبرى بعد وفاتى كان كمن زارنى فى حياتى *অর্থঃ হজরত ইবনে উমর (রাঃ) নবী করিম (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) হতে বর্ণনা করেন, যারা হজ্ব করল ও আমার ইন্তেকালের পর আমার রওজা যিয়ারত করল, সে যেন আমার

জিবীত অবস্থায় যিয়ারত করল (বায়হাক্বী সুনানে কুবরা, ৫ম খন্ড, ৫৩৫ পৃ:; দারে কুতনী শরিফ, ৩য় খন্ড, ৩৩৩ পৃ:; ইবনে আদী তাঁর কিতাবুদ্ব দ্বোয়াফায়; মাওয়াহেবুল্লাদুন্নিয়া, ৪র্থ খন্ড, ৫৭১ পৃ:; তাবারানী তাঁর কবিরে, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৩৩৫ ও ২৩৩ এবং ২৯৯ পৃ: ও তাবারানী তাঁর আওছাতে, ২য় খন্ড, ৩০৭ পৃ:; কানজুল উম্মাল, ১৫ তম খন্ড, ২৭৪ পৃ:; ফাতহুল কাদির, ৩য় খন্ড, ১৬৭ পৃ:)।

*এই হাদিসের ব্যাপারে সকলেই একমত যে, সনদ দ্বায়িফ পর্যায়ের, তবে বাতিল নয়।

#দলিলঃ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زارنى فلا المدينة محسبا كان فى جوارى و كنت له شفيعا يوم القيامة *অর্থঃ রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) বলেছেন: যারা আমার মদিনায় আসবে সে আমার প্রতিবেশী হবে এবং কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য শাফায়াত কারী হব (শিফা শরিফ, ১ম জি: ৪৪৪ পৃ:; কানজুল উম্মাল, ১৫ তম খন্ড, ২৭৪ পৃ:; ঈমাম যুবাইদী তাঁর "ইত্তেহাফুছ ছাদাতুল মুত্তাক্বী" কিতাবে; তাফছিরে দূররে মানছুর, ২৩৭/১; মাওয়াহেবুল্লাদুন্নিয়া, ৪র্থ খন্ড, ৫৭২ পৃ:)।

*এই হাদিস দ্বায়িফ পর্যায়ের, তবে জাল নয়।

#দলিলঃ عن ابن عمر (رض) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج البيت ولم يزرنى فقد جفانى *অর্থঃ হজরত ইবনে উমর (রাঃ) বলেন, রাসূলে পাক (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) বলেছেন: যে ব্যক্তি হজ্ব করল কিন্তু আমার রওজা যিয়ারত করল না সে যেন আমার উপর জুলুম করল (ইবনে আদী তাঁর 'কামিল' গ্রন্থে; মাওয়াহেবুল্লাদুন্নিয়া, ৪র্থ খন্ড, ৫৭১ পৃ:)।

*এই হাদিসের সনদে 'নুমান বিন শিবল' রয়েছে যাকে ঈমাম দারে কুতনী 'মুনকার' বলেছেন। কেননা বর্ণনা কারী রাবী تفرد به هذا الشيخ। ঈমাম ত্বকী উদ্দিন ছুবকী (রঃ) এই হাদিসটি সম্পর্কে বলেন: 'ঈমাম দারে কুতনী' মুনকার কারনে, অত্র হাদিসের সনদের উপর ভিত্তি করে নয়। তাই বলা যায় হাদিসটি গ্রহন যোগ্য।

#দলিল: عن هارون بن قزعة عن رجل من ال الخطاب عن النبى صلى الله عليه وسلم قال من زارنى متعمدا كان جوارى يوم القيامة *অর্থঃ 'হারুন ইবনে কুযায়া' খাত্তাবের বংশধরের জৈনিক লোক থেকে বর্ণনা করেন, তিনি নবী (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেন, নবী করিম (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) বলেছেন যে সেচ্ছায় আমার যিয়ারত করবে সে ক্বিয়ামতের দিন আমার প্রতিবেশী হবে (আবু জাফর উকাইলী বর্ণনা করেছেন)।

*এই হাদিসের সনদে 'হারুন বিন কুযায়া' রয়েছে যা সম্পর্কে অনেকে সমালোচনা করেছেন কিন্তু ঈমাম ইবনে হিব্বান (রঃ) বলেছেন ثقة 'ছিক্বাহ'। ঈমাম ত্বকী উদ্দিন ছুবকী (রঃ) বলেন 'আলে খাত্তাব' বলতে আলে উমর (রাঃ) কে বুজাবে।

#দলিলঃ عن ابن عباس (رض) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زارنى فى مماتى كان كمن زارنى فى حياتى ومن زارنى حتى ينتهى الى قبرى كنت له يوم القيامة شهيدا او شفيعا *অর্থঃ হজরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলে পাক (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) বলেছেন: যে ব্যক্তি আমার ইন্তেকালের পর আমার যিয়ারত করল সে যেন আমার জিবদ্দশায় আমার সাক্ষাৎ করল। আর যে ব্যক্তি আমার রওজায় এসে যিয়ারত করল ক্বিয়ামতের দিন আমি তার সাক্ষী বা শুপারিশকারী হব (কিতাবুদ্ব দ্বোয়াফা; মাওয়াহেবুল্লাদুন্নিয়া, ৪র্থ খন্ড, ৫৭২ পৃ:; বায়হাক্বী)।

*এই হাদিসটি দ্বায়িফ পর্যায়ের। সর্বোপরী বলা যায় রাসূলে পাক (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) এর রওজা শরিফ যিয়ারত করা অতিব উত্তম কাজ। পৃথিবীর যেকোন জায়গা থেকে নবীজির যিয়ারতের উদ্দেশ্যে যাওয়া জায়েয।

* সওয়াল জবাবঃ

*সওয়ালঃ হাদিস শরিফে নিয়ত করে কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করা হয়েছে, যেমনঃ لا تشدر الرحال الا الى ثلاثة المساجد المسجد الحرام و مسجد الاقص و المسجد هذا *অর্থাৎ, ৩ মসজিদ ব্যাতিত সফর করনা ইহা হল মসজিদে হারাম, মসজিদে আকছা, ও আমার এই মসজিদ (বুখারী, ১ম জি: ১৫৮ পৃ:; তিরমিজি, ১ম জি:)।

*সুতরাং কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করা নিষেধ।

#জবাবঃ হাদিসে বলা হয়েছে মসজিদের কথা, আর আপনারা বলছেন কবরের কথা, বলতে পারবেন কি এই হাদিসে কোথায় কবরের কথা আছে?

*যদি এই ৩ জায়গা ব্যতিত অন্য জায়গায় সফর নিষিদ্ধ হয়, তাহলে ওয়াজ মাহফিল ও ব্যাবসা-বাণিজ্য ইত্যাদির জন্য সফরও নিষেধ হবে। অথচ পবিত্র কোরআনে ও পবিত্র হাদিসে অনান্ন সফরও প্রমানিত, যেমনঃ

#দলিলঃ لايلف قريش الفهم رحلة الشتاء و الصيف *অর্থাৎ, যেহেতু কুরাইশদের আশক্তি আছে, আশক্তি আছে শীত ও গ্রীষ্ম কালের সফরের (সূরা কুরাইশ)।

*এই আয়াত দ্বারা কুরাইশদের বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে সফর প্রমানিত হয়।

#দলিলঃ ومن يخرج من بيته مهاجر الى الله و رسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله *অর্থাৎ, যারা আল্লাহ ও রাসূলের জন্য সফর করে মুহাজির হিসেবে, অতঃপর তার মৃত্যু ঘটল, তার পুরস্কার আল্লাহর কাছে অবধারিত। এই আয়াত দ্বারাও ভিন্ন সফর প্রমানিত হয়।

#দলিলঃ واذ قال موسى لفتاه الا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين او امضى حقبا *অর্থাৎ, যখন হজরত মুসা (আঃ) তাঁর খাদিমকে বললেন আমি ততক্ষন ক্ষান্ত হবনা যতক্ষন সেখানে পৌছব, যেথায় দু'টি নদীর মিলন স্থল (আল কোরআন)। এই আয়াত দ্বারাও এলেম অর্জনের জন্য সফর প্রমানিত।

#দলিলঃ اذهبوا بقميصى هذا فالقوه على وجه ابى يات بصيرا *অর্থাৎ, আমার এই কোর্তা নিয়ে যাও আমার পিতার চোখে রাখিও তাঁর চোখ ভাল হয়ে যাবে (আল কোরআন)। এই আয়াত দ্বারা রোগের শিকার বস্ত্র নিয়ে এক দেশ থেকে অন্য দেশে সফর প্রমানিত হয়।

*এই আয়াত গুলো দ্বারা প্রমানিত যে, তিন মসজিদ ব্যতিত অন্য জায়গায় সফর করাও জায়েয।

*পবিত্র হাদিসের দৃষ্টিতেঃ

#দলিলঃ من خرج فى طلب العلم فهو سبيل الله *রাসূল (ছাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) বলেছেন: যে এলেম অন্বেষণের জন্য বের হয় সে আল্লাহর রাস্তায় রয়েছে (মিসকাত শরিফ, ৩৪ পৃ:; কানজুল উম্মাল, ১০ খন্ড, ৬০ পৃ:; তিরমিজি শরিফ, দারেমী শরিফ, ১ম খন্ড; মেরকাত শরহে মেসকাত, ১ম খন্ড, ৪৩৬ পৃ: মাসাবিহুছ সুন্নাহ, ১ম খন্ড, ৩৯ পৃ:; তিরমিজি শরিফ এলেম অধ্যায়) সনদ হাছান।

*এই হাদিস দ্বারা এলেম অর্জনের জন্য সফর করা প্রমানিত হয়।

#দলিলঃ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلب العلم ولو كان بالصين *অর্থঃ রাসূল (ছাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) বলেন, এলেম অন্বেষনের জন্যে প্রয়োজনে চীন দেশে যাও (বায়হাক্বী শুয়াইবুল ঈমাম, ২য় খন্ড, ৭২৪ পৃ:; কানজুল উম্মাল, ১০ম খন্ড, ৬০ পৃ:; তাফছিরে রুহুল বয়ান, ২য় খন্ড, ৪০২ পৃ:)।

*এই হাদিস দ্বারাও এলেম অর্জনের জন্য সফর প্রমানিত হয়।

#দলিলঃ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرجوا الى المقابر فقل السلام عليكم يا اهل الديار..... *অর্থঃ রাসূলে পাক (ছাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) বলেছেন: যখন কবর যিয়ারতে বের হবে তখন বলবে: "আছ ছালামু আলাইকুম ইয়া আহ্লে দিয়ারে..... (মুসনাদে ঈমামে আজম, সহি মুসলীম; ইবনে মাজাহ, হা: নং ১৫৪৭; মুসনাদে আহমদ, ৩৫৩/৫; আবু দাউদ, ১ম জি:; মেসকাত, ১৫৪ পৃ:; মেরকাত শরহে মেসকাত, ৪র্থ খন্ড, ২১৭ পৃ:)।

*এরূপ অনেক হাদিস রয়েছে যার দ্বারা প্রমানিত তিন স্থান ব্যতিত অন্য জায়গাই সফর করাও জায়েয। আমরা পূর্বেও অনেক হাদিস উল্লেখ করেছি যে, নবী (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) এর সাহাবীগণ কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করেছেন।

*যে সকল মৌলভীরা বলেন, তিন জায়গা ব্যতিত অন্য জায়গায় সফর নিষেধ ঐ সকল মৌলভীরাও এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ওয়াজ মাহফিল কিংবা ব্যবসা-বানিজ্য ও প্রাত্যহিক কারনে সফর করে থাকেন। তাহলে তাদের বেলায় তিন জায়গা ব্যতিত ভিন্ন জায়গায় সফর জায়েয হল,কিভাবে?

*আসল কথা হল: তিন মসজিদ ব্যতিত অন্য জায়গায় সফর নিষেধ নয়, বরং এই তিন মসজিদ ব্যতিত অন্য মজজিদে ঐরূপ অধিক সওয়াবের নিয়তে সফর নিষেধ। কারন 'কাবা শরিফে' এক রাকাত নামাজ পড়লে ১

লক্ষ রাকাতের সমান সওয়াব, মদিনা শরিফে 'নবীর মসজিদে' এক রাকাত নামাজ পড়লে ৫০ হাজার রাকাতের নামাজের সওয়াব, আর 'মসজিদে আকসায়' এক রাকাতে নামাজ আদায় করলে ২৫ হাজার রাকাতের নামাজের সওয়াব হবে (বোখারী শরিফ, ১৫৯ পৃঃ হাঃ; ইবনে মাজাহ্ শরিফ; মেসকাত মাছাজিদ অধ্যায়ে; মেরকাত)।

*এছাড়া বাকী সকল মসজিদে নামাজ পড়লে এক সমান সওয়াব অর্থাৎ এক রাকাতে ২৫ কিংবা ২৭ রাকাতের সমান সওয়াব, ইহা পৃথিবীর যে কোন মসজিদে হোক।

*এই হাদিসের ব্যাখ্যায় উল্লেখ আছে: فى شرح المسلم للنبووى قال ابو محمد يحرم شد الرحال الى غير الثلثة وهو غلط وفى احياء ذهب بعض العلماء الى الاستدلال على المنع من الرحلة لزيادة المشاهد وقبور العلماء والصلحين وما تبين لى ان الامر ليس كذالك بل الزيارة ما مور بها لخبر .... الا فزورها *অর্থঃ ঈমাম নববী (রঃ) এর শরহে মুসলীমে উল্লেখ আছেঃ আবু মুহাম্মদ বলেছে তিন মসজিদ ব্যতিত অন্য মসজিদে সফর হারাম। কিন্তু এটা ভুল ধারণা। 'এহইয়ায়ে উলুমুদ্দীন' কিতাবে রয়েছেঃ কতেক আলিম বরকতময় স্থান সমূহ ও উলামায়ে কিরামের মাজার যিয়ারত উপলক্ষ্যে সফর করা নিষেধ করেছেন। কিন্তু আমি যা বিশ্লেষণ করে পেয়েছি তা এরকম নয় বরং কবর যিয়ারতের নির্দেশ রয়েছে। যেমন হাদিস শরিফে রয়েছেঃ الا فزورها (এখন থেকে যিয়ারত কর) এই তিন মসজিদ ব্যতিত অন্য সকল মসজিদে সফর করা নিষেধ করা হয়েছে কারন অন্য সকল মসজিদের ফজিলতের দিকে সমান (মেরকাত শরহে মেসকাত, ২য় খন্ড, ৩৭১ পৃঃ; মেসকাত হাশিয়াঃ ৬৮ পৃঃ)।

*সুতরাং ঈমাম নববী (রঃ), ঈমাম গাজ্জালী (রঃ) ও আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রঃ) সকলেই একমত যে কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করা জায়েয। কারন মেরকাতের লেখক আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রঃ) ও 'এহইয়া' কিতাবের লেখক ঈমাম গাজ্জালী (রঃ)।

لا تشدروا الرحال الا الى ثلاثة المساجد

এই হাদিসে 'ইল্লা' (الا) শব্দকে 'হরফে ইস্তেস্না' (حرف استثناء) বলা হয়। 'ইল্লা' তথা হরফে ইস্তেস্নার পূর্বে বসে 'মুস্তাস্না মিনহু' (مستثناء منه) এবং পরে বসে 'মুস্তাস্না' (مستثناء)।

'ছালাছাতা حرف (استثناء) উক্ত হাদিসে 'ইল্লা' (الا) হচ্ছে 'হরফে ইস্তেস্না' মাছাজিদ' হল 'মুস্তাস্না' (مستثناء) এখানে মুস্তাস্না মিনহু' উহ্য রয়েছে। এ জাতিয় মুস্তাস্নাকে মুস্তাস্নায়ে মুফাররাগ বলে। যদি 'মুস্তাস্না' ও 'মুস্তাস্না মিনহু' এক জাতীয় হয় ইহাকে 'মুস্তাস্নায়ে মুত্তাছিল' বলে। আর যদি উভয়টি এক জাতিয় না হয় তাহলে ইহাকে 'মুস্তাস্নায়ে মুনকাতে' বলে।

আলোচ্য হাদিসে উহ্য 'মুস্তাস্না মিনহুকে' মাছাজিদ বলে উল্লেখ করেছেন মুফাচ্ছেরীনে কেরামগণ। সুতরাং ইহা 'মুস্তাস্নায়ে মুত্তাছিলে মুফাররাগ'।

*আল্লামা বদরুদ্দিন আইনী হানাফী (রঃ) বলেন: فيها تقديره لا تشد الى مسجد الا الى ثلاثة *অর্থঃ অতএব এখানে উহ্য 'মুস্তাস্না মিনহু' হল মাসজিদ অর্থাৎ তিন মসজিদ ব্যতিত অন্য কোন মসজিদের উদ্দেশ্যে সফর করার যাবেনা (উমদাদুল ক্বারী শরহে বুখারী, ৪র্থ খন্ড, ১৫৩ পৃঃ)।

*আল্লামা ইবনে হাজর আসকালানী (রঃ) বলেনঃ الا (ইল্লা) 'ইস্তেস্নায়ে মুফাররাগ' এবং উহ্য হচ্ছে لا تشد الرحال الى موضع কোন দিকে সফর করা যাবেনা। অতঃপর উল্লেখ করেন: الموضع المخصوص وهو المسجد كما سياتى *নির্দিষ্ট জায়গা সেটা হল মসজিদ (ফাতহুল বারী শরহে বুখারী, ৩য় খন্ড, ৮৪ পৃঃ)। সুতরাং ইহা 'মুস্তাস্নায়ে মুত্তাছিল'।

*আল্লামা ঈমাম কুস্তুলানী (রঃ) বলেন: اى لا تشد الرحال الى مسجد للصلوة فيه الا الى ثلاثة مساجد *নামাজ পড়ার উদ্দেশ্যে তিন মসজিদ ব্যতিত অন্য কোন মসজিদের উদ্দেশ্যে সফর করা যাবেনা (এরশাদুছ ছারী, ২য় খন্ড, ৩৪৩ পৃঃ)।

*সুতরাং হাদিসের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হল, এই তিন মসজিদ ব্যতিত অন্য কোন মসজিদের উদ্দেশ্যে (অধিক সওয়াবের আশায়) সফর করা যাবেনা। তাই যারা মসজিদ সম্পর্কীত হাদিস নিয়ে মাজারের ব্যাপারে লাগায় তারা মূর্খ-জ্ঞান পাপী ছাড়া আর কিছু নয়।

*কুরআন-সুন্নাহ এর দৃষ্টিতেঃ

*নবী ও ওলীগণ জিন্দাঃ

*আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকিদা হল:
নবী-রাসূল (আঃ) ও আল্লাহর ওলীগণ (রঃ) ইন্তেকালের পরেও স্ব-শরিরে জিন্দা। আল্লাহ পাক তাঁদের কিছু সময়ে জন্য ইন্তেকাল করান অতঃপর রুহ মোবারক আবার ফিরিয়ে দেন। এজন্যেই নবীগণের দেহ ভক্ষন করা জমিনের জন্য হারাম। এ ব্যাপারে নিচে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলঃ

*পবিত্র কোরআনে দৃষ্টিতেঃ

#দলিলঃ وسئل من ارسلنا من قبلك من رسولنا *অর্থঃ হে নবী! আপনার পূর্বে যাদেরকে রাসূল হিসেবে প্রেরণ করেছি তাঁদেরকে জিজ্ঞাসা করুন (সূরা যুখরুখ)।

*লক্ষ্য করুন, নবী (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) এর জিবীত অবস্থায় অন্য সকল নবী-রাসূলগণ শরিয়তে ইন্তেকাল অবস্থায় ছিলেন। অথচ আল্লাহ পাক নবীজিকে বলতেছেন, আপনি তাঁদেরকে জিজ্ঞাসা করুন। সুতরাং প্রমান হয়ে গেল, নবী পাক (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) এর জামানায় অন্য সকল নবীগণ যার যার মাজারে জিন্দা ছিলেন। নচেৎ নবীজি তাঁদের সাথে

কিভাবে কথা বলবেন? নাকি মৃত মানুষের সাথে আপনারা কথা বলতে পারেন? নাকি আল্লাহ মিথ্যা কথা বলেছেন? (নাউজুবিল্লাহ)

#দলিলঃ انه صلى الله عليه وسلم راى موسى عليه السلام قائما يصلى فى قبره وراه فى السماء وراه يطوف بالبيت *অর্থঃ নিশ্চয় নবী (ছাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) মুসা (আঃ) কে কবরে দাড়িয়ে দূরুদ পাঠ করতে দেখেছেন, এবং তাঁকে আকাশে দেখেছেন ও কাবা ঘর তাওয়াফ করতে দেখেছেন (সহি মুসলীম, হাঃ নং ২৩৭৫; নাসাঈ, ১৬৩৪ নং হাদিস; তাফছিরে রুহুল মায়ানী, ১৫ তম খন্ড, ৪৩৫ পৃঃ; জামেউল মাছানেদেউ ওয়াছ ছুনান)।

*এখন বলুন! একজন নবী শরিয়তের ইন্তেকালের পরে একাদারে কবর শরিফে, আসমানে ও কাবা ঘরে তাওয়াফ রত থাকেন কিভাবে? তাহলে অবশ্যই তিনি মৃত নয়।

*আরেকটি বিষয় লক্ষ্যনীয় যে, একজন নবী একই সময় একাদিক জায়গায়ও যেতে পারেন, নচেৎ মুসা (আঃ) একরাতে কিছু সময়ের মধ্যে (কবর শরিফ, আসমান ও কাবা ঘরে) এত জায়গায় গেলেন কিভাবে?

#দলিলঃ ولا تقولوا لمن يقتل فى سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون *অর্থঃ যারা আল্লাহর রাস্তায় ইন্তেকাল করেছেন তাদেরকে তোমরা মৃত বলনা, বরং তাঁরা জিবীত কিন্তু তোমরা তা বুজতে পারনা (সূরা বাকারা, ১৫৪ নং আয়াত)।

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেনঃ

#দলিলঃ ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله اموتا بل احياء عند ربهم يرزقون *অর্থাৎ, যারা আল্লাহর রাস্তায় জীবন দিয়েছে তাঁদেরকে তোমরা মৃত বলনা, বরং তাঁরা জিবীত এবং রবের পক্ষ থেকে রিজিক প্রাপ্ত (সূরা আল ইমরান, ১৬৯ নং)।

*এই আয়াত দুটো দ্বারা বুজা যায় শহীদগণ ইন্তেকালের পরেও জিন্দা। আর এ কথা সকলেই জানেন যে, প্রিয় নবীজি খায়বারের যুদ্ধের সময় বিষ পানের কারনে ইন্তেকালের সময় ঐ বিষ ক্রিয়ার ফলে প্রিয় নবীজির (ছাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) শহিদী দরজাও লাভ করেছেন। এই হেতুক আমাদের নবী (ছাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) জিন্দা। এছাড়াও অনেক নবীগণ কাফের কতৃক শহীদ হয়েছেন, তাই স্পষ্টত যে, অন্য নবীদের অনেকেই শহীদ হওয়ার কারনেও জিন্দা।

*এই আয়াতের তাফছিরঃ

#দলিলঃ الصديقون ايضا على درجة من الشهداء والصالحون يعنى الاولياء ملحقون بهم ... *অর্থঃ ছিদ্দিক বান্দারা শহীদদের মত (জিবীত) হবে। আর ছালেহীন অর্থাৎ আওলিয়াগণও তাঁদের সাথে মিলিত হবে (তাফছিরে মাজহারী, ১ম খন্ড, ১৭০ পৃঃ)।

*সুতরাং ছিদ্দিক ও ছালেহীন অর্থাৎ আওলিয়াগণ শহীদদের মতই জিবিত। সুতরাং আল্লাহর ওলীগণও জিবীত।

#দলিলঃ ان الله تعالى يعطى لارواحهم قوة الاجساد فيذهبون من الارض والسماء والجنة حيث يشاؤون وينصرون اولياءهم ويدمرون اعداءهم ان شاء الله تعالى *অর্থঃ নিশ্চয় আল্লাহ তা'লা তাঁদের রুহকে দেহের মত ক্ষমতা দান করেন, ফলে তাঁরা ঐ ক্ষমতা দ্বারা পৃথিবী, আসমান ও জান্নাতের যত্রতত্র ভ্রমন করতে পারে, আপনজন বিপদে পরলে সাহায্য করতে পারে ও দুশমনদের পর্যদস্ত করতে পারে (তাফছিরে মাজহারী, ১ম খন্ড, ১৬৯ পৃঃ)।

*এই দলিল দ্বারা বুজা যায় আল্লাহর প্রিয় বান্দাগণ ইন্তেকালের পর তাঁদেরকে আবার দেহ দান করা হয় এবং ঐ দেহ দ্বারা বিভিন্ন জায়গায় ভ্রমনও করতে পারে। তৃরিকতের ভাষায় ঐ দেহকে বলা হয় 'ওজুদ মাহব লাহ' অথবা 'তেফলুন মায়ানী'।

#দলিলঃ عن انس رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الانبياء احياء فى قبورهم ويصلون *অর্থঃ হজরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা, করেন রাসূল (ছাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) বলেছেনঃ নিশ্চয় সমস্থ নবীগণ তাঁদের মাজারে জিবীত এবং রিজিক প্রাপ্ত (বায়হাক্বী শরিফ; মুসনাদে আবী ইয়ালা; মুসনাদে আবু নুয়াইম, ২য় খন্ড, ৪৪ পৃঃ; জামেঈল মাছানেউ ওয়াছ সুনান, ৫৯০৫ পৃঃ; মেরকাত, ১০ম খন্ড, ৫৫৩ পৃঃ)। এই হাদিসটি ঈমাম জালালুদ্দিন সিয়তি (রাঃ) তাঁর 'নূরুস সূদুর' কিতাবেও এনেছেন; মাওয়াহেবুল্লাদুন্নিয়া, ৪র্থ খন্ড, ৫৮৭ পৃঃ) হাদিসের সনদ সহি।

*এই হাদিস দ্বারা সরাসরি প্রমান হয়, সকল নবীগণ (আঃ) ইন্তেকালের পরেও স্ব-শরীরে জিন্দা।

#দলিলঃ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والانبياء وانهم احياء فى قبورهم فانهم افضل من الشهداء وهم احياء عند ربهم *অর্থঃ রাসূলে পাক (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) বলেছেন, নিশ্চয় সমস্থ নবীগণ তাঁদের স্ব-স্ব মাজারে জিন্দা, আর তাঁরা শহিদগণের চেয়ে উত্তম, তাঁরা রবের পক্ষ থেকে জিবীত (ইবনে আদী; মেরকাত শরহে মেসকাত, ১০ম খন্ড, ৫৫৩ পৃঃ) হাদিসটি সহি।

*পবিত্র কোরআনে শহীদগণের সম্পর্কে বলেছেনঃ بل احياء عند ربهم يرزقون *অর্থঃ বরং তাঁরা (শহীদগণ) জিবীত ও রবের পক্ষ থেকে রিজিক প্রাপ্ত (সূরাঃ আলে ইমরান, ১৬৯ নং আয়াত)।

*সুতরাং প্রিয় নবীজি বলেছেনঃ নবীগণ শহীদ্বের চেয়ে আফদ্বাল বা উত্তম, তাই তাঁরা জিবীত আছেন ইহাই যুক্তিযুক্ত।

#দলিলঃ عن ابو دارد رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء فنبى الله حي ويرزقون *অর্থঃ হজরত আবু দারদা (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু

আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) বলেছেন: নিশ্চয় আল্লাহ নবীদের দেহ ভক্ষন করা জমীনের জন্য হারাম করে দিয়েছেন. আল্লাহর নবী জিবীত ও রিজিক প্রাপ্ত (ইবনে মাজাহ. ১১৭ পৃ:; মেসকাত. ১২১ পৃ:; তাবারানী শরিফ; মুস্তাদ্‌রাকে হাকেম. ১ম খন্ড, ৪০৫ পৃ:; মেরকাত শরহে মেসকাত; তাফছিরে ইবনে কাছির. ৩য় খন্ড, ৬২৬ পৃ:; জামেউল মাছানেদেউ ওয়াছ ছুনান, ১ম জি: ১৯৯ পৃ:; তাফছিরে মাজহারী. ৯ম খন্ড, ২৯৪ পৃ:)।

*একদা এক গ্রাম্য লোক এসে নবীজির রওজা মোবারকে আছরে পড়লেন অতঃপর রওজা পাকের কিছু ধুলা-বালি মাথায় নিলেন এবং বললেন ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আল্লাহ থেকে শুনেছেন আমরা আপনা থেকে শুনেছি, আপনি আল্লাহ থেকে বুজেছেন আমরা আপনা থেকে বুজেছি, আপনার উপর নাজিল হয়েছি:...ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءك *ইয়া রাসূলাল্লাহ! قد ظلمت نفسى وجئتك تستغفر لي *নিশ্চয় আমি নিজের প্রতি জুলুম করেছি, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার নিকট এসেছি আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। فنودى من قبر قد غفر لك*অতঃপর রওজা পাক থেকে আওয়াজ আসল তোমাকে ক্ষমা করা হয়েছে (তারিখে ইবনে আসাকির, তাফছিরে কুরতুবী শরিফ. ৫ম খন্ড, ২৩৩ পৃ:)।

*বলুন! মৃত মানুষ কি কথা বলতে পারে? কিন্তু আমদের নবী (ছাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) ইন্তেকালের পরেও রওজা পাক থেকে কথা বলেছে।

*সাঈদ ইবনে আব্দুল আজিজ (রঃ) বর্ণনা করেন, একদা সাঈদ ইবনে মুসাঈব (রঃ) [বিশিষ্ট ফকিহ তাবেঈ] 'হাররা দিবসে'(ইয়াজিদের নির্দেশে মদিনায় ৩ দিন আজান ও ইকামত বন্ধ ছিল, ঐ দিবসকে হাররা দিবস বলা হয়) নবীজির রওজা মোবারকের পাশে লুকিয়েছিল। তিনি বলেনঃ لا يعرف وقت الصلوة الا بهمهة ويسمعها من قبر النبى صلى الله عليه وسلم *ঐ সময় নামাজের সময় নির্ধারনের জন্য কোন আওয়াজ পেতাম না তবে নবীজির রওজা পাক থেকে (আযানের) গুনগুন আওয়াজ ব্যতিত (মেসকাত শরিফ, ৫৪৬ পৃ:; আল বেদায়া ওয়ান্নেহায়া, কৃত: ইবনে কাছির: দারেমী শরিফ, ১ম খন্ড. ৫৬ পৃ:: মেরকাত, ১১ তম খন্ড. ৯৬ পৃ:; মাওয়াহেবুল্লাদুন্নিয়া. ৪র্থ খন্ড. ৫৮৭ পৃ:: আশিয়াতুল লুমআত)।

#দলিলঃ قال سعيد فاستوحشت فدنوت الى القبر فلما حضرت الظهر سمعت الاذان فى القبر فصليت الظهر *অর্থাৎ, হজরত ছাইদ ইবনে মুছাইব (রঃ) বলেন: আমি নবী পাকের রওজা মোবারকের পাশে লুকিয়ে ছিলাম। যখন জোহরের ওয়াক্ত হল তখন নবী পাকের রওজা থেকে আযানের ধ্বণি আসে ফলে আমি জোহরের নামাজ আদায় করেছি (মাওয়াহেবুল্লাদুন্নিয়া, ২য় খন্ড. ৬৯৪ পৃ:)।

*এই হাদিসদ্বয় দ্বারা প্রমান হয় নবীজি রওজা মোবারক থেকে ইন্তেকালের পরেও আযান দিয়েছেন। বলুন মৃত মানুষ কি আযান দিতে পারে?

*এজন্যেই আল্লামা ঈমাম কুস্তলানী (রঃ) বলেন: انه حي فى قبره ويصلي فيه *অর্থঃ নিশ্চয় নবী পাক ছাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়া ছাল্লাম তাঁর রওজা পাকে জিবীত এবং তিনি সালাত পাঠ করেন (মাওয়াহেবুল্লাদুন্নিয়া. ২য় খন্ড. ৬৯৪ পৃ:)।

*হজরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) ইন্তেকালের পূর্বে আলী (রাঃ) কে ডেকে এনে অছিয়ত করেছিল যে, আমার ইন্তেকালের পর লাশ নিয়ে নবীজির রওজার পাশে রেখে নবীজির কাছে অনুমতি চাইবে, যদি নবীজি (ছাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) অনুমতি দেন তাহলে সেখানে আমাকে দাফন করবে। আর যদি অনুমতি না দেন তাহলে সাধারণ মুসলমানদের কবরস্থানে দাফন করে দিবে। অতঃপর তিনি ইন্তেকালের পর আলী (রাঃ) ঠিক ঐরকম বললেন, তখন রওজা মোবারক থেকে আওয়াজ আসলঃ ادخلوا الحبيب الى الحبيب فان الحبيب الى الحبيب مستقون *বন্ধুকে বন্ধুর কাছে প্রবেশ করিয়ে দাও, নিশ্চয় বন্ধু বন্ধুর জন্য দেওয়ানা (তাফছিরে কবির, ১১তম জি: ৮৮ পৃ:; খাছাইছুল কুবরা, কৃত: ঈমাম ছিয়তী (রঃ))।

*এই হাদিস দ্বারাও প্রমান হয় নবী (ছাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) ইন্তেকালের পরেও রওজা পাক থেকে কথা বলেছেন।

*হজরত আলী (রাঃ) বলেন: আমি নবীজির গোসলের সময় হাঁত মোবারক উপরে উঠাতে চাইলে তিনি নিজে থেকেই হাঁত উঠিয়ে দিতেন. (খাছাইছুল কোবরা)।

*বলুন! মৃত ব্যক্তি কি নিজের হাত নিজে উঠাতে পারে? আমাদের নবী (ছাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) উঠিয়েছেন।

#দলিলঃ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تاكل الارض جسد من كلمه رواح القدس *অর্থঃ রাসূলে করিম (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) বলেছেন: যখন কোন ব্যক্তি পবিত্র আত্মার অধিকারী হয় তখন তাঁর দেহ জমীন ভক্ষন করে না (তাফছিরে ইবনে কাছির, ৩য় খন্ড. ৬২৭ পৃ:: মাওয়াহেবুল্লাদুন্নিয়া, ৪র্থ খন্ড, ৫৮৯ পৃ: শাব্দিক ব্যবধানে)।

*আল্লাহর ওলীগণ অবশ্যই পবিত্র আত্মার অধিকারী, তাই ইন্তেকালের পরে তাঁদের দেহ জমীন ভক্ষন করবে না। সুতরাং আল্লাহর ওলীগণ স্ব-শরীরে জিবীত।

#দলিলঃ وان الارض لا تاكل اجساد الانبياء *রাসূলে করিম (ছাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) বলেছেন: নিশ্চয় নবীগণের দেহ জমীন ভক্ষন করবে না (মাওয়াহেবুল্লাদুন্নিয়া, ৪র্থ খন্ড, ৫৮৮ পৃ:)।

#দলিলঃ ان النبى صلى الله عليه وسلم حي بروحيه وجساده *অর্থঃ নিশ্চয় নবী (ছাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) দেহ ও রুহ সহকারে জিন্দা (তাফছিরে রুহুল মায়ানী. ২১তম খন্ড, ২৮৬ পৃ:)।

#দলিলঃ فهو صلى الله عليه وسلم حي فى قبرالشريف *অর্থঃ নিশ্চয় তিনি (নবীজি) তাঁর কবর শরিফে জিবীত (আল মোহাম্মাদ)। এই কিতাব দেওবন্দীদের লিখিত।

#দলিলঃ রাসূলগণ শহিদ হতে উত্তম অবস্থায় এতে কোন সন্দেহ নাই, এজন্য তাঁরা শহিদের চেয়ে অধিক জিবীত (মাওঃ ইবনে কাইয়ুম রচিত নুনিয়া কবিতা)।

#দলিলঃ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ان اولياء الله لايموت *অর্থঃ সাবধান! নিশ্চয় আল্লাহর ওলীগণের মৃত্যু নেই (মুসনাদে ফিরদাউছ, ছেররুল আছরার (শাব্দিক ব্যবধানে): তাফছিরে রুহুল বয়ান, ৫ম খন্ড, ২২৪ পৃঃ)।

*এই হাদিস দ্বারা বুঝা যায় আল্লাহর ওলীগণও ইন্তেকালের পরে জিবীত থাকেন।

#দলিলঃ عن ابى الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثروا الصلوة علي يوم الجمعة فانه مشهور يشهده الملائكة وان احدا لم يصل علي الا عرضت على صلوته حتى يفرغ منها قال قلت وبعد الموت ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء وفى اخر الحديث ما من احد يسلم علي الا رد الله علي روحي حتى ارد عليه السلام *অর্থাৎ, রাসূল (ছাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) বলেন তোমরা আমার প্রতি জুমুয়া বারে অধিক দুরুদ পাঠ করবে কেননা ইহা আমার কাছে পৌছানো হয়। সাহাবীরা প্রশ্ন করলেন ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার ইন্তেকালের পরেও? নবীজি বলেন নিশ্চয় আল্লাহ জমীনের জন্য নবীদের দেহ ভক্ষণ করা হারাম করে দিয়েছেন: আরেক হাদিসে আছে: কোন ব্যক্তি আমার উপর সালাম দিলে আল্লাহ তা'লা আমার রুহ ফিরিয়ে দিবেন এমনকি আমি তার সালামের জবাব দিব (মেসকাত, ১২১ পৃঃ; ইবনে মাজাহ, ১১৭ পৃঃ; বায়হাক্বী শুয়াইবুল ঈমান, শিফা শরিফ, ২য় জিঃ ৪৩৯ পৃঃ; মেরকাত, ৩য় খন্ড, ৯ পৃঃ; মুসনাদে আহমদ; আবু দাউদ; আত্তারগীব ওয়াত্তারহীব; বায়হাক্বী সুনানে কুবরা; জামেউল মাছানেদেউ ওয়াছ ছুনান, ১ম জিঃ ১৯৯ পৃঃ; তাফছিরে মাজহারী, ৯ম খন্ড, ২৯৪ পৃঃ; মাওয়াহেবুল্লাদুন্নিয়া, ৪র্থ খন্ড)।

*সুতরাং নবীগণ (আঃ) ইন্তেকালের পরেও স্ব-শরীরে জিবীত।

*এমনিভাবে হজরত খিজির (আঃ) একজন ওলী হয়ে এখনোও তিনি স্ব-শরিরে জিন্দা।

*প্রিয় নবীজির মেরাজের সময় বাইতুল মোকাদ্দেছে আমাদের নবীকে ঈমাম বানিয়ে সকল নবী মোক্তাদি হয়ে জামাতে নামাজ পড়েছিল। বলুন আমাদের নবীর মেরাজের সময় অন্য নবীগণ কি শরিয়তে জিবীত ছিলেন? অবশ্যই না। তাহলে ইন্তেকাল প্রাপ্ত নবীগণ এক জায়গায় একত্রে জমায়েত হইলেন কিভাবে?

*সুতরাং সকল নবী (আঃ) স্ব-শরীরে জিবীত।

#দলিলঃ عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما اسري بي مررت بموسى وهو قائم يصلي فى قبره *অর্থঃ নবী করিম (দঃ) বলেন: মেরাজের রাতে আমাকে যখন উপরে উঠানো হয় আমি মূসা (আঃ) এর কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, আমি দেখলাম তিনি দাড়ানো ও সালাত পাঠ করছেন (সহি মুসলীম; মুছান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক, ৩য় খন্ড, ৩৮৪

পৃঃ; তাফছিরে মাজহারী; জামেউল মাছানেউ ওয়াছ সুনান, ২১ তম খন্ড, ৫৮৯৫ পৃঃ; মুসনাদে আহমদ, ২৪৮/৩; তাবারানী আওছাতে, ৬ষ্ঠ খন্ড, ১০ পৃঃ; মাওয়াহেবুল্লাদুন্নিয়া, ৪র্থ খন্ড, ৫৮৭ পৃঃ) হাদিসের সনদ সহি।

*নবীগণ যদি মৃত হইত তাহলে মূসা (আঃ) কবরে দাড়িয়ে সালাত পাঠ করলেন কিভাবে?

#দলিলঃ ان الانبياء لايموتون كسائر الاحياء بل ينتقلون من دار الفناء الى دار البقاء *অর্থঃ নবীগণ জমীনে বিচরণ কৃত লোকদের মত ইন্তেকাল করে না, বরং তাঁরা 'দারুল ফানা' থেকে 'দারুল বাকায়' তাশরীফ নেন (মেরকাত শরহে মেসকাত, ১০ খন্ড, ৫৫৩ পৃঃ)।

#দলিলঃ قال النبى صلى الله عليه وسلم من صلى علي عند قبرى سمعته *অর্থঃ রাসূলে পাক (ছাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) বলেন: যে ব্যক্তি আমার রওজার কাছে এসে ছালাম দিবে আমি তা সরাসরি শুনি (মেসকাত, ৮৭ পৃঃ; বায়হাক্বী শুয়াইবুল ঈমান, ২য় খন্ড, ৬৮৭ পৃঃ; শিফা শরিফ, ২য় জিঃ ৪৩৯ পৃঃ; কানজুল উম্মাল, ১ম খন্ড, ২৪৯ ও ২৫২ পৃঃ; ঈমাম যুবাইদী তাঁর 'ইত্তেহাফুছ ছাদাতুল মুত্তাক্বীন' ২৮৯/৩; দূর্রে মানছুর, ২১৯/৫; মেরকাত, ৩য় খন্ড, ১৭ পৃঃ)।

#দলিলঃ فالانبياء احياء بعد الموت *অর্থঃ সকল নবীগণ তাঁদের ইন্তেকালের পরেও জিবীত (তাফছিরে খাজেন শরিফ, ৩য় খন্ড, ১১৭ পৃঃ)।

*যেহেতু নবীজির উপর ছালাম দিলে সরাসরি শুনেন তাই তিনি জিবীত। কারন মৃত মানুষ কি শুনতে পায়?

#দলিলঃ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الانبياء والاولياء يصلون فى قبورهم كما يصلون فى بيوتهم *অর্থঃ রাসূলে পাক (ছাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) বলেছেন: নিশ্চয় সকস্থ নবীগণ ও আওলিয়াগণ যার যার কবরে দূরুদ-ছালাম পাঠ করেন যেভাবে তাঁদের ঘরে দূরুদ-ছালাম পাঠ করত (ছেররুল আছরার, কৃতঃ গাউছে পাক আব্দুল কাদের জিলানী (রাঃ) ১২১ পৃঃ)।

*এই হাদিস দ্বারাও প্রমানিত নবী-ওলীগণ স্ব-স্ব কবর শরীফে জিবীত ও নবীজির উপর দূরুদ-ছালাম পাঠরত।

*প্রশ্নোত্তরঃ

*প্রশ্নঃ পবিত্র কোরআনে উল্লেখ আছে: انك ميت وانهم ميت *অর্থঃ নিশ্চয় আপনি মৃত্যু বরণ করবেন ও তারাও মৃত্যু বরণ করবে। এই আয়াত দ্বারা প্রমান হয় নবী পাক (ছাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) ইন্তেকাল করছেন। সুতরাং নবীজি মৃত।

*উত্তরঃ আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকিদা হলঃ রাসূলে পাক (ছাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) শরিয়তে ইন্তেকাল করেছেন কিছু সময়ের জন্যে, পরক্ষনেই নবীজির রুহ মুবারক ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে, ফলে আল্লাহর নবী (ছাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) স্ব-শরীরে জিন্দা। পবিত্র কোরআন

দ্বারাই প্রমান শহিদগণ জিবীত, অথচ তাঁরা শরিয়াতে ইন্তেকাল করেছেন। বলতে পারবেন কি শহিদগণ ইন্তেকাল করার পর আবার জিবীত কিভাবে? এর জবাব আল্লাহ তা'লা নিজেই দিয়েছেন: ولكن لا تشعرون *কিন্তু তোমরা তা বুঝনা। তেমনি ভাবে নবীগণ ইন্তেকালের পরেও স্ব-শরীরে জিন্দা কিন্তু ওহাবীরা বুঝেনা। আল্লাহর নবী (ছাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) বলতেছেন: ان انبياء احياء فى قبورهم সকল নবীগণ তাঁদের নিজ নিজ মাজারে জিবীত, ওহাবীরা বলছে নবীগণ মৃত। তাহলে আমরা কার কথা মানব, প্রিয় নবীজির নাকি ওহাবীদের?

*কুরআন-সুন্নাহর দৃষ্টিতেঃ

*ছামা ও দমের জিকিরঃ

*মুসলীম জীবনে খোদা প্রাপ্তির জ্ঞান হাছিলের জন্য ছামা ও জিকির একটি গুরুত্বপূর্ণ আমল। এই জন্যই কামেল পীর তাঁর মুরিদানদেরকে ছামা ও জিকিরের তালিম দিয়ে থাকেন। কিন্তু এরই মাঝে একদল জ্ঞান পাপীর দল আছে যারা বলে থাকেন 'ছামা বলা' কোরআন হাদিসে কোথাও নেই ইহা বেদয়াত, দমের জিকির করা বেদয়াত ইত্যাদি ইত্যাদি। এখানে দুটি বিষয়ে আলোচনা করা হল, যথাঃ ১/ ছামা, ২/ দমের জিকির।

*ছামাঃ

*ছামার আরেক নাম হল 'গান, যাকে ফারসী ভাষায় বলা হয় 'গজল'। আরবীতে তাকে 'না'ত বা হামদে বারী তা'লা' বলা হয়। গজল ও না'ত বললে জায়েয বলা হয়, কিন্তু যখন 'ছামা' বলি তখনই মুখটা মলিন হয়ে যায়। প্রাথমিক ভাবে ছামা বা গান দুই প্রকার যথাঃ জায়েয গান ও নাজায়েয গান। জায়েয গানকেই আমরা বলে থাকি ছামা। অর্থাৎ যে গানে আল্লাহ ও রাসূলের এবং পীর মুরসীদের শান বলা হয় সেটাই ছামা হিসেবে পরিচিত। যে গান দুনিয়ার কু-রিপু ও ফাহেসা কাজের প্রতি উৎসাহিত করে সে সব গান নাজায়েয। যে সব ছামা আল্লাহ, রাসূল ও ওলী আওলিয়াগণের প্রতি মহব্বত পয়দা করে সে সব ছামা নিঃসন্দেহে জায়েয। এ ব্যাপারে নিচে দলিল ভিত্তীক আলোচনা করা হলঃ

#দলিলঃ عن الربيع بنت معوذ قالت جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل على غداء بنى بى فجلس على فراشى كمجلسك منى وجويريات لنا يضربن بدفوفهن ويندبن من قتل من اباءى يوم بدر *অর্থঃ হজরত রুবাই বিনতে মুয়াইজ (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) আমার বাসর রাতের পরের দিন ভোরে আমার ঘরে এলেন, এবং তুমি (খালেদ ইবনে জাকওয়ান) আমার যতটুকু কাছে তিনি ততটুকু কাছে বিছানায় বসলেন। বালিকারা তখন তাদের দফ বাজাচ্ছিল এবং আমাদের বাপ-দাদা যারা বদর যুদ্ধে শহীদ হয়েছিল তাঁদের প্রশংসা গাঁথা

গাইছিল (সহি তিরমিজি, ১ম জি: ২০৭ পৃ:: আবু দাউদ; ইবনে মাজাহ, ১৩৮ পৃ:: সহি বুখারী)।

* এই হাদিস দ্বারা জানা যায় প্রিয় নবীজির জামানায়ও ছামার প্রচলন ছিল এবং তা দফের তালে তালে গাওয়া হত। আমরা'ত দফের তালে তালে গাইনা বরং জিকিরের তালে তালে বলি তাহলে নাজায়েয হবে কেন?

#দলিলঃ عن انس بن مالك ان النبى صلى الله عليه وسلم مر ببعض المدينة فاذا هو بجوار يضربن بدفهن ويتغنين *অর্থঃ হজরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, নবী করিম (ছাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) একদিন মদিনার পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ দেখলেন কয়েকটি বালিকা দফ বাজিয়ে গান বা ছামা গেয়ে যাচ্ছে (ইবনে মাজাহ, ১৩৮ পৃ:)।

* এই হাদিস দ্বারাও প্রমানিত হয় যে নবীজির যুগে দফের মাধ্যমে ছামা বা গান গাওয়ার প্রচলন ছিল।

#দলিলঃ عن ابن عباس قال انكحت عائشة ذات قرابة لها من الانصار فجاء رسول الله (ص) فقال اهديتم الفتاة؟ قالوا نعم قال ارسلتم معها من يغنى؟ قالت لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الانصار قوم فيهم غزل فلوبعثتم معها من يقول اتينا كم . *অর্থঃ হজরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, হজরত আয়েশা (রাঃ) তাঁর এক আত্মীয়ের বিয়ে দিচ্ছিলেন। তখন রাসূল (ছাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) এসে বললেন মেয়েটিকে তোমরা কি স্বামীর বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছ? তাঁরা বললেন হ্যাঁ। তোমরা তার সাথে এমন কাউকে পাঠিয়েছ কি যে ভাল গান গায়তে পারে? আয়েশা (রাঃ) বললেন না। নবীজি বললেন: আনসার সম্প্রদায় গানের ভক্ত, তাই তোমরা যদি তার সাথে কাউকে পাঠাতে যে গানের মাধ্যমে এই দ্বীনের কথা গুলো বলতেন (ইবনে মাজাহ, ১৩৮ পৃ:)।

*এই হাদিস দ্বারাও প্রমান হয় যে গান বা ছামার মাধ্যমে দ্বীনের কথা বলা জায়েয এবং এ ব্যাপারে প্রিয় নবীজি সমর্থক ছিলেন।

#দলিলঃ হজরত সালামা ইবনে আকুয়া (রাঃ) বলেন: খায়বারের অভিযানে আমরা রাসূল (ছাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) এর সাথে ছিলাম। আমরা রাতের বেলা পথ চলছিলাম। কোন এক ব্যক্তি আমের ইবনুল আকুয়াকে বললেন, তুমি আমাদের কবিতা ও রণ সঙ্গিত শুনাচ্ছনা কেন? আমের (রাঃ) ছিলেন কবি। তিনি সওয়ারী থেকে নেমে সবার সাথে সুরেলা কণ্ঠে গাইতে শুরু করলেন (সহি বুখারী শরিফ)।

*এই হাদিস দ্বারা বুঝা যায় সুরেলা কণ্ঠে যেকোন ভাল গান গাওয়া জায়েয, আর ঐ ভাল গানকেই আমরা 'ছামা' বলে থাকি।

#দলিলঃ عن انس قال كان للنبى صلى الله عليه وسلم حاد يقال له انجشة وكان حسن الصوت فقال له النبى صلى الله عليه وسلم رويدك يا انجشة لا تكسر القوارير *অর্থঃ হজরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলে পাক (ছাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) এর একজন হাদী ছিল, যাকে

আনজাশাহ' বলা হত। সে খুব সুন্দর কণ্ঠের অধিকারী ছিল। (একদা সে গান গাচ্ছিল) নবী (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) তাঁকে বললেন বন্ধ কর, কাঁচ গুলো ভেঙ্গে পেল না (সহি বুখারী: মেসকাত শরিফ, ৪১০ পৃ:; মেরকাত শরহে মেসকাত, ৯ম খন্ড, ৪৯ পৃ:; মুসনাদে আহমদ; দারেমী শরিফ, ২য় খন্ড, ৩৮২ পৃ:; সহি মুসলীম)।

হাদিসের ব্যাখ্যায় উল্লেখ আছে, উটের উপর বৃদ্ধ মহিলারা বসা ছিল, কারন কাঁচ বলতে রূপক অর্থে বৃদ্ধ মহিলা। আনজাশাহ ছামা টান দেওয়ার পরে ছামার তালে তালে উট গুলো হাটতে লাগল ফলে উট গুলো এত অধিক নড়া-চড়া করতে লাগল যে উটের উপর আরোহন কারী বৃদ্ধা রমনীগণ পরে যাওয়ার উপক্রম হল। তাই নবীজি তাঁকে বন্ধ করার নির্দেশ দিলেন।

*লক্ষ্য করুন! ছামার তালে তালে যদি উটের শরীর নড়া-চড়া করতে পারে তাহলে জিকির কারীর দেহ ছামা বা জিকিরের তালে তালে সামান্য নড়লে দূষ কোথায়?

হজরত হাছান বিন ছাবেত (রাঃ) মসজিদে নব্‌বীতে মিম্বরে দাড়িয়ে নবীজির শানে ছামা ও কবিতা পাঠ করতেন। এই কারনে মসজিদে নববীতে তাঁর জন্য একটি মিম্বর তৈরী করা হয়েছিল। একদিন নবীজি (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) তাঁর জন্য দোয়া করলেন, ان الله يؤيد حسان بروح القدس *নিশ্চয় আল্লাহ হাছানকে রুহুল কুদ্দুস দ্বারা সাহায্য করবে (সহি বুখারী: আবু দাউদ, হা: নং ৫০১৫; তিরমিজি, হা: নং ২৮৪৬; মুসনাদে আহমদ, ৭২/৬; মুয়াত্তায়ে ঈমাম মালেক; মেসকাত, ৪১০ পৃ:; মেরকাত শরহে মেসকাত, ৯ম খন্ড, ৪৮ পৃ:)।

*নবীজির শানে, আল্লাহর শানে ও ওলীগণের শানে যে সব শরিয়ত সিদ্ধ গান গাওয়া হয় সেটাই ছামা, যা সাহাবী হজরত হাসান বিন ছাবেত (রাঃ) গাইতেন।

#দলিলঃ عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان فى الجنة لمجتمعا للحور العين يرفعن اصوتا لم يسمع الخلائق بمثلها...... *অর্থঃ হজরত আলী (রাঃ) বলেন, রাসূল পাক (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) বলেছেন: জান্নাতে হুরগণ মাঝে মাঝে একত্রিত হয়ে সুরেলা কণ্ঠে গান গাইবে, যা কোন মানুষ কখনো শ্রবন করে নাই (তিরমিজি; তাফছিরে ইবনে কাছির, ৪র্থ খন্ড, ৩৪৭ পৃ:)।

#দলিলঃ عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ازواج اهل الجنة ليغنين ازواجهن لاحسن اصوات *অর্থঃ হজরত ইবনে উমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) বলেছেন: নিশ্চয় জান্নাতে রমনীগণ তাঁদের স্বামীর সামনে উত্তম স্বরে গান (ছামা) গাইবে (তাবারানী মুজামুছ ছাগীর, ২য় জি: ২৭০ পৃ:; মুজামুল আওছাত, ৩য় খন্ড, ৩৯১ পৃ:) সনদ সহি।

#দলিলঃ عن عائشة (رض) ان النبى صلى الله عليه وسلم مر بنساء من الانصارى فى عرس لهن وهن يغنين *অর্থঃ হজরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, নিশ্চয় রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) একদা আনছার মহিলাদের কাছ দিয়ে অতিক্রম কালে দেখেন তাঁরা গান (ছামা) গাইছেন (তাবারানী মুজামুছ ছাগীর, ১ম জি: ১৪৪ পৃ:; তাবারানী 'আওছাত গ্রন্থে' ২য় খন্ড, ৩১৫ পৃ:; হায়ছামী তাঁর 'জামে' গ্রন্থে, ৪০৭/১০) সনদ সহি।

#দলিলঃ عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الحور العين يغنين فى الجنة ...... *অর্থঃ হজরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূল পাক (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) বলেছেন: জান্নাতি হুরগণ তাঁদের স্বামীর সামনে সুরেলা কণ্ঠে গান গাইবে (মুসনাদে আবী ইয়ালা শরিফ, তাফছিরে ইবনে কাছির, ৪র্থ খন্ড, ৩৪৭ পৃ:) এরূপ আরেকটি হাদিস রয়েছে।

* এই হাদিস গুলো দ্বারা বুজা যায়, যে কোন ভাল গান বা ছামা সুরেলা কণ্ঠে গাওয়া জান্নাতী হুরদের সুন্নাত।

#দলিলঃ ان الذين امنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا এই আয়াতের তাফছিরে উল্লেখ আছে: فى شعرهم و كلامهم صحيح مكفر لما سبق *অর্থাৎ যারা শে'র বা ছামা ও কালাম দ্বারা আল্লাহর জিকির করে তাঁরা নিন্দিত নয় এবং ইহার দ্বারা পূর্বের সকল পাপ ক্ষমা হয়ে যাবে (তাফছিরে ইবনে কাছির, ৩য় খন্ড, ৪৩৬ পৃ:)।

*সুতরাং শে'র বা ছামা ও কালাম দ্বারা জিকির করা জায়েয।

* জানা যায় বিশিষ্ট সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে জাফর (রাঃ) প্রায় সময় ছামা মাহফিলে মশগোল থাকতেন, এবং হজরত আলী (রাঃ) গায়কের মাধ্যমে ছামা শুনতেন (মাদারেজুন্নবুয়ত, ২য় খন্ড)।

*তাবেঈগণের মধ্যে হজরত সাঈদ ইবনে মুসাইব (রঃ), সালিম ইবনে আব্দুল্লাহ যিনি উমর (রাঃ) এর নাতি, সাঈদ ই.নে যুবায়ের (রঃ) সহ অনেকেই দাস-দাসীদের থেকে ছামা শুনতেন (মাদারেজুন্নবুয়ত, ২য় খন্ড)।

*ঈমামে আজম আবু হানিফা (রাঃ) ও সুফিয়ান সাওরী (রঃ) কে ছামা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে উত্তরে বললেন, ছামা সগীরা বা কবিরা গোনাহ কোনটাই নয়। বর্ণিত আছে, ঈমাম আবু হানিফা (রাঃ) এর এক প্রতিবেশী প্রতিদিন গভীর রাত্রে উঠে ছামা গাইত। ঈমাম আবু হানিফা (রাঃ) মনযোগ সহকারে ইহা শুনিতেন। এক রাতে ছামার আওয়াজ না পেয়ে খবর নিয়ে দেখেন তৎকালিন পুলিশ তাকে ধরে নিয়ে গেছেন। ঈমাম সাহেব মাথায় পাগড়ী বাধিলেন ও শাসনকর্তার নিকট থেকে তাকে ছাড়িয়ে নিয়ে আসলেন (তাজকিরা, মাদারেজুন্নবুয়ত, ২য় খন্ড)।

*ঈমাম মালেক রব্বানী (রাঃ) কে ছামার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন: আমার শহরে (মদিনায়) ছামার ব্যাপারে বিরূধীতা করতে আমি কাউকে দেখিনাই। তাঁরা ছামার আসরে অংশ গ্রহন করতেন। ঈমাম মালেক

রব্বানী ও হুজ্জাতুল ইসলাম ঈমাম গাজ্জালী (রাঃ) বলেনঃ যারা অন্ধ-বধির ও যাদের স্বভাব মৃত তারাই ছামাকে অস্বীকার করে (মাদারেজুন্নবুয়াত, ২য় খন্ড)।

*আল্লামা শেখ আব্দুল হক্ব মোহাদ্দেছে দেহলভী (রঃ) বলেনঃ আমি ঈমাম শাফেঈ (রঃ) এর সমস্থ কিতাব গুলো খুজিয়াছি, তিনি ছামা নিষিদ্ধ করেছেন এমন কোথাও দেখিনাই। উস্তাদ আবুল মানছুর বাগদাদী (রঃ) বলেছেনঃ ঈমাম শাফেয়ীর মাজহাবে ছামা মুবাহ্ (মাদারেজুন্নবুয়াত, ২য় খন্ড)।

*হজরত আবুল আব্বাস ফারহানী (রঃ) বলেনঃ আমি ঈমাম আহ্মদের পুত্র সালেহ (রঃ) এর নিকট শুনেছি, তিনি বলেনঃ আমি ছামা পছন্দ করতাম কিন্তু আমার সম্মানিত পিতা ঈমাম আহমদ (রঃ) ছামা পছন্দ করতেন না। সুকণ্ঠী গায়ক ইবনে হানাদা এর নিকট থেকে কথা আদায় করলাম যে একরাতে তিনি আমার কাছে আসিয়া আমাকে ছামা শুনাইবেন। পিতাজী ঘুমিয়ে পরেছেন নিশ্চিত হয়ে আমি ইবনে হানাদাকে ছামা শুরু করতে বললাম। হঠাৎ ছাদের উপর পায়তারীর শব্দ শুনে উকি দিয়ে দেখি আমার পিতা চাঁদর গায় দিয়ে পায়তারা করতেছেন ও ছামা শুনছেন, এবং তাঁকে আবেগপ্লুত মনে হচ্ছিল (মাদারেজুন্নবুয়াত, ২য় খন্ড)।

*ইহা দ্বারা বুজা যায় ঈমাম আহ্মদের নিকট ছামা মুবাহ্ ছিল।

*হজরত দাঈদ তাঈ (রঃ) সম্পর্কে জানা যায়, তিনি ছামার মাহফিলে যাইয়া ছামা শুনিতে শুনিতে উল্লেশিত হয়ে যাইত। বয়সের ভারে তাঁর কোমর নুয়্যে হয়ে গেলেও সেই সময় সোজা হয়ে যাইত (মাদারেজ)। যেনে রাখা আবশ্যক যে হজরত দাউদ তাঈ (রঃ) ঈমামে আবু হানিফা (রাঃ) এর ছাত্র ছিলেন। যেহেতু ঈমাম আবু হানিফা (রাঃ) এর ছাত্র ছামার পক্ষে ছিলেন সেহেতু বলা যায় ঈমাম আবু হানিফা (রাঃ) ছামার পক্ষে ছিলেন।

*আল্লামা ইবনুল বার (রঃ) ছামাকে মুবাহ্ বলে ফতুয়া দিয়েছেন। বাদশা হারুনুর রশিদের দরবারে আলিমগণের মাধ্যমে ছামা পরিবেশন করা হত।

*হজরত জুনাইদ বোগদাদী (রঃ) বলেনঃ ৩ সময় সুফিগণের উপর রহমত নাজিল হয়। ১/ ক্ষুধার্থ থাকা অবস্থায়, ২/ পারস্পারিক আলোচনার সময়, ৩/ ছামা গাওয়ার সময়।

*মাওলানা রশিদ আহমদ আহমদ গাংগুহী সাহেব বলেনঃ বাদ্য-যন্ত্র বিহীন রাগ না গান শোন জায়েয। যদি গায়ক অশৃংখল না হয় ও গানের কথা শরিয়ত বিরধী না হয়। তাহলে গানের সুরে হলেও কোন ক্ষতি নেই (ফতুয়ায়ে রশিদিয়া, ৬১ পৃঃ)।

*হুজুর গাউছে পাক আব্দুল কাদের জিলানী (রাঃ) বলেনঃ একথা অবশ্যই সত্য যে বাজনা ও নৃত্যহীন আল্লাহ ও রাসূলের স্তুতি ও নাথ-হাম্দ সূচক ছেমা অত্যন্ত খালেচ ও পবিত্র দিলে করা হয় এবং অনুষ্ঠানে কোন শরিয়ত বিরধী কাজ না হয় তবে ইহা বিভিন্ন ওলী আল্লাহগণ দ্বারা স্বীকৃতি হয়েছে (গুনিয়াতুত্তালেবীন)।

*আল্লামা আহমদ রেজা খাঁ বেরেলভী (রঃ) বলেন, বাদ্য-যন্ত্র বিহীন কাওয়ালী জায়েয (ইরফানে শরিয়ত)।

*আল্লামা হাজী ইমদাদুল্লাহ মোহাজেরে মক্কী (রঃ) বলেনঃ বক্তেব সিলসিলায় ছামার প্রচলন আছে। তাই তাদের উরশ শরিফে জাউক ও সাউক বৃদ্ধির জন্যে ছামা মাহফিল হয়ে থাকে। এতে মূল উরশের ক্ষতির কিছু দেখিনা (ফায়ছালায়ে হাফ্তে মাছায়েল)।

*উল্লেখিত দলিল গুলো দ্বারা স্পষ্ট প্রমান হচ্ছে যার ইসলামী গান তথা ছামা জায়েয আছে কি-না। হাদিস গুলো দ্বারা কয়েকটির মাসালা প্রমান হয়, যথাঃ ১. দফের তালে তালে ছামা বা ইসলামী গান গাওয়া জায়েয। ২. অনেক লোক একত্রিত হয়ে ছামা গাওয়া জায়েয, কারন বালক-বালিকারা নবীজির সামনে এবং জান্নাতী হুরগণ সকলে একত্রে ছামা গেয়েছেন। ৩. ছামার তালে তালে জিকির করা জায়েয, কারন ছামার তালে তালে দফ বাজানো জায়েয হলে, ছামার তালে তালে জিকির করা জায়েয হবেনা কেন?

*যেনে রাখা আবশ্যক যে, ছামার জন্য ৬টি শর্ত আছে যথাঃ ১. ঐ মজলিসে অপ্রাপ্ত বয়স্ক লোক থাকতে পারবে না। ২. সমবেত সবাই উপযুক্ত হওয়া। ৩. ছামার নিয়ত ছহী থাকা অর্থাৎ উপার্যনের নিয়ত না থাকা ॥ ৪. শ্রোতাগণের নিয়ত সহি থাকা, অর্থাৎ খাবার ও স্বাধ গ্রহনের নিয়ত থাকিবে না। ৫. বিনা আত্মোহারায় দাড়াবে না। ৬. গান শরিয়ত বিরধী না হওয়া (ফতুয়ায়ে শামী, এহইয়াউল উলুমুদ্দিন)।

*সুতরাং উল্লেখিত শর্ত সাপেক্ষে ছামা পরিবেশন করা জায়েয।

*দমের জিকির বা ক্বালবী জিকিরঃ

* প্রথমেই জানা দরকার যে জিকির কি? জিকির হল আল্লাহর নামের স্মরণ। অর্থাৎ, শয়নে-স্বপনে, জাগরনে সব সময় আল্লাহর নামের স্বরণ করা ও তাঁর নেয়ামত রাজি নিয়ে চিন্তা করাই হল জিকির। নামাজ, রোজা তাসবীহ, কোরআন তেলাওয়াতে, নেক চিন্তা ইত্যাদি সবই জিকিরের অন্ত র্ভুক। তবে আমরা এখানে যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সেটা হল 'আল্লাহ-আল্লাহ' নামের জিকির তথা ইসমে জাত বা আল্লাহর জাতী নামের জিকির ও প্রাসঙ্গিক অন্যান্ন জিকির।

* প্রথমেই আলোচনা করি আল্লাহর নাম নিয়ে তাঁর জিকির করা যাবে কি-না।

#দলিলঃ قد افلاحا من تزكه و ذكر اسم ربه فصل *অর্থঃ আর তারাই সফলকাম যারা নিজের নফছকে পরিশুদ্ধ করেছে ও আল্লাহর নামের জিকির করেছে অতঃপর নামাজ আদায় করেছে (সূরাঃ আ'লা ১৪-১৫ নং আয়াত)।

* এই আয়াত দ্বারা প্রমান হয়ে যায় যে, আল্লাহর নামের জিকির করা জায়েয, যা পবিত্র কোরআন দ্বারা প্রমানিত। কারন বলা হয়েছে ذكر اسم ربه তাঁর রবের নামের জিকির করেছে। বলুন 'আল্লাহ' আমাদের রবের নাম নয় কি?

#দলিলঃ وﷲ الاسماء الحسن فدعوا بها *অর্থঃ আর আল্লাহর অনেক সুন্দর সুন্দর নাম রয়েছে তোমরা এগুলো দিয়ে তাঁকে ডাক (আল কোরআন)।

*আল্লাহর সুন্দর নামের মধ্যে 'আল্লাহ' হল একটি। তাই এই নামের মাধ্যমে তাঁকে ডাকা বা তাঁর জিকির করা অবশ্যই জায়েয। জিকির ও ডাকা/আহবান করা প্রায় একই কথা, কারন ডাক/আহবান করার মাধ্যমেই আল্লাহর নামের জিকির সঙ্গঠিত হয়।

#দলিলঃ يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا *অর্থঃ হে ঈমানদার সকল! আল্লাহর জিকির কর অধিক পরিমানে (সূরা আহযাব)।

* 'আল্লাহ' নামের জিকির করাই হল আল্লাহর হুকুম। আরেকটি বিষয় লক্ষ্যনীয় যে, 'আল্লাহ' এই নামের জিকির করার কথাই এই আয়াতের মূল উদ্দেশ্য, কারন আয়াতে বলা হয়েছে, اذكروا الله আল্লাহর জিকির কর।

** অনেকে হয়ত ভাবেন "আল্লাহ-আল্লাহ" বার বার বলে জিকির করা জায়েয কি-না। অর্থাৎ একটি শব্দ বার বার বলা জায়েয কি-না।

*লক্ষ্য করুনঃ

#দলিলঃ عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم الساعة على احد يقول : الله الله ..... *অর্থঃ হজরত আনাছ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) বলেছেন: ততক্ষন পর্যন্ত কেয়ামত সংগঠিত হবেনা যতক্ষন পর্যন্ত কোন ব্যক্তি 'আল্লাহ-আল্লাহ' বলবে (বায়হাক্বী শুয়াইবুল ঈমান, ১ম খন্ড, ৩৪১ পৃ:; সহি মুসলীম কিতাবুল ঈমান; মুসনাদে আহমদ, ১৬২/৩; হাকেম, ৮ম খন্ড, ৩০৩১ পৃ:; মুছান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক, ২০৮৪৭/১১; জামেউল মাছানেদেউ ওয়াছ ছুনান, ২১ তম খন্ড, ৫৮৬৯ পৃ:; তাফছিরে রুহুল বয়ান, ৯ম খন্ড, ২৩৯ পৃ:) হাদিসটি সহি।

#দলিলঃ عن عبد الله (رض) قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقوم الساعة حتى لا يقال فى الارض الله الله *অর্থঃ হজরত আব্দুল্লাহ (রাঃ) বর্ণনা করেন, তিনি বলেন আমি রাসূলে পাক (ছাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) কে বলতে শুনেছি ততক্ষন কেয়ামত হবেনা যতক্ষন পর্যন্ত লোকেরা আল্লাহ আল্লাহ (মুস্তাদরাকে হাকেম, ৮ম খন্ড, ৩০৩৩ পৃ:) সনদ সহি।

#দলিলঃ عن ثابت فى هذا الحديث لا تقوم الساعة حتى لا يقال فى الارض الله الله *অর্থঃ হজরত ছাবিত (রাঃ) এর এই হাদিস হল: ততক্ষন কেয়ামত সংগঠিত হবেনা যতক্ষন কেউ বলনে আল্লাহ আল্লাহ বলবে (শুয়াইবুল ঈমান, ১ম খন্ড, ৩৪১ পৃ:; সহি মুসলীম)।

*এই হাদিস দ্বারা বুজা যায় 'আল্লাহ-আল্লাহ' নাম একাদিক বার জিকির করা ইসলামে আছে কেননা হাদিসে আল্লাহ শব্দটি একাদিক বার উল্লেখ করা আছে, এমনকি আল্লাহ-আল্লাহ শব্দটি এর বেশী বলা যাবেনা তাও নিষেধ নেই।

#দলিলঃ عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سبح الله فى دبر كل صلوة ثلثا و ثلثين وحمد الله ثلثا و ثلثين و كبر الله ثلثا و ثلثين فتلك تسعة و تسعون وقال تمام الماءة لا اله الا الله وحده لا

شريك له له الملك وله حمد وهو على كل شئ قدير غفرت خطاياه وان كانت مثل زبد البحر *অর্থাৎ, হজরত আব হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামাজের পর ৩৩ বার সুবাহানাল্লাহ, ৩৩ বার আলহাম্দু লিল্লাহ ও ৩৩ আল্লাহু আকবার বলবে,এ হচ্ছে মোট ৯৯ বার। অতঃপর শত পূর্ণ করবার জন্য "লা ইলাহা ইল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারিকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু অহুয়া আলা কুল্লে শায়ইন ক্বাদির" তাঁর সমস্ত গোনাহ মাফ করা হবে. যদিও তা সমুদ্রের ফেনার মত হয় (সহি মুসলীম: তিরমিজি, হা: নং ৩৪৬৬; মুয়াত্তায়ে মালেক, হা: নং ২২; মুসনাদে আহমদ, ৩৭১/২; নাসাঈ শরিফ; মেসকাত শরিফ, ৮৯ পৃ:; মেরকাত শরহে মেসকাত, ৩য় খন্ড, ৪১ পৃ:)।

* লক্ষ্য করুন! 'সুবহানাল্লাহ' এই শব্দটি বার বার অর্থাৎ একাধারে ৩৩ বার বলা জায়েয, সুতরাং প্রমান হয়ে যায় যে, একটি শব্দ বার বার বলে জিকির করা জায়েয। নচেৎ নবীজি বার বার একটি শব্দের জিকির করার কথা বললেন কেন?

*এই ব্যাপারে উল্লেখ আছে, আল্লামা মুফতী শফি (রঃ) বলেনঃ বার বার "আল্লাহ-আল্লাহ" বলাও একটি এবাদত (তাফছিরে মারেফুল কোরআন, ৮ম খন্ড, ৬১০ পৃ:)।

*জিকিরের প্রকারভেদঃ

#দলিলঃ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ذكرا قسمان هو الجاهر والباطن *অর্থঃ রাসূলে পাক (ছাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) বলেছেন: জিকির দুই প্রকার যথা জাহিরী ও বাতেনী (তাবারানী শরিফ)।

* হজরত মোজাদ্দেদ আলফেছানী (রাঃ) বলেন জিকির দুই প্রকার যথাঃ জাহেরী ও বাতেনী তথা খফী (আল হাকীকিয়াতে রব্বানী)।

*সুতরাং জিকির দুই প্রকার, জাহেরী অর্থাৎ প্রকাশ্যে বা উচ্চ আওয়াজে। দ্বিতীয় প্রকার হল বাতেনী বা গোপনীয় ভাবে অর্থাৎ খফী জিকির।

*যেনে রাখা আবশ্যক যে, উচ্চ স্বরে জিকির করাও জায়েয (শর্ত সাপেক্ষ)। কারন মহান আল্লাহ পবিত্র কোরআনে বলেনঃ

#দলিলঃ فاذكروا الله كذكركم ابائكم او اشد ذكرا *অর্থঃ আল্লাহর জিকির কর যেমন তোমাদের বাপ-দাদাগণ করতেন অথবা এর চেয়েও অধিক ভাবে (সূরা: বাকারা ২০০ নং আয়াত)।

*অর্থাৎ প্রাথমিক যুগে আরব বাসীগণ মেলায় অংশগ্রহন করতেন ও পিতৃপুরুষের কীর্তিগাথা গাইতেন উচ্চ আওয়াজে। আর আল্লাহ সেই দিকেই লক্ষ্য করেই বলতেছেন তোমরা তাদের মত এরুপ কীর্তিগাথা না বলে আল্লাহর নামের জিকির কর তাদের মতই আওয়াজ করে অথবা এর চেয়েই অধিক ভাবে।

*সুতরাং প্রমান হয়ে গেল উচ্চ আওয়াজেও আল্লাহর জিকির করা জায়েয, ইহা স্বয়ং আল্লাহর নির্দেশ।

*দলিলঃ عن عبد الله بن الزبير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سلم من صلوته يقول بصوته الاعلى *অর্থঃ রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) যখন নামাজ থেকে সালাম ফিরাতেন তখন উচ্চ আওয়াজে বলতেন: لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير (সহি বুখারী শরিফ, ১ম জি: ৮৪৪ নং হা:; সহি মুসলীম; নাসাঈ; তিরমিজি; মুসনাদে আহমদ, ১৭/৩; দারেমী, ৩৫৯/১; মেসকাত, ৮৮ পৃ:; মেরকাত শরহে মেসকাত, ৩য় খন্ড, ৩৫ পৃ:)।

*উল্লেখ্য যে নামাজের পরে যে দোয়াটি প্রিয় নবীজি (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) বলতেন ইহাও একটি জিকির, আর ইহা নবীজি (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) উচ্চ আওয়াজেই করতেন।

#দলিলঃ عن ابن عباس قال كنت اعرف انقضاء صلوة رسول الله صلى الله عليه وسلم لالتكبير *অর্থঃ হজরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি তাকবীরের আওয়াজ দ্বারা হুজুর (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) নামাজের সমাপ্তি বুজতাম (সহি বুখারী, ৮৪২ নং হা:; ও মুসলীম; নাসাঈ; মেসকাত শরিফ, ৮৮ পৃ:; মেরকাত, ৩য় খন্ড, ৩৩ পৃ:)।

*দলিলঃ عن ابن عباس قال ان رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة وكان على عهد النبى صلى الله عليه وسلم *অর্থঃ হজরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন: ফরজ নামাজের পর উচ্চ স্বরে জিকির নবী (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) এর যুগেও ছিল (সহি মুসলীম শরিফ, ১ম খন্ড)।

*এই হাদিস গুলো দ্বারা প্রমান হয়ে যায় যে নবী (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) এর জামানায় উচ্চ স্বরে জিকির ছিল। সুতরাং যে কাজ স্বয়ং নবী (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) করেছেন এবং প্রিয় নবীজির সাহাবীগণ করেছেন ইহা কি নাজায়েয?

*ফকিহ্ গণের ভাষ্যঃ

#দলিলঃ الذكر برفع الصوت جائز بل مستحب اذا لم يكن عن رياء ليغتنم الناس.... *অর্থঃ উচ্চ স্বরে জিকির জায়েয বরং মুস্তাহাব, যখন কপটতা না থাকে ও দ্বীনের প্রচারের উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে (তাফছিরে রুহুল বয়ান, ২য় খন্ড, ১৭২ পৃ:)।

#দলিলঃ اما التسبيح والتهليل لا باس بذالك وان رفع صوته *অর্থঃ তাছবীহ ও তাহলীল বলার মাঝে কোন ক্ষতি নেই যদিও উচ্চ স্বরে হয় (ফতুয়ায়ে আলমগীরি)।

#দলিলঃ فقال بعض اهل العلم ان الجهر افضل *অর্থঃ অনেক আহলে এলেম বলেন: উচ্চ স্বরে জিকির উত্তম (ফতুয়ায়ে শামী, ২য় খন্ড, ৪৩৪ পৃ:)।

*মাওলানা রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী সাহেব বলেনঃ যে সকল জায়গায় উচ্চ স্বরে জিকির করার প্রমান পাওয়া যায় সে সকল জায়গা ব্যতিত উচ্চ স্বরে জিকির করা মাকরুহ তবে সাহেবাইন [ঈমাম আবু ইউছুফ ও ঈমাম মুহাম্মদ (রঃ)] এর মতে জায়েয (ফতুয়ায়ে রশিদিয়া, ৩য় খন্ড, ১০৪ পৃ:)।

* আল্লামা ঈমাম আহমদ রেজা খাঁ বেরলভী (রঃ) বলেনঃ উচ্চ স্বরে জিকির জায়েয তবে খেয়াল রাখতে হবে যে কোন নামাজী, রোগী ও শয়নকারীর যাতে কোন ক্ষতি না হয় (আহকামে শরিয়ত, ১৬৬ পৃ:)।

*সুতরাং প্রমান হয়ে যায় যে, উচ্চ স্বরে জিকির করা জায়েয তবে কোন ধরনের কপটতা ও লোক দেখানো ভাব থাকবে না এবং জিকিরের কারনে যেন কোন নামাজীর নামাজে, অসুস্থ ব্যক্তি ও শয়নকারীর যেন কোন ক্ষতি না হয়।

*জাহেরী জিকির বলতে সাধারণত বুজায় যে, প্রকাশ্যে 'আল্লাহ-আল্লাহ' জিকির করা।

*এছাড়াও আরো জিকির রয়েছে, যথাঃ

*জিকিরের বর্ণনাঃ

#দলিলঃ اعلم ان الذكر ثلاثة مراتب: احدها الجهر و ورفع الصوت ...... ثانها الذكر باللسان سرا ...... ثلثها الذكر بالقلب والروح والنفس وغيرها *অর্থঃ যেনে রাখা আবশ্যক যে জিকির তিন ধরনের, প্রথমত: জাহেরী ও উচ্চ আওয়াজে।..... দ্বিতীয়ত: জিহবা যোগে ও গোপনে।..... তৃতীয়ত: ক্বালব, রুহ, নাফছ ইত্যাদি যোগে (তাফছিরে মাজহারী, ৩য় খন্ড, ৩৮৬ পৃ:)।

**প্রথমত: (الذكر الجهر) জাহেরী জিকির হল প্রকাশ্যে জিকির, যেমন উচ্চ স্বরে 'আল্লাহ-আল্লাহ' বলা অথবা যে কোন জিকির উচ্চ স্বরে করা।

**দ্বিতীয়ত:(الذكر باللسان) জিহবা যোগে জিকির করা। এ ধরনের জিকিরের ব্যাপারে প্রিয় নবীজি রাসূলে করিম (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) বলেনঃ

#দলিলঃ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله *অর্থঃ রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) বলেন: আল্লাহর জিকির করতে করতে তোমাদের জিহবা যেন তাজা হয়ে থাকে (তিরমিজি শরিফ, ২য় জি: ১৭৫ পৃ:; কানজুল উম্মাল, ১ম খন্ড, ২১৮ পৃ:; শুয়াইবুল ঈমান, ১ম খন্ড, ৩৩৮ পৃ:; ইবনে মাজাহ, তাবারানী 'আওছাতে' ১ম খন্ড, ৬১৮ পৃ:; মুসনাদে আহমদ, ১৭৭১৫ নং হা:; তাফছিরে মাজহারী, ৩য় খন্ড, ৩৮৬ পৃ:; মেসকাত, ১৯৮ পৃ:; মেরকাত, ৫ম খন্ড, ১৬১ পৃ:)।

#দলিলঃ قيل اي الا عمال افضل؟ قال ان تفارق الدنيا ولسانك رطب من ذكر الله *অর্থঃ নবীজিকে জিজ্ঞাসা করা হয়, ইয়া রাসূলাল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) আল্লাহর কাছে পছন্দনীয়? নবীজি বলেন: এমন ভাবে দুনিয়া থেকে বের হয়ে যাও যেন তোমার জিহবা আল্লাহর জিকিরে তাজা হয়ে থাকে (শুয়াইবুল ঈমান, ১ম খন্ড, ৩৩৭ পৃ:; কানজুল উম্মাল, ১ম খন্ড, ১১৪ পৃ:; তাফছিরে মাজহারী, ৩য় খন্ড, ৩৮৬ পৃ:; মুসনাদে আবু আওয়ানা; মেসকাত শরিফ, ১৯৮ পৃ:; মেরকাত, ৫ম খন্ড, ১৫৪ পৃ:; দারেমী শরিফ, ৩৯৮/২; মুসনাদে আহমদ, ৪৩/৫; কানজুল উম্মাল, ২য় খন্ড, ১১০ পৃ:; জামেউছ ছাগীর, ১ম জি: ১৯ পৃ)।

#দলিলঃ عليك بمجالس اهل الذكر واذا خلوت فحرك لسانك ما استطعت بذكر الله *অর্থঃ প্রিয় নবীজি (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) বলেন: তোমরা নিয়মিত ভাবে জিকিরের মজলিসে যোগদান কর, যখন একাকী হও তখন যথাসম্ভব আল্লাহর জিকিরে জিহবা তাজা রাখ (বায়হাক্বী শরিফের শুয়াবুল ঈমান, ১ম খন্ড: তাফছিরে মাজহারী, ৪র্থ খন্ড, ৩৪৮ পৃ: সূরা ইউনূছের ৬২ নং আয়াতের তাফছিরে)।

#দলিলঃ طوبى لمن مات ولسانك رطب من ذكر الله *অর্থঃ তাঁর জন্যে সুসংবাদ যে মারা গেল অথচ তাঁর জিহ্বা আল্লাহর জিকিরে তাজা হয়ে রইল (তাফছিরে কবির শরিফ, ১ম খন্ড, ২০৪ পৃ:)।

#দলিলঃ احب اعمال الى الله تعالى ان تموت ولسانك رطب من ذكر الله *অর্থঃ রাসূলে পাক (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) বলেছেন: সবচেয়ে উত্তম আমল হল এমনভাবে মৃত্যু বরন কর যেন আল্লাহর জিকিরে জিহবা তাজা হয়ে থাকে (কানজুল উম্মাল, ১ম খন্ড, ২১৩ পৃ:; ইবনে সুন্নি হজরত মুয়াজ (রাঃ) হতে)।

*উল্লেখিত দলিল গুলো প্রমান হয়ে যায় যে, জিহবা যোগে জিকির করা সুন্নাত ও প্রিয় নবীজির শিক্ষা যা পবিত্র হাদিস দ্বারা প্রমানিত। সুতরাং কেউ যদি ব্যবসাও করল এবং জিহবা যোগে গোপনে জিকির করল, রাস্তা দিয়ে হাটতে হাটতে জিহবা যোগে জিকির করল, কোথাও বসে রইল আবার জিহবা যোগে আল্লাহর নামের জিকির করল, তাতে ক্ষতি কি?

**তৃতীয়ত: (الذكر بالقلب والروح والنفس وغيرها) ক্বালব, রুহ ও নাফ্ছ ইত্যাদি দ্বারা জিকির করা। তাফছিরে মাজহারীতে উল্লেখ আছে, الذى لا مدخل فيه للسان وهو الذكر الخفى *অর্থঃ যে জিকিরে জিহবার কোন ভূমিকা নেই সেই জিকিরের নাম খফি জিকির (তাফছিরে মাজহারী, ৩য় খন্ড, ৩৮৬ পৃ:)।

*অর্থাৎ ঠোট ও জিহবা বন্ধ করে শুধু দমে দমে যে জিকির করা হয় তাকেই খফি জিকির বলে। আর খফি জিকিরের ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন,

#দলিলঃ ادعوا ربكم تضرعا وخفية *অর্থঃ তোমরা তোমাদের রবকে ডাক বিনীত ভাবে ও খফি বা দমে দমে (সূরা আরাফ, ৫৫ নং আয়াত)।

* এই আয়াতে স্পষ্ট উল্লেখ আছে খফি জিকিরের কথা। আর খফি জিকির-ত তাকেই বলে যা ঠোট ও জিহ্বা ব্যতিত দমে দমে করা হয়।

*অপর আয়াতে আমার আল্লাহ বর্ণনা করেন,

#দলিলঃ اذكر ربك فى نفسك تضرعا وخفية *অর্থঃ তোমরা নিজেরা জিকির কর বিনীব ভাবে ও খফি বা দমে দমে (আল কোরআন)।

* এই আয়াতে খফি জিকির করার কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে। আর খফি জিকিরত তাকেই বলে যা ঠোট ও জিহবা বন্ধ করে শ্বাস দ্বারা দমে দমে করা হয়।

*দমের জিকিরের ফজিলত:

#দলিলঃ عن سعد بن ابى وقاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير الذكر الخفى *হজরত সাদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: আমি রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) কে বলতে শুনেছি, সবচেয়ে উত্তম জিকির হল খফি বা দমে দমে জিকির করা (আত্তারগীব ওয়াত্তারহীব; বায়হাক্বী শুয়াইবুল ঈমান, ১ম খন্ড, ৩৫০ পৃ:; মুসনাদে আহমদ, ১৮০/১; মুসনাদে আবী ইয়ালা, ৭৩১/২; তাফছিরে রুহুল মায়ানী, ১৬ তম খন্ড, ৬৬৯ পৃ:; সহি ইবনে হিব্বান, ৮৯/২; মুছন্নাফে ইবনে আবী শায়বাহ, ১৩৬/৮; ফতুয়ায়ে শামী, ২য় খন্ড, ৪৩৪ পৃ:; তাফছিরে মাজহারী, ৩য় খন্ড, ৩৮৬ পৃ: ও ৯ম খন্ড, ২৯৯ পৃ:; কানজুল উম্মাল, ১ম খন্ড, ২১৩ পৃ:) হাদিসটি সহি।

*এই ব্যাপারে আরোও হাদিস উল্লেখ আছে: *আল্লামা মুফতী আব্দুল লতিফ (রঃ) বলেন: নিম্ন লিখিত নিয়মে আল্লাহর ইছিমের জিকির করা যায়, চক্ষুদ্বয় ও উষ্ঠদ্বয় বন্ধ করে ক্বালবের ভাষায় বলিবে....(আনোয়ারুছ ছালেকিন, ৭৮ পৃ:)।

*এই ব্যাপারে আরোও উল্লেখ আছে,

#দলিলঃ ذكر الله اشارة ثلاث مراتب: اولاها: الذكر باللسان وثانيتها: التفكربا لقلب وثالثها: المعرفة بالروح لان ذكر اللسان يصل صاحبه الى ذكر القلب فهو الفكر في قدرة الله وذكر القلب يوصل الي مقام الروح فيعرف فى ذلك حقاءق الاشياء .... *অর্থঃ আল্লাহর জিকির তিন রকমে করা যায়, প্রথমত: জিহবা যোগে। দ্বিতীয়ত: ক্বালবের প্রতি ধ্যান করে। তৃতীয়ত: রুহের পরিচয়ের মাধ্যমে, কেননা জিহবা দ্বারা জিকির ছালেক কে ক্বালবী জিকিরে পৌছে দেয়। অতঃপর সে আল্লাহর কুদরত নিয়ে ধ্যান করে। ক্বালবের জিকির পৌছে দেয় মকামে রুহে, অতঃপর সে সকল কিছুর হাকিকত জানতে পারে (তাফছিরে রুহুল বয়ান, ২য় খন্ড, ১৭১ পৃ:)।

*এই দলিল দ্বারাও জানা যায় যে, ক্বালবের প্রতি ধ্যান করে আল্লাহর জিকির করা যায়, এবং ঐ জিকির দ্বারাই সকল কিছুর হাকিকত জানা সম্ভব।

*সুতরাং খফি জিকির তথা ঠোট ও জিহবা বন্ধ করে ক্বালবের প্রতি ধ্যান করে দমে দমে জিকির করা অবশ্যই জায়েয। কারন ইহা মহান আল্লাহর নির্দেশ। এই খফি জিকিরের ব্যাপারে প্রিয় নবীজি (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) বলেছেন:

#দলিলঃ عن عائشة رضى الله عنها ان النبى صلى الله عليه وسلم قال: الذكر الذى يسمعه الحفظة يزيد على الذكر الذى لا يسمعه الحفظة سبعين ضعفا *অর্থঃ হজরাত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন, নিশ্চয় নবী করিম (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) বলেছেন: যে জিকির আমল নামার ফেরেস্তারা শুনে এবং যে জিকির আমল নামার ফেরেস্তারা শুনেনা এর মধ্যে মর্যাদার ব্যবধান হল ৭০ গুন বেশী (বায়হাক্বী শুয়াইবুল ঈমান, ১ম খন্ড, ৩৫১ পৃ:; মুসনাদে আবী ইয়ালা, ৪৭৮৩/৮; কানজুল উম্মাল, ১ম খন্ড, ২২৭ পৃ:;

মজমুয়ায়ে জাওয়াইদ, ৮১/১০; ইবনে আবী দুনিয়া; জামেউছ ছাগীর, ২য় জিঃ ২৬৫ পৃ:)।

*অর্থাৎ, যে জিকির আমল নামার ফেরেস্তারা বুজেনা তা হল খফি জিকির। যেমন উল্লেখ আছে: وهو الذكر الخفى الذي لا يسمعه الحفظة *অর্থঃ আর ইহাই জিকিরে খফি যা আমল নামার ফেরেস্তারাও বুঝেনা (তাফছিরে মাজহারী, ৩য় খন্ড, ৩৮৭ পৃ:)।

*আর খফি জিকিরের মর্যাদা জাহিরী জিকিরের তুলনায় ৭০ গুন বেশী সওয়াব।

#দলিলঃ عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لفضل الذكر الخفي الذي لا يسمعه الحفظة سبعون ضعفا *অর্থঃ হজরাত আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলে করিম (ছাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) বলেছেন: খফি জিকিরের মর্যাদা ৭০ গুন বেশী, আর ইহা আমল নামার ফেরেস্তারাও বুঝে না (বায়হাক্বী শুয়াইবুল ঈমান, ১ম খন্ড, ৩৫১ পৃ:; মুসনাদে আবী ইয়ালা, ৪৭৮৩/৮; কানজুল উম্মাল, ১৭৫০/১; হায়ছামী তার 'মজমুয়ায়ে জাওয়ায়েদ' ৮১/১০; তাফছিরে মাজহারী, ৩য় খন্ড, ৩৮৬ পৃ:)।

*এই হাদিস দ্বারা বুজা যায় যে, খফি জিকির আমল নামার ফেরেস্থারাও বুঝে না, তাহলে সাধারণ মানুষ বুঝবে কিভাবে? এ জন্যে দমের জিকিরের সময় যদিও 'হু-হু' আওয়াজের মত হয়, ইহা দুনিয়ার মানুষ না বুঝলেও তাতে অসুবিধা নেই, কারন প্রিয় নবীজি (ছাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) বলেছেন: এই জিকির আমল নামার ফেরেস্তারাও বুঝেনা, তাহলে ওহাবীরা বুজবে কিভাবে?

*অপর হাদিসে নবীজি (ছাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) বলেছেন,

#দলিলঃ وجائت الحفظة بما حفظوا وكتبوا قال: لهم انظروا هل بقي له من شئ؟ فيقولون: ما تركنا شيئا مما علمنا وحفظناه الا قد احصينا وكتبنا فيقول الله تعالى ان له حسنا لا تعلمه واخبرك به هو الذكر الخفي *অর্থাৎ হাশরের ময়দানে ফেরেস্তারা আসবে ও যা তাঁরা সংরক্ষন করেছেন তা নিয়ে। আমল নামা দেওয়ার পরে আল্লাহ তাঁদের বলবেন: আরোও নেকী বাকী আছে কি? ফেরেস্তারা আশ্চর্য্য হয়ে বলবে হে রব! আমরা যা যা শুনেছি সবই লেখেছি। তখন আল্লাহ তা'লা বিশাল বড় সওয়াবের পাঁহাড় দেখিয়ে বলবেন এগুলো আমার বান্দার নেকী, যা তোমরা জাননা, তোমরা যেনে রাখ ইহা খফি জিকির। (মুসনাদে আবু আওয়ানা শরিফ, তাফছিরে মাজহারী, ৩য় খন্ড, ৩৮৬ পৃ:)।

*সুতরাং দমে দমে জিকির করতে হবে এত কেউ বুঝুক আর নাই বুঝুক। কারন এই জিকির একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কেউ বুঝে না। এজন্যই দয়াল নবী রাসূলে পাক (ছাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) বলেন:

#দলিলঃ عن ابى سعيد الخدرى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اكثروا ذكر الله حتى يقولوا مجنون *অর্থঃ হজরত আবু ছাইদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করেন, নিশ্চয় রাসূলে করিম (ছাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়া ছাল্লাম)

বলেছেন: তোমরা এমন ভাবে জিকির কর যেন লোকেরা পাগল বলে (মুসনাদে আহমদ, কানজুল উম্মাল, ১ম খন্ড, ২১৪ পৃ:; শুয়াইবুল ঈমান, ১ম খন্ড, ৩৪১ পৃ:; মুস্তাদ্রাকে হাকেম শরিফ, ২য় খন্ড, ৭০২ পৃ:; কাশফুল খফা, ১ম খন্ড, ১৫০ পৃ:) সনদ সহি।

* এই হাদিস দ্বারা প্রমান হয় লোকেরা এমন জিকিরও আছে যে জিকির করলে মানুষ পাগল বলবে। সুতরাং, ওহাবীরা পাগল বললেও জিকির বাদ দেওয়া যাবে না।

#দলিলঃ عن ابى الجوزاء رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثروا ذكر الله حتى يقول المنافقون: انكم مراؤون *অর্থঃ হজরত আবুল জাওযা (রাঃ) বলেন, রাসূলে পাক (ছাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) বলেছেন: তোমরা এমন ভাবে জিকির কর যেন মোনাফেকরা বলে যে তাঁরা দেখানোর জন্য জিকির করছে (বায়হাক্বীর শুয়াইবুল ঈমান, ১ম খন্ড, ৩৪১ পৃ:; কানজুল উম্মাল, ১ম খন্ড, ২১৩ পৃ:; তাবারানী তাঁর কবিরে, ১২৭৮৬/১২; আবু নুয়াইম তাঁর 'হুলিয়াতে' ৮০/৩; হায়ছামী তাঁর 'মজমুয়ায়ে জাওয়ায়েদ'-এ ৭৬/১০)।

*সুতরাং জিকিরের লক্ষ্য যদি আল্লাহর খুশি হয় তাহলে জিকিরের কারনে যদি লোকেরা তিরস্কারও করে ক্ষতি নেই। কিন্তু জিকির যদি আল্লাহ ব্যতিত অন্য কারো জন্য হয় তখন শিরিক হতে। মূলত শুধু জিকির নয় বরং যে কোন আমলই মানুষকে দেখানোর জন্য করা যাবে না। তাইত প্রিয় নবীজি বলেন:

#দলিলঃ عن شداد بن اوس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى يرائى فقد اشرك ومن صام يرائى فقد اشرك ومن تصدق يرائى فقد اشرك *অর্থঃ হজরত শাদ্দাদ ইবনে আওস (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি মানুষকে দেখানোর জন্য নামাজ পড়ে সে শিরিক করল, যে লোকদের দেখানোর জন্য রোজা রাখল সেও শিরিক করল ও যে লোকদের দেখানোর জন্য দান-সদকা করল সেও শিরিক করল (মুসনাদে আহমদ; তাফছিরে মাজহারী, ৫ম খন্ড, ৪২৯ পৃ:)।

**সুতরাং প্রমান হয়ে গেল ঠোট ও জ্বিহবা বন্ধ করে দমে দমে আল্লাহর নাম জিকির করা যায়। যদিও ইহা দেখে মোনাফেকরা তিরস্কার করবে।

*লক্ষ্যনীয় যে, দমের জিকির দুই রকমে করা যায়, যথাঃ ১. আওয়াজহীন ভাবে, ইহা একা একা জিকির করার সময়। ২. সামান্য জলী তথা আওয়াজের সাথে, ইহা মজলিসের সময়। জিকিরের সময় বিনা জযবায় দাড়ানো যাবে না।

*জিকিরের সময় হাঁত-মাথা ও শরীর নড়াঃ

**সাধারণত জিকিরের সময় মাথা নড়া ইহা জিকিরের ইস্কের কারনে হয়ে থাকে। যদি কাউকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, জিকিরের সময় মাথা নাড়ানো কোথায় আছে? তাহলে জবাব হবে ইহা ইস্কের কারনে আসে। যেমনি ভাবে

পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করার সময় মাথা নড়া-চড়া করে থাকে। কোরআন তেলাওয়াতের সময় যেমন মাথা নাড়ানো আনতে হয়না, এমনিই এসে যায়; তেমনি জিকিরের সময়ও মাথা নাড়ানো আনতে হয়না, এটা এমনি'ই এসে যায়।

*এখন প্রশ্ন হবে, ইস্কের কারনে মাথা নাড়ানো যাবে এরূপ দলিল আছে কি-না।

*জবাব হবে আছে,

#দলিলঃ عن انس قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة لعبت الحبشة بحرابهم فرحا لقدومه *অর্থঃ হজরত আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করেন, যখন প্রিয় নবীজি (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) মদিনা শহরে প্রবেশ করলেন, তখন মদিনার হাবশী লোকেরা নবীজির আগমনের আনন্দে বর্শা হাঁতে (শরীর হেলিয়ে-দুলিয়ে) নেচে ছিল (আবু দাউদ, হা: নং ৪৯২৩; মেসকাত, ৫৪৭ পৃ:; মেরকাত, ১১ তম খন্ড, ১০৮ পৃ:; আশিয়াতুল লুমআত)।

*এই হাদিস দ্বারা প্রমান হয়ে যায়, নবীজির আগমনের আনন্দে তথা ইসকে শরীরের অঙ্গ-প্রতঙ্গ নাড়িনো ক্ষতিকারক কিছু না। যদি ক্ষতিকারক হত তাহলে নবীজি ঐ হাবশী সাহাবীদের এরূপ করমে নিষেধ করতেন।

*পূর্বেও আমরা উল্লেখ করেছি নবী করিম (ছাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) এর সামনে বালক বালিকারা দফ বাজিয়ে ছামা বা ইসলামী গান গেয়েছেন। দফ বাজাতে হলে অবশ্যই হাঁত ও শরীরের কিছু অংশ নড়ে। বলুন! নবীজির সামনে হাঁত ও শরীরের অংশ নাড়িয়ে ছামা গাইল ও দফ বাজাল, অথচ নবীজি (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) নিষেধ করলেন না কেন? সুতরাং বুজা গেল বিশেষ কিছু সময় ইসকের কারনে হাঁত, মাথা ও শরীরের কিছু অংশ নড়া-চড়া করলে কোন ক্ষতি নেই।

*পূর্বে আমরা আরোও উল্লেখ করেছি, রাসূলে পাক (ছাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়া ছাল্লাম)এর উটের হাদী 'আনজাসাহ' নবীজির উট টানার সময় ছামা গাইতেন, ফলে ঐ ছামার তালে তালে উট গুলো হেলিয়ে দুলিয়ে হাটতে লাগলেন। সুতরাং ছামার তালে তালে হেল্যানো দুলানো প্রিয় নবীজি (ছাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) এর যুগেও ছিল।

*এই ব্যাপারে আল্লামা শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ মোহাদ্দেছ দেহলভী (রঃ) বলেনঃ জিকিরের সময় ৪ দিকে মাথা নাড়ানো যাবে, যথা উপরে, নিচে; ডানে-বামে (আল ক্বাউলুল জামিল)।

#দলিলঃ হজরত আতা (রঃ) বর্ণনা করেন: উবায়দ ইবনে উমর (রাঃ) বলেছেন: হজরত দাউদ (আঃ) বাজনা বাজাতেন এবং তালে তালে ক্বিরাত পড়তেন। এতে সুরের মধ্যে লহর সৃষ্টি হত ফলে তিনিও কাঁদতেন ও শ্রোতাদেরকেও কাঁদাতেন (আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া, ২য় খন্ড, ৩২ পৃ:; কৃত: ইবনে কাছির (র:)।

*হজরত দাউদ (আঃ) যদি বাজনার তালে তালে ক্বিরাত পাঠ করতে পারেন, তাহলে আমরা ছামার তালে তালে আল্লাহর জিকির করতে পারবনা কেন?

*ছওয়াল-জবাবঃ

*ছওয়ালঃ ইসলাম ধর্মে গান বা সঙ্গিতের কোন স্থান আছে?

*জবাবঃ ইসলাম ধর্মে ফাহেসা গানের কোন স্থান নেই, কিন্তু ইসলামী সঙ্গিত তথা আল্লাহ-রাসূলের স্তুতি ইত্যাদির স্থান অবশ্যই ইসলাম ধর্মে রয়েছে। যুদ্ধের ময়দানে সাহাবীগণ রণ সঙ্গিত গেয়েছেন। বালক-বালিকারা নবীজির সামনে দফ বাজিয়ে ইসলামী সঙ্গিত গেয়েছেন। হজরত হাসান বিন ছাবেত (রাঃ) মসজিদে নববীতি মিম্বরে অসংখ্য সাহাবীর সামনে এমনকি স্বয়ং রাসূলে পাকের সামনে কবিতা ও নবীজির শানে ছামা পেশ করতেন। হজরত হাছান বিন ছাবেত (রাঃ) এর লিখিত একটি কিতাবও আছে যার নাম 'দেওয়ানে হাছান' যার ভিতর নবীজির শানে অনেক সঙ্গিত রয়েছে।

*এমনকি বেহেস্থের ভিতর হুরগণ তাঁদের স্বামীর সামনে সুরেলা কণ্ঠে সঙ্গিত পেশ করবেন, যা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। সুতরাং ইসলাম ধর্মে ফাহেশা গান বা সঙ্গিতের কোন স্থান নেই, তবে আল্লাহ-রাসূলের শানে সঙ্গিত এবং আল্লাহর ওলীগণের, মা-বাবার শানে ইত্যাদি ছামা বা ভাল গান পরিবেশন করা জায়েয (বাদ্য যন্ত্রবিহীন)।

*ছওয়ালঃ মুখ বন্ধ করে দমে দমে জিকির করা কি কুরআন হাদিস সমর্থন করে?

*জবাবঃ আমরা পূর্বে এরূপ অনেক দলিল উল্লেখ করেছি যে, মুখ বন্ধ করে দমে দমে জিকির করা যাবে, আর এরূপ জিকির কে নবীজি উত্তম জিকির বলেছেন। আমরা হাদিস আরোও উল্লেখ করেছি মুখ বন্ধ করে জ্বিহবা যোগে জিকিরের এবং মুখ ও জ্বিহবা বন্ধ করে শুধু দমে দমে জিকিরের। হরদম হর নিঃশ্বাষে তথা প্রত্যেক নিঃশ্বাষে আল্লাহর জিকির করাই হল আল্লাহর ওলীগণের ত্বরিকা। প্রয়োজনে উপরে উল্লেখিত দলিল গুলো আবার চোখ বুলিয়ে দেখুন।

*ছওয়ালঃ মুখ বন্ধ করে জ্বিহবা যোগে কিংবা মুখ ও জ্বিহবা বন্ধ করে শুধু দমে দমে আল্লাহর নবী (ছাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) জিকির করেছেন কি?

*জবাবঃ আমাদের জানা দরকার হাদিস ৩ প্রকার, যথাঃ ১. ক্বাওলী, ২. ফেলী, ৩. তাক্বরীরি।

*প্রিয় নবীজি যে কাজ নিজে করেছেন তা হল ফেলী হাদিসের ভাষ্য। নবীজি যা বলেছেন তা হল ক্বাওলী হাদিসের ভাষ্য। নবীজি (ছাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) যা সমর্থন করেছেন তা হল তাকরীরি। এই ৩ ধরণের হাদিসের প্রতি বিশ্বাস করা ও আমল করা জায়েয, কোনটাকে এনকার বা অবমাননা করা যাবে না।

*দমে দমে জিকির ও মুখ বন্ধ করে জ্বিহবা যোগে জিকিরের ব্যাপারে অনেক ক্বাওলী ও তাক্বরীরি হাদিস উল্লেখ করেছি। এখন বলুন! নবীজির

ক্বাওলী ও তাক্বরীরি হাদিস কি আপনারা মানেন না? সর্বাবস্থায় কাওলী হাদিসকে প্রাধান্য দিতে হয়। আমরা জানি আল্লাহর নবী (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) যে কোন কাজের নির্দেশ দেওয়ার পূর্বে নিজে ঐ কাজ করতেন। যেমন, এক মহিলার ছেলে বেশী বেশী মিষ্টি জাতিয় দ্রব্য খাইতেন। নবীজির কাছে আসার পর একে একে ৩ সপ্তাহ ঘুরিয়ে শেষে বললেন যাও আর মিষ্টি দ্রব্য খাবে না। মহিলা নবীজিকে জিজ্ঞাসা করলেন হুজুর এই কথা-ত প্রথম যেদিন এসেছিলাম সে দিনই বলতে পারতেন। নবীজি উত্তরে বললেন: আমি নিজেও মিষ্টি দ্রব্য খাই, তাই না খেয়ে থাকা যায় কি-না আমি এত দিন তা পরীক্ষা করলাম।

*সুতরাং নবীজি যে কোন কাজের নির্দেশ দেওয়ার পূর্বে ঐ কাজ নিজেও করতেন। তাই দমের জিকির ও মুখ বন্ধ করে জিহবা যোগে জিকির নিশ্চয় নবীজি নিজে আমল করতেন।

*ছওয়ালঃ জিকিরের সময় মাথা নাড়ানো জায়েয, এটা কোন কিতাবে রয়েছে?

*জবাবঃ আপনি নিশ্চয় হাফেজী মাদ্রাসা দেখেছেন? হাফেজ সাহেব বা কোরআন তেলাওয়াত কারী যখন তেলাওয়াত করেন, তখন তাঁরা মাথা ও শরীর হেলিয়ে-দুলিয়ে তেলাওয়াত করেন, বলুন ইহা কোন কিতাবে আছে?

*কোরআন তেলাওয়াত কারী মাথা ও শরীর নাড়ানো আনতে হয়না বরং ইহা এমনিতেই এসে যায়। তেমনি ভাবে জিকির কারী জিকিরের সময় মাথা ও শরীর নাড়ানো আনতে হয়না বরং ইহা এমনিতেই এসে যায়। আর এটাই হল ইশ্ক বা মহব্বত, যাকে রহমতের ঢেউ বলা চলে। এজন্যই মদিনার আনছারীগণ নবীজির মদিনায় আগমনের আনন্দে বল্লম হাঁতে নিয়ে ছামা গেয়েছেন আর শরীর হেলা-দুলা করে নেচেছেন।

ঃপবিত্র নছিহত শরিফের হাদিস সমুহেরঃ

*কিতাবী হাওলাঃ

*একশ্রেণীর অজ্ঞ লোকের আবির্ভাব হয়েছে যারা বলে বেড়ায়, বিশ্ব ওলী খাজাবাবা ফরিদপুরী (রাঃ) এর পবিত্র নছিহত শরিফের উল্লেখিত হাদিস সমূহ জাল, বানোয়াট, ভিত্তীহীন ও কোন কিতাবে নেই, আবল-তাবল ইত্যাদি ইত্যাদি। তাদের এই ভ্রান্ত ধারণার জবাবেই আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াশ। আশা করি এই কিতাবটুকু অধ্যায়ন করার পর তারা বিশ্ব ওলী খাজাবাবা ফরিদপুরী (কুঃ ছেঃ আঃ) এর নছিহতের হাদিস সমূহের ব্যাপারে খারাপ ও কটু মন্তব্য করবেনা।

মেনে রাখা আবশ্যক যে, বিশ্ব ওলী খাজাবাবা ফরিদপুরী (রাঃ) বিশ্বের সকল ওলীগণের সর্দার ও আহলে কাশফের অন্তর্ভূক্ত। আর আহলে কাশ্ফ তথা অন্তর দৃষ্টির ব্যাপারে সয়ং আল্লাহ নিশ্চয়তা দিয়েছেন, যেমন: ان في ذلك لآيةً للمتوسمين *অর্থঃ আর অন্তরদৃষ্টি সম্পন্ন লোকদের জন্য এতে রয়েছে নিদর্শন (সূরাঃ হিজর)। রাসূলে পাক (দঃ) অন্তর দৃষ্টির ব্যাপারে সমর্থন

করেছেন, যেমন: اتقوا فراسة المؤمن *অর্থঃ তোমরা মু'মিনের অন্তরদৃষ্টিকে ভয় কর (জামে তিরমিজি; তাবারানী)। তাই তিনি কোন হাদিসের ব্যাপারে বলেছেন : 'রাসূলের হাদিস' সেখানে মন্তব্য করার পূর্বে অন্তত লেখা পড়া করার দরকার। কারন আমাদের এলেম শরিয়তের কিতাবেই সীমাবদ্ধ, আর আল্লাহর ওলীগণের তথা আমার খাজাবাবার জ্ঞান হল আল্লাহ প্রদত্ব। তাই তাঁদেরকে শিক্ষা দেয় সয়ং আল্লাহ ও তাঁর পেয়ারা রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) । তাঁরা অন্তর দৃষ্টিতে হাদিস সম্পর্কে আমাদের চেয়ে বহু গুণ বেশী জানেন।

*নিচের দলিল গুলো ভাল করে লক্ষ্য করুনঃ

قال رسول الله (ص) اول ما خلق الله نوري

*অর্থাৎ হুজরত নবী করিম (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) বলেন: আল্লাহ পাক সর্ব প্রথম আমার নূর সৃষ্টি করেছেন।

* তাফছিরে রুহুল মায়ানী, [আল্লামা আবুল আলুছি বাগদাদী আল হানাফী (রঃ) কৃত:] ৮ম খন্ড ৪২৪ পৃ:; ১ম খন্ড, ৯০ পৃ: ।
* কাশফুল খফা, [আলবানী কৃত:] ১ম খন্ড ২৩৭ পৃ:;
* তাফছিরে রুহুল বয়ান, [আল্লামা ঈমাম ইসমাইল হাক্কী (রঃ) কৃত:] ২য় খন্ড, ৪২৯ পৃ: ।
* তাফছিরে মাআরেফুল কোরআন, [আল্লামা মুফ্তী শফী (রঃ) কৃত:] সূরা আনআমের শেষের দিকে।
* মাদারেজুন্নবুয়ত, [আল্লামা শেখ আব্দুল হক্ মোহাদ্দেস দেহলভী (রঃ)] ১ম খন্ড, ৭ পৃ: ।
* তাফছিরে নিছাফুরী, وجئنا بك على هؤلاء شهيدا এই আয়াতের ব্যাখ্যায়।
* ছেররুল আছরার, [কৃত: গাউছে পাক আব্দুল কাদের জিলানী (রা:)] ৪৮ পৃ:;

قال رسول الله (ص) من عرف نفسه فقد عرف ربه

#অর্থাৎ হুজরত রাসূলে পাক (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) বলেছেন: যে নিজকে নিজে চিনল সে রবকে চিনিল।

* তাফছিরে রুহুল বয়ান, [কৃত: আল্লামা ঈমাম ইসমাঈল হাক্কী (রঃ)] ১ম খন্ড, ২৭১ পৃ: ও ৩০৮ পৃ:, ৫ম খন্ড, ২২৭ পৃ:, ৬ষ্ঠ খন্ড,৩৯৩ পৃ: ।
* তাফছিরে কাবির শরিফ, [কৃত: আল্লামা ঈমাম ফখরুদ্দিন রাজী (রাঃ)] ৩০তম খন্ড,২০১ পৃ:(সূরা কিয়ামাহ্র শুরুতে), ৩য় খন্ড, ১১৭ পৃ: ।
* ছেররুল আছরার, ৫৯ পৃ: [কৃত: গাউছে পাক আব্দুল কাদের জিলানী (রা:)]
* কাশফুল খফা (২৫৩২ নং হাদিস)।
* জিয়াউল কুলুব, ৭১ পৃ: কৃত: হাজী এমদাদুল্লাহ মোহাজেরে মক্কী (রঃ);

*লক্ষনীয় যে, এই হাদিসটি দুই রকমে বর্ণিত আছেঃ-

*প্রথমঃ قال امير المؤمنين علي بن ابى طالب رضى الله عنه من عرف نفسه فقد عرف ربه *অর্থাৎ, হজরত আলী (রাঃ) হতে; যা তাফছিরে রুহুল বয়ানে, ৬ষ্ঠ খন্ডে ৩৯৩ পৃ: উল্লেখ আছে।

*দ্বিতীয়তঃ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرف نفسه فقد عرف ربه *অর্থাৎ, রাসূলে পাক (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) হতে; যা তাফছিরে রুহুল বয়ানে ১ম খন্ডে ও ৫ম, ৬ষ্ঠ খন্ডে উল্লেখ আছে।

*একদিকে ইহা হাদিসে রাসূল, অন্যদিকে ইহা হজরত আলী (রাঃ) এর 'কউল' হিসেবে হাদিস।

*কেউ কেউ এই হাদিসটুকুকে ঈমাম নিছাপুরী (রঃ) এর 'কউল' হিসেবে উল্লেখ করেছেন। (দেখুন: আনওয়ারুছ ছালিকীন, ১৭ পৃ:)। ঈমাম নিছাফুরী (রঃ) ইহা বলেছেন ঠিকই তবে রাসূলের হাদিস উল্লেখ না করার কারনে অনেকে তাঁর কউল হিসেবে ধরে নিয়েছেন। মূলত ইহা নবী পাকের হাদিস।

*[বিঃ দ্রঃ ইবনে তাইমিয়া {যে সর্ব প্রথম নবীজির রওজা যিয়ারত (নিয়ত করে) হারাম ফতুয়া দিয়েছিল}, সে ও তার সাংগ-পাংগরা এই হাদিসটিকে জাল বলে বেড়াচ্ছে, অথচ শাইখুল আকবার আল্লামা ঈমাম মহি উদ্দিন ইবনুল আরাবী (রাঃ) এই হাদিসটিকে বিশুদ্ধ বলে অভিমত পেশ করেছেন। আল্লামা ঈমাম ফখরুদ্দিন রাজী (রাঃ) ও আল্লামা ঈমাম ইসমাঈল হাক্কী (রঃ) উনারা ইহা 'হাদিস' বলে তাদের কিতাবে উল্লেখ করেছেন। যাদের পায়ের ধুলার সমানও তারা হতে পারবে না। ওহাবীরা আল্লাহর ওলীগণের কাশফ তথা অন্তর দৃষ্টি বিশ্বাস করেনা, অথচ পবিত্র কোরআন ও হাদিসে কাশফের কথা প্রমান রয়েছে।]

كنت كنزا مخفيا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لأعرف

*অর্থাৎ, আল্লাহ তা'লা বলেন: আমি গুপ্ত ধণভান্ডার ছিলাম অতঃপর আমার ভিতর পরিচিত হইবার প্রেম জাগল অতঃপর সৃষ্টিকে সৃষ্টি করার মাধ্যমে পরিচিত হইলাম।

* তাফছিরে আবু ছাউদ, [কৃতঃ ক্বাজী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মুস্তফা হানাফী(রঃ)] ২য় খন্ড, ২০৫ পৃ:।

*তাফছিরে কবির শরিফ, [কৃতঃ আল্লামা ঈমাম ফখরুদ্দিন রাজী (রাঃ)], ২৮তম খন্ড, ২১৫ পৃ:।

* তাফছিরে রুহুল মাআনী, [কৃতঃ আল্লামা আবুল আলুছী বাগদাদী আল হানাফী (রঃ)] ২৭তম খন্ড, ৩০ পৃ:।

* ছেররুল আছরার, [কৃতঃ গাউছে পাক আব্দুল কাদের জিলানী (রা:)] ৫৪ পৃ:;

* তাফছিরে রুহুল বয়ান, [কৃতঃ আল্লামা ঈমাম ইসমাঈল হাক্কী (রঃ)], ১ম খন্ড, ১২৯ পৃ:।

* মাওজুআতুল কবির, ৯৩ পৃ: হাদিসটি উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন: لكن معناه صحيح *অর্থঃ কিন্তু এর মায়ানা সহি। এরপর উল্লেখ করেন: (وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون) اى ليعرفون كما فسره ابن عباس (رض)

*মাকাছিদুল হাছানাহ, ৩২৭ পৃ:;

*সুতরাং এই হাদিসের 'মায়ানা' হজরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর তাফছিরের সাথে মিল রয়েছে।

তদাপিও বিশ্বনন্দিত ঈমাম ও মোফাচ্ছেরগণ যারা 'আহলে ক্বাসফের' আলিম ছিলেন তাঁদের কিতাবে ইহাকে 'হাদিস' বলে উল্লেখ করেছেন, তাই এর পরে আর কোন কথা চলে না।।

*এই হাদিসের ব্যাপারে 'তাফছিরে রুহুল মায়ানীতে' উল্লেখ আছে: وانه ثابت كشفا و قد نص على ذلك الشيخ الاكبر قدس سره *অর্থঃ নিশ্চয় ইহা ক্বাসফের দ্বারা প্রমানিত। শায়খুল আক্‌বার ঈমাম মহিউদ্দিন ইবনুল আরাবী (কু: ছে:) এ ব্যাপারে নছ তৈরী করেছেন (তাফছিরে রুহুল মায়ানী, ২৭ তম খন্ড, ৩০ পৃ:)।

*যখন 'ক্বাসফের দ্বারা' ইহা প্রমানিত হয়ে গেছে এবং ঈমামগণ ইহা গ্রহন করেছেন তখন এর উপর 'হাদিস নয়' এরকম কটূক্তি করা যুগের ঈমামগণের কটূক্তির নামান্তর, আর হাদিস শরিফে রয়েছে: ومن اهن العلم فقد اهن النبى صلى الله عليه وسلم *যারা আলিমগণকে তিরস্কার করে তারা যেন নবীজিকে তিরস্কার করল (তাফছিরে কবির, ২য় খন্ড, ১৮৯ পৃ:)।

অনেকে বলতে পারেন এই হাদিসের 'সনদ' নেই, তাদেরকে বলব সহি বুখারী শরিফেও অনেক হাদিস রয়েছে যেগুলোর কোন 'সনদ' নেই অর্থাৎ 'তালিক' রুপে বর্ণিত। তবে ঈমাম বুখারী (রঃ) এর পরহেযগারী ও আমলের উপর নির্ভর করে সকলেই এই হাদিস গুলোকে সহি ধরে নিয়েছেন। তেমনি ভাবে এই হাদিসটি ঈমামগণের পরহেযগারী ও যোগ্যতার উপর নির্ভর করে গ্রহন করা হয়েছে। রাসূলে পাক (দঃ) বলেছেন: ما راى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن *অর্থঃ মুসলমানগণের কাছে যা উত্তম বা গ্রহন যোগ্য আল্লাহর নিকটও তা পছন্দনীয় বা গ্রহন যোগ্য (তাফছিরে কবির; রুহুল বয়ান)।

قال رسول الله (ص) لا صلوة الا بحضور القلب

*অর্থাৎ, হুজুরী দেল ব্যতিত নামাজ হবে না।

* জামেঈল মাছানেদেউ ওয়াস সূনান, [কৃতঃ হাফেজুল হাদিস আবুল ফিদা আল্লামা ইবনে কাছির (রঃ)]।

* কানজুল উম্মাল, [কৃতঃ আল্লামা আলাউদ্দিন আলী ইবনে হুছামুদ্দিন হিন্দী; ওফাত: ৯৭৫ হি:] ৭ম খন্ড, ২১৩ পৃ:।

* মুসনাদে ফিরদাউস, [কৃত: আল্লামা ঈমাম দায়লামী (রঃ)]।

*এহইয়াউল উলুমুদ্দিন, [কৃতঃ ঈমাম গাজ্জালী (রাঃ)] সালাত অধ্যায়।

* ছেররুল আছরার, [কৃতঃ গাউছে পাক আব্দুল কাদের জিলানী (রা:)] ১১৯ পৃ::

*জায়ান হক্ব, ২য় খন্ড [কৃত: আল্লামা আহমদ ইয়ার খান নঈমী (রঃ)]।
* ফিয়াউল কুলুব, ৮৬ পৃ: কৃত: আল্লামা হাজী এমদাদুল্লাহ মোহাজেরে মক্কী (রঃ);
*এ ব্যাপারে 'ফতুয়ায়ে শামী' কিতাবে একটি বাব রয়েছে এভাবে: مطلب حضور القلب ২য় খন্ড।

*এরই প্রেক্ষিতে উল্লেখ আছে: عن بشر الحافي انه قال: من لم يخشع فسدت صلاته *অর্থঃ হজরত বশীর হাফি (রঃ) [তিনি ঈমাম আহমদ (রঃ) এর পীর এবং একজন বিশিষ্ট তাবেঈ] বলেনঃ যার খুশু তথা হুজুরী দেল নেই তার নামাজ ফাছেদ (তাফছিরে কবির শরিফ, ২৩ তম খন্ড, ৭৪ পৃ:)।
[বিঃ দ্রঃ- এই হাদিস খানার সনদ গ্রহন যোগ্য]

رجعنا من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاكبر

*অর্থাৎ, রাসূলে পাক (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) বলেন: আমরা ছোট জিহাদ হতে বড় জিহাদে প্রত্যাবর্তন করছি।
* তাফছিরে রুহুল বয়ান, [কৃত: আল্লামা ঈমাম ইসমাঈল হাক্কী (রঃ)] ১ম খন্ড, ১৫৮ পৃ:, ২য় খন্ড,১৪৮ পৃ:।
* তাফছিরে কবির, [কৃত: আল্লামা ঈমাম ফখরুদ্দিন রাজী (রঃ)] ১১তম খন্ড, ৯ পৃ:, ২৩ তম খন্ড, ১৮১ পৃ:।
* খতিবে বোগদাদী তাঁর 'তারিখে'- হজরত জাবের (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন।
* যায়ফুজ জামে কিতাবে, (৪০৮০ নং হাদিস)।
* কাশফুল খফা, ১ম খন্ড, ৩৭৫ পৃ: (১৩৬০ নং হাদিস)।
* ছেররুল আছরার, [কৃত: গাউছে পাক আব্দুল কাদের জিলানী (রা:)] ৭৯ পৃ:;
* মুকাশাফাতুল কুলুব, ১ম খন্ড;

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تخلقوا باخلاق الله

*অর্থাৎ, রাসূলে পাক (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) বলেছেন: তোমরা আল্লাহর চরিত্রে চরিত্রবান হও।
* তাফছিরে রুহুল বয়ান, [কৃত: আল্লামা ঈমাম ইসমাঈল হাক্কী (রঃ)] ৫ম খন্ড, ৪৪৮ পৃ: ও ৫৪৪ পৃ:।
* তাফছিরে রুহুল মায়ানী, [কৃত: আল্লামা আবুল আলুছী বাগদাদী আল হানাফী (রাঃ)] ৩০ তম খন্ড, ৫০২ পৃ:।
* তাফছিরে কবির শরিফ, [কৃত: আল্লামা ঈমাম ফখরুদ্দিন রাজী (রাঃ)] ৭ম খন্ড, ২৬ পৃ:; ৯ম খন্ড, ৫৫ পৃ:; ২৪ তম খন্ড, ১৭৩ পৃ:; ১১তম খন্ড, ৫১ পৃ:।
* ছেররুল আছরার, [কৃত: গাউছে পাক আব্দুল কাদের জিলানী (রা:)] ১২৩ পৃ:;

قال رسول الله (ص) علماء امة كالانبياء بنى اسرائيل

*অর্থাৎ, রাসূলে করিম (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) বলেছেন: আমার উম্মতের আলিমগণ বনী ঈসরাইলের নবীদের মত।
* তাফছিরে রুহুল বয়ান, [কৃত: আল্লামা ঈমাম ইসমাঈল হাক্কী (রঃ)] ১ম খন্ড, ১৮৪ পৃ:; ৪র্থ খন্ড, ৭৬ পৃ:।
* তাফছিরে কবির, [কৃত:আল্লামা ঈমাম ফখরুদ্দিন রাজী (রাঃ)] ২৭তম খন্ড, ১১১ পৃ:।
* কাশফুল খফা।
* মাকাছিদুল হাছানাহ, [কৃত: আল্লামা ঈমাম ছাখাবী (রঃ)]।

এই হাদিসটি নিয়ে অনেকে সমালোচনা করে যে, মওজু এই সেই ইত্যাদি। কিন্তু এই হাদিসটি গ্রহন যোগ্য। কারন হাশরের দিন এই নবীর উম্মতের মর্যাদার আসন দেখে অন্য নবীগণ ও শহিদগণ ঈর্ষা করবে, যার এবারত এরুপঃ عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله (ص) ان من عباد الله لاناسا ما هم بانبياء ولا شهداء يغبطهم الانبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله .... [আবুদাউদ শরিফ, হজরত ইবনে উমর (রাঃ) হতে, তাফছিরে মাজহারী, ৪র্থ খন্ড, ৩৪৭ পৃ: সূরা ইউনূছের ৬২ নং আয়াতের তাফছির; বায়হাক্বী তাঁর শুয়াইবুল ঈমান, ৬ষ্ঠ খন্ড, ২৯৯০ পৃ:; আবু নুয়াইম তাঁর হুলিয়াতে, ৫/১; তাফছিরে দুর্রে মানছুর]

*বলুন! এই হাদিস দ্বারা কি এই নবীর উম্মতের মর্যাদা ঐরুপ প্রমান হয়না?

*আপনারা সকলেই জানেন, অন্য নবীগণ আমাদের নবীর উম্মত হওয়ার জন্য আকাঙ্খা করতেন। এর মাঝে হজরত ঈসা (আঃ)-ই শেষ যুগে আমাদের নবীর উম্মত হবেন। তাহলে বলুন! আমাদের নবীর উম্মত বনী ঈসরাইলের সমান মর্যাদা সম্পন্ন হবে কিনা? (যদিও তাঁরা নবী নয়)।

*এই নবীর উম্মতের মর্যাদা মহান আল্লাহ নবীদের সমান দিবেন তার আরো প্রমানিত হয় এই হাদিস দ্বারাঃ عن عقبة بن عامر قال قال النبى (ص) لو كان بعدى نبى لكان عمر بن الخطاب * অর্থাৎ, আমার পরে যদি কেউ নবী হতেন তাহলে উমর-ই হইতেন (তিরমিজি শরিফ; মেসকাত, ৫৫৮ পৃ:; মেরকাত শরহে মেসকাত; আশিয়াতুল লুমআত)।

*হজরত উমর যদিও নবী নয়, কিন্তু কামালতে নবুয়ত তাঁর মাঝে রয়েছে। সুতরাং এই নবীর উম্মতের মর্যাদা বনী ঈসরাইলের নবীদের মতই।

*তাফছিরে রুহুল বয়ানে উল্লেখ আছে: নবী করিম (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) علماء امتى كانبياء بنى اسرائيل এই হাদিসের সত্যতা প্রমানের জন্য মেরাজের রাতে ঈমাম গাজ্জালী (রঃ) কে হজরত মুসা (আঃ) এর সামনে হাজির করালেন। মুসা (আঃ) বললেন: আপনার নাম কি? উত্তরে ঈমাম গাজ্জালী নিজের নাম, পিতার নাম, দাদার নাম, পৈর দাদার নাম এমনিভাবে ছয় পুরুষের নাম বললেন। আমি শুধু আপনার নাম জিজ্ঞাসা করেছি আপনি এত নামের তালিকা পেশ করলেন কেন? ঈমাম গাজ্জালী (রঃ)

আদবের সাথে জবাব দিলেন, আড়াই হাজার বছর পূর্বে আপনিও তো আল্লাহ তা'য়ালার ছোট্ট একটি প্রশ্নের জবাবে দীর্ঘ উত্তর দিয়েছিলেন। অর্থাৎ, আল্লাহ আপনাকে জিজ্ঞাসা করেছিল আপনার হাঁতে কি? উত্তরে আপনি বলেছিলেন, আমার হাঁতে লাঠি, ইহা দ্বারা গরু রাখি, গাছের পাতা পারি, এই সেই ইত্যাদি। হুজুর এত কথা বলার দরকার ছিল কি?

হজরত মুসা (আঃ) এই নবীর উম্মতের এলেম ও প্রজ্ঞা দেখে আশ্চয্য হয়ে এই নবীর উম্মতের মর্যাদা মেনে নিলেন (তাফছিরে রুহুল বয়ান, প্রিন্সিপ্যাল জলীল সাহেব (রঃ) কৃতঃ 'নুর নবীঃ পৃঃ ৯৬')।

اصحابي كانخوم لايهم اقتديتم اهتديتم

*অর্থাৎ, রাসূলে করিম (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) বলেছেনঃ আমার সাহাবীগণ আকাশের তারকার মত, তাঁদের যে কাউকে অনুসরণ করলে হেদায়াতের রাস্তা পেয়ে যাবে।

* মেসকাত শরিফ, ৫৫৪ পৃঃ।
* মেরকাত, ১১ তম খন্ড, ১৬৩ পৃঃ [কৃতঃ আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রঃ)]।
* আশিয়াতুল লুমআত, [কৃতঃআল্লামা শেখ আব্দুল হক্ব মোহাদ্দেসে দেহলভী (রঃ)]।
* তাফছিরে কবির শরিফ, [কৃতঃ আল্লামা ঈমাম ফখরুদ্দিন রাজী (রাঃ)] ২৫তম খন্ড,১৮৯ পৃঃ; ২৭ তম খন্ড, ১৪৮ পৃঃ; ১১তম খন্ড, ১৬৩ পৃঃ।
* তাফছিরে রুহুল মায়ানী, [কৃতঃ আল্লামা ঈমাম আবুল আলুছী বাগদাদী (রাঃ)] ১২তম খন্ড, ৫১৩ পৃঃ; ২৫ তম খন্ড, ৪৪ পৃঃ।
* কাশফুল খফা, ১ম খন্ড, ১১৮ পৃঃ, হাদিস নং-৩৮১।
* দায়লামী শরিফ, হজরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে।
* দারে কুতনী শরিফ।
* তাফছিরে রুহুল বয়ান, ৯ম খন্ড, ২৩৮ পৃঃ ৫ম খন্ড, ৮১ পৃঃ;
* ছেররুল আছরার, [কৃতঃ গাউছে পাক আব্দুল কাদের জিলানী (রাঃ)] ৫১ পৃঃ;
* শিফা শরিফ, ২য় জিঃ ৪১২ পৃঃ;

এই হাদিসটি হাসান সনদের। এমনকি ওহাবীরাও বলেছেন এই হাদিস সহিহ। এছাড়াও এই হাদিসের সাথে সহি হাদিসের মিল রয়েছে, যেমনঃ مثل اصحابى كمثل النجوم فى السماء من اخذ بنجوم منها اهتدى *অর্থাৎ, আমার সাহাবীর মেছাল হল আকাশের তারকার মত, যে কেউ এর থেকে আলো গ্রহন সে সঠিক রাস্তা পেয়ে যাবে (বাইহাকী, সহি সনদেঃ দায়লামী শরিফ; তাফছিরে রুহুল মায়ানী, ১২ তম খন্ড, ৫১৩ পৃঃ; কানজুল উম্মাল, ১০ খন্ড, ৬৫ পৃঃ)।

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من احب

*অর্থাৎ, নবী করিম (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) বলেছেনঃ যে যাকে ভাল বাসে সে তার সাথেই থাকবে।

* সহি বুখারী শরিফ, কিতাবুল আদাব, باب: علامة حب الله عز وجل * এই বাবে।
* সহি মুসলীম শরিফ, كتاب البر والصلة والاداب । باب: المرء مع من احب।
* জামেঈল মাছানেদেউ ওয়াছ ছুনান, [কৃতঃ হাফেজ ইবনে কাছির (রঃ)] ৭-৮ খন্ড, ২২২৩ পৃঃ, হাদিস নং ৬০৩৪ নং,১১-১২ তম খন্ড,৩২১৫ পৃঃ।
* মজমুয়ায়ে জাওয়াঈদ, ৯ম খন্ড, ৩৬৪ পৃঃ,
* ঈমাম তাবারানী (রঃ) "মুজামুল ছাগীর" (১ম জিঃ ৫৯, ৭৮, ১১২, ৩০৫, ৪১৮ পৃঃ)।
* আবু নুয়াইমও হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।
* তাফছিরে মাজহারী, ৪র্থ খন্ড, ৩৪৮ পৃঃ।
*এই হাদিস সহি।
* তিরমিজি শরিফ, ২য় জিঃ ৬৪ পৃঃ;

لا يسعوني ارضي ولا سماء ولاكن يسعوني قلب العبد مؤمنين

*অর্থাৎ, আল্লাহ তা'লা বলেনঃ আসমান ও জমীনে আমার সংকুলান হয়না মু'মিন বান্দার দেল ব্যতিত।

* তাফছিরে রুহুল বয়ান, [কৃতঃ আল্লামা ঈসমাঈল হাক্কী রেঃ)] ১ম খন্ড, ৪৪৬ পৃঃ; ২য় খন্ড, ৩১৬ পৃঃ; ৪র্থ খন্ড, ৫২০ পৃঃ।
* ছেররুল আছরার, [কৃতঃ হুজুর গাউছে পাক আব্দুল কাদের জিলানী (রাঃ)] ১১৪ পৃঃ;

قال عليه الصلاة والسلام تفكر ساعة خير من عبادة سبعين سنة وفى رواة ستين سنة

*অর্থাৎ, রাসূলে পাক (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) বলেছেনঃ এক মুহূর্ত নেক চিন্তা করা ৭০ বৎসর এবাদতের চেয়ে উত্তম, অন্য রেওয়াতে রয়েছে ৬০ বছর।

* মুসনাদে ফিরদাঈস, [কৃতঃ ঈমাম দায়লামী (রঃ)] (৭০/২) হাদিস নং ২৩৯৭,
* মুসনাদে আবু নুয়াঈম, (২০৯/১), হজরত আবু দারদা (রাঃ) হতে হাছান সনদে।
* তাফছিরে রুহুল বয়ান, ৫ম খন্ড, ১৯ পৃঃ; ২য় খন্ড, ১৭০ পৃঃ;
* তাফছিরে কবির, ২২তম খন্ড, ৪৫ পৃঃ।
* তাফছিরে রুহুল মায়ানী, ১১-১২ তম খন্ড।
* ছেররুল আছরার, [কৃতঃ হুজুর গাউছে পাক আব্দুল কাদের জিলানী (রাঃ)] ৬২ পৃঃ

* মুকাশাফাতুল কুলুব, ১ম খন্ড;
*কাশফুল খফা, ১ম খন্ড, ২৭৮ পৃ::

قال رسول الله (ص) التائب حبيب الله
*অর্থঃ হজরত রাসূলে করিম (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) বলেছেনঃ তওবাকারী আল্লাহর বন্ধু।
*মুকাশাফাতুল কুলুব, ১ম খন্ড, কৃতঃ হুজ্জাতুল ইসলাম আল্লামা ঈমাম গাজ্জালী (রঃ);

قال رسول الله (ص) قلوب المؤمنين عرش الله
*অর্থাৎ, রাসূলে পাক (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) বলেনঃ মু'মিনের দেল আল্লাহর আরশ।
* তাফছিরে রুহুল বয়ান, [কৃতঃ আল্লামা ঈমাম ঈসমাইল হাক্কী (রঃ)] ৩য় খন্ড, ১৬১ পৃঃ।
* সেররুল আছরার, [কৃতঃ হুজুর গাওছে পাক আব্দুল কাদের জিলানী (রঃ)]।
*এই হাদিসের সমর্থনে আরেকটি হাদিস রয়েছেঃ وعن ابن عباس رضى الله عنهما (ص) جبل بمكة كان عليه عرش الرحمن حين لا ليل ولا نهار اشار بالجبل الى جسد محمد صلى الله عليه وسلم وبعرش الرحمن الى قلبه
*অর্থঃ হজরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম হল মক্কার পাহাড় যাতে রয়েছে রহমানের আরশ, যেখানে কোন রাত-দিন নেই। পাহাড় দ্বারা নবীজি নিজের দেহকে ঈশারা করেছেন। আর আরশে রহমান দ্বারা ঈশারা করেছেন ক্বাল্বের প্রতি (তাফছিরে রুহুল বয়ান, ৩য় খন্ড, ১৬১ পৃঃ)।
*এই হাদিস দ্বারাও প্রমান হয়, মানব দেহে আল্লাহ পাকের আরশ রয়েছে, আর তা হল ক্বাল্ব।

قال رسول الله (ص) اتقوا فرسة المؤمنين فانه ينظروا بنور الله
*অর্থাৎ, রাসূলে করিম (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) বলেছেনঃ তোমরা মু'মিনের অন্তরের দৃষ্টিকে ভয় কর, নিশ্চয় আল্লাহর নূর দিয়ে তাঁরা দেখে।
* জামে তিরমিজি শরিফ, ২য় খন্ড, ১৪৫ পৃঃ।
* তাফছিরে কাবির শরিফ, ১ম খন্ড, ১২৭ পৃঃ; ২৩তম খন্ড, ২৩১ পৃঃ।
* তাফছিরে রুহুল বয়ান, ১ম খন্ড, ৩৯ পৃঃ; ৪র্থ খন্ড, ৫৯০ পৃঃ; ২য় খন্ড, ৪৫৫ পৃঃ।
* তাবারানী তাঁর "আওছাতে" ২য় খন্ড, ২৭১ পৃঃ ও ৬ষ্ঠ খন্ড, ১৯ পৃঃ। (সনদঃ হাছান)
* তাবারানী তাঁর "কবিরে" (১০২/৮) হাঃ নং ৭৪৯৪।

* 'মজমুয়ায়ে জাওয়াহেদ' (২৭১/১০)।
* ছেররুল আছরার, [কৃতঃ হুজুর গাউছে পাক আব্দুল কাদের জিলানী (রাঃ)] ১২২ পৃঃ;
* আলবেদায়া ওয়ান নেহায়া, ২য় খন্ড, ৪০৯ পৃঃ;
* তাফছিরে কুরতবী, ১০ম খন্ড, ৩৪ পৃঃ;
* নাওয়াদেরুল উছুল, ২৭১ নং হাঃ;
* তাফছিরে তাবারী, ১৪ তম খন্ড, ৫০ পৃঃ;
* রুহুল মায়ানী, ১৪ তম খন্ড, ৪২৯ পৃঃ;
* তাফছিরে খাজেন, ৩য় খন্ড, ৬০ পৃঃ;
* ইবনে কাছির, ২য় খন্ড, ৬৯২ পৃঃ;
*মাকাছিদুল হাছানাহ, ১৯ পৃঃ

قال الله تعالى لو لك ما خلقة الافلاق
*অর্থাৎ, আল্লাহ তা'লা বলেনঃ হে নবী! আপনাকে না বানাইলে কোন কিছুই বানাইতাম না।
* তাফছিরে রুহুল বয়ান, [কৃতঃ আল্লামা ঈমাম ইসমাইল হাক্কী (রঃ)] ২য় খন্ড, ৩২৯ পৃঃ; ও ৪৩০ পৃঃ।
* মওজুয়াতুল কাবির, ১০১ পৃঃ [কৃতঃ আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রঃ)] তিনি হাদিসটি উল্লেখ করেই বলেছেন لكن معنا ه الصحيح কিন্তু ইহার মাআনা সহি।
* মুজাদ্দেদ আলফেছানী (রাঃ) তাঁর "মাকতুবাত ৯ম খন্ড, ১৫৫ পৃঃ; মাকতুবাত নং ১২২" কিতাবে উল্লেখ করেছেন।
* ছেররুল আছরার, [কৃতঃ হুজুর গাউছে পাক আব্দুল কাদের জিলানী (রাঃ)] ১০২ পৃঃ।
*আস সিহাবুছ ছাকিব, ৫০ পৃঃ কৃতঃ মাওলানা হুছাইন আহমদ মাদানী (রঃ)।
*কাশফুল খফা, ২য় খন্ড, ১৪৮ পৃঃ হাদিসটি উল্লেখ করে বলেছেনঃ واقول لكن معناه صحيح অর্থাৎ আমি বলি এই হাদিসের মায়ানা সহি)।
***[এই হাদিসের 'মায়ানা' সহি হওয়ার কারন এর মায়ানার সাথে অন্য সহি হাদিসের মিল রয়েছে, যেমনঃ-
*দলিলঃ قار رسول الله اتنى جبرائل فقال يا محمد ان الله يقول لو لاك ما خلقت الجنة ولو لاك ما خلقت النار *অর্থাৎ, জিব্রাইল (আঃ) এসে বললেনঃ হে মুহাম্মদ (ছালালাহু আলায়হি ওয়া ছালাম) আল্লাহ তা'লা বলেছেন আপনাকে না বানাইলে জান্নাত ও জাহান্নাম বানাইতেন না {দায়লামী শরিফ, ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে, মওজুয়াতুল কবির, ১০১ পৃঃ সহি সনদে}
*এজন্যই হয়ত মহান আল্লাহ আদম (আঃ) কে বলেছেন ولو لا محمد لما خلقتك *হে আদম! আমি মুহাম্মদ কে না বানাইলে তোমাকেও বানাইতাম

না (বাইহাকী দালাইলে নবুয়ত; মুস্তাদরাকে হাকেম, ৪র্থ খন্ড, ১৫৮৩ পৃঃ সহি সনদে)। অন্য হাদিসে আছেঃ

*দলিলঃ لو لاك ما خلقت الدنيا *অর্থাৎ, হে নবী! আপনাকে না বানাইলে দুনিয়া বানাইতাম না (তারিখে ইবনে আসাকির, মওজুয়াতুল কবির, ১০১ পৃঃ মরফূ সনদে)।

*দলিলঃ عن ابن عباس (رض) قال اوحى الله الى عيسى عليه السلام يا عيسى امن بمحمد وامر ادركه من امتك ان يؤمنوا به فلو لا محمد ما خلقت ادم ولو لا محمد ما خلقت الجنة ولا النار *অর্থাৎ, হজরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, আল্লাহ তা'লা হজরত ঈসা (আঃ) এর প্রতি ওহি নাজিল করলেন যখন তোমার উম্মতকে মুহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) এর প্রতি ঈমান আনতে বলবে, কেননা আমি মুহাম্মদকে না বানাইলে- না আদমকে বানাইতাম, না বেহস্থ না দোজখ (মুস্তাদরাকে হাকেম, ৪র্থ খন্ড, ১৫৮৩ পৃঃসহি সনদে; সিফাউস ছিকাম, আফদ্বালুল কোরা) সনদ সহি।

*দলিলঃ هذا نورنبى من ذريتك اسمه فى السماء احمد وفي الارض محمد ولو لا محمد ما خلقتك *অর্থাৎ, আদম (আঃ) কে আল্লাহ বললেন ইহা নূরে মুহাম্মদী তোমার বংশধরদের মাঝে। আসমানে তাঁর নাম আহমাদ, জমীনে তাঁর নাম মুহাম্মদ। যদি তিনি না হতেন আমি আসমান-জমীন এমনকি তোমাকেও বানাইতাম না (মাওয়াহেবুল্লাদুন্নিয়া, ১ম খন্ড, ৭০ পৃঃ)।

*দলিলঃ عن علي بن ابي طليب (رض) قال قال رسول الله (ص) قال الله تعالي وعظتي وظلالي لو لك ما خلقة السماء والارض *অর্থাৎ, হজরত আলী (রাঃ) বর্ণনা করেন, নবী করিম (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) বলেছেনঃ আল্লাহ তা'লা বলেছেনঃ হে মুহাম্মদ! আমার ইজ্জত ও জালালিয়তের কসম! আপনি না হলে আমি না আসমান বানাইতাম না জমীন বানাইতাম (ইনসাসুল উয়ূন, ১ম খন্ড, ১৫৭ পৃঃ)।

*দলিলঃ عن علي بن ابي طليب (رضي) عن الرسول (ص) قلت يا ربي لما خلقتاني؟ فقال: وعظتي وظلالي لو لك ما خلقة السماء والارض -*অর্থাৎ, হজরত আলী (রাঃ) রাসূল পাক ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম হতে বর্ণনা করেন, নবীজি বলেনঃ আমি প্রশ্ন করলাম, হে আমার রব! আমাকে কেন সৃষ্টি করেছেন? তিনি বললেন আমার ইজ্জত ও জালালের কসম! আপনাকে না বানাইলে আসমান জমীন কিছুই বানাইতাম না (নজহাতুল মাজালিস, ২য় খন্ড, ১১৯ন পৃঃ)।

*এরুপ অনেক হাদিস রয়েছে। সর্বোপরি প্রমানিত হল যে, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) এর উছিলায় আল্লাহ সব কিছু তৈরী করেছেন। অর্থাৎ, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) কে না বনাইলে

আল্লাহ আসমান জমীন, জান্নাত জাহান্নাম, দুনিয়া এক কথায় কোন কিছুই বানাইতেন না। আর এই কথাটাকেই বলা হয়: لو لاك ما خلقت الافلاك

علمت علم الاولين والاخرين

*অর্থঃ রাসূল (ছালালাহু আলায়হি ওয়া ছালাম) বলেনঃ আওয়াল থেকে আখের পর্যন্ত সকল এলেম আমি জেনে গেছি।

*তাফছিরে রুহুল বয়ান, {কৃতঃ আল্লামা ঈসমাইল হাক্কী (রঃ)} ৫ম খন্ড, ৫০০ পৃঃ।

*তাবারানী শরিফ।

عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلوبوا العلم ولو كان با لصين

*অর্থঃ হজরত আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) বলেনঃ এলেম অর্জন কর যদিও চীনে হয়।

*বায়হাক্বী শুয়ায়েবুল ঈমান, ২য় খন্ড, ৭২৪ পৃঃ।

*ইবনে আদী তাঁর 'কামিল' গ্রন্থে, ১১৮/৪;

*তাফছিরে রুহুল বয়ান, {কৃতঃ আল্লামা ঈসমাইল হাক্কী (রঃ)} ২য় খন্ড, ৪০২ পৃঃ।

*কানজুল উম্মাল, ১০ খন্ড, ৬০ পৃঃ; এরুপ আরো একটি হাদিস রয়েছে।

*খতিবে বোগদাদী তাঁর 'তারিখে' ৩৬৪/৯;

*ঈমাম উকাইলি তাঁর 'কিতাবুদ দ্বোয়াফায়' ২৩০/১;

*আবু নুয়াইম তাঁর 'তারিখে ইছবাহানে' ১৫৬/২;

*কাশফুল খফা, ১ম খন্ড, ১২৪ পৃঃ;

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوة معرج المؤمنين

*অর্থঃ রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) বলেনঃ নামাজ মু'মিনের মেরাজ।

*তাফছিরে কবির শরিফ, {কৃতঃ ঈমাম ফখরুদ্দিন রাজী (রঃ)} ১ম খন্ড, ২৬০ পৃঃ।

*দ্বিয়াউল কুলুব, কৃতঃ হাজী এমদাদুল্লাহ মোহাজেরে মক্কী (রঃ);

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم

*অর্থঃ রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) বলেছেনঃ এলেম অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরজ।

*বায়হাক্বী শুয়াইবুল ঈমান, ২য় খন্ড, ৭২৪ পৃঃ হজরত আনাছ (রাঃ) থেকে ৬ টি সনদে উল্লেখ আছে।

*তাবারানী তাঁর 'আওছাতে' আনাছ (রাঃ) থেকে (২য় খন্ড, ৪৮ পৃ: ও ৬ষ্ঠ খন্ড, ২১৯, ২৯৮ ও ২৩১ পৃ:)।
*খতিবে বোগদাদী তাঁর তারিখে, ৪০৭/১;
ইবনে আদী তাঁর 'কামিলে' ২৪২/৫;
তাবারানী তাঁর 'মুজামুছ ছাগীরে' ১৯২/১; হজরত আলী ইবনে আবী তালিব (রাঃ) হতে।
*তাবারানী তাঁর কবিরে (১০৪৩৯/১০); ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে।
*কানজুল উম্মাল, ১০ম খন্ড, ৫৭-৬০ পৃ: এরুপ মোট ৮ (আটটি) হাদিস বিভিন্ন সাহাবী থেকে বর্ণিত রয়েছে।
*ঈমাম উকাইলী (রঃ) তাঁর 'কিতাবুদ দোয়াফায়' ইবনে উমর (রাঃ) থেকে।
*আবু নুয়াইম তাঁর 'হুলিয়াতে' ৩২৩/৮;
*ঈমামে আজম আবু হানিফা (রাঃ) তাঁর 'মুসনাদে' সহি সনদে উল্লেখ আছে।
*কাশফুল খফা' ৫৬/২; হা: নং ১৬৬৫।
*জামেউল মাছানেদেউ ওয়াছ ছুনান;
*জামেউছ ছাগীর, ২য় জি:;
*মাকাছিদুল হাছানাহ, ২৭৫ পৃ:;
*এছাড়াও উল্লেখিত কিতাব গুলো সহ অন্য কিতাবেও হাদিসটি উল্লেখ রয়েছে।

اطلبوا العلم من المهد الى اللحد

*অর্থঃ দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত এলম অর্জন কর।
*তাফছিরে রুহুল বয়ান, {কৃত: আল্লামা ঈসমাইল হাক্কী (রঃ)} ৫ম খন্ড, ২১৩ পৃ:।

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رايت ربى على صورة شاب

*অর্থঃ রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) বলেছেন: আমি আমার রবকে দাড়ি-গোফবিহীন যুবকের ন্যায় দেখেছি।
*দেওবন্দীদের কিতাব: "তালিকুছ ছবীহ"।
*ছেররুল আছরার, [কৃত: হুজুর গাউছে পাক আব্দুল কাদের জিলানী (রা:)] ১০১ পৃ:;
*শরহে বোখারী ফায়জুল বারী, [কৃত: আল্লামা আনওয়ার শাহ্ কাশ্মিরী সাহেব]।
*হাটাজারী থেকে প্রকাশিত: "তানজিমুল আশ্তাত ফি হাল্লিল মিসকাত" এ সনদ সহ উল্লেখ আছে।
*আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রঃ) এর "মিরকাত শরহে মিসকাত" এ সনদ সহ হাদিসটি উল্লেখ আছে।

*প্রিন্সিপ্যাল আব্দুল জলীল সাহেব (রঃ) এর "নুর নবী" কিতাবে ১১১ পৃ: হাদিসটি ভাল মন্তব্যের সাথে উল্লেখ আছে।

[বিঃ দ্রঃ এই হাদিসটি মুতাশাবিহাহ এর অন্তর্ভূক্ত, যার প্রকৃত অবস্থা রহস্যাবৃত। অর্থাৎ এর বাহ্যিক অর্থ গ্রহন করা যাবে না]।

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلاف امتى رحمة

*অর্থঃ হজরত রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) বলেছেন: আমার উম্মতের ইখতেলাফ রহমত।
*ঈমাম কুরতবী (রঃ) হাদিসটি উল্লেখ করে বলেছেন 'গরীব'।
*ঈমাম ছিয়ূতী (রঃ) "নছরুল মুক্বাদ্দাছি ফিল হুজ্জাহ" কিতাবে উল্লেখ করেছেন।
*ঈমাম বায়হাক্বী তাঁর "রিসালান আসয়ারিয়া" কিতাবে সনদ বিহীন উল্লেখ করেছেন।
*মাওজুআতুল কাবির, {কৃত: আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রঃ)} ২৬ পৃ:।
*কানজুল উম্মাল, ১০ খন্ড, ৫৯ পৃ:।
[হাদিসটি সনদে দূর্বল হলেও এর সমর্থনে সহি হাদিস রয়েছে, আর এমন দ্বায়িফ হাদিসের সমর্থনে সহি রেওয়াত থাকলে দূর্বল রেওয়াতটিও ক্বাবী বা শক্তিশালী হয়ে যায়]

* عن ابن عباس مرفوعا اختلاف اصحابى لكم رحمة *অর্থঃ হজরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) মরফু হিসেবে বর্ণনা করেন, রাসূল পাক (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) বলেছেন: আমার সাহাবীদের এখতেলাফ তোমাদের জন্য রহমত (মুসনাদে ফিরদাউছ, মাউজুআতুল কাবির, ২৬ পৃ:)।
*এই হাদিস দ্বারা বুজা যায় উম্মতের এখতেলাফ আর সাহাবীদের এখতেলাফ একই কথা কারন সাহাবীগণও নবীজির উম্মত। আরেকটি হাদিস:-
* ذكر ابن سعد فى طبقاة عن القاسم بن قال كان اختلاف اصحابى محمد رحمة للناس *অর্থঃ ইবনে সাদ তাঁর 'ত্বাবকায়' বর্ণনায় করেন, কাছেম ইবনে মুহাম্মদ (রাঃ) বলেন: মুহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) এর সাহাবীগণের এখতেলাফ লোকদের জন্য রহমত (মাওজুআতুল কাবির, ২৬ পৃ:)।
*সুতরাং সব গুলো মিলিয়ে হাদিসটি শক্তিশালী।

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النظر الى العالم قلت ثم اي؟ قال زيارة العالم

*অর্থঃ আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) বলেন: আলিমের দিকে নজর করাও ইবাদত। জিজ্ঞাসা করা হল এর পর কোনটি? নবীজি বলেন আলিমের সঙ্গলাভ।
*তাফছিরে কবির শরিফ, {কৃত: ঈমাম ফখরুদ্দিন রাজী (রঃ)} ২য় খন্ড, ১৮৯ পৃ:।
*হাকেম শরিফে এরুপ রয়েছে: عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله (ص) النظر الى وجه على عبادة *অর্থঃ হজরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) বলেছেন: তাঁর (আলিমের) দিকে নজর করা ইবাদত (হাকেম, ৫ম খন্ড, ১৭৬১ পৃ:) (ইমরান ইবনে হুছাইন (রাঃ) ও ইবনে মাছউদ (রাঃ) থেকেও আরোও ২টি রেওয়াত রয়েছে);
*দায়লামী শরিফ।
*কানজুল উম্মাল, ১০ খন্ড, ৬৪ পৃ: এভাবে রয়েছে: عن ابن عباس قال قال رسول الله (ص) مجالسة العلماء عبادة
*অর্থঃ হজরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) বলেছেন, আলিমগণের মজলিস বা বৈঠক এবাদত। যিয়ারত ও মজলিস একই কথা কারন মজলিসের মাধ্যমেই যিয়ারত হয়।
*তাফছিরে কবিরে, ২য় জি: ১৯২ পৃ: এভাবে রয়েছে: عن الحسن البصرى:....والنظر فيه عبادة

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نوم العالم عبادة
*অর্থঃ হজরত রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) বলেন: আলিমের ঘুমও ইবাদত।
*কানজুল উম্মাল, ১০ খন্ড, ৬১ পৃ: হজরত সালমান ফারসী (রাঃ) থেকে বর্ণিত এভাবে: "এলেমে উপর ঘুমানো অজ্ঞ লোকের (নফল) নামাজ থেকে উত্তম"।
*"তাফছিরে কবিরের" ২য় জি: ১৮৯ পৃ: এভাবে রয়েছে: نوم العالم عبادة।
*ছেররুল আছরার, [কৃত: গাউছে পাক আব্দুল কাদের জিলানী (রা:)] ৬০ পৃ:;
لن يلج الانسان الى ملكوت السموت حتى يولد مرتين كما يولد الطير مرتين
অর্থঃ হজরত ঈসা (আঃ) বলেন: পাখি যেমন দুইবার জন্ম গ্রহন করে, মানুষ তেমনি দুইবার জন্মগ্রহন না করলে আসমান সমূহের মালাকুতে প্রবেশ করতে পারেনা।
*ছেররুল আছরার, [কৃত: গাউছে পাক আব্দুল কাদের জিলানী (রাঃ)] ৭৭ পৃ:;
বি: দ্র: পাখির ডিম হয়ে একবার জন্ম হয় ও আরেকবার ডিম থেকে বাচ্চা রুপে জন্ম হয়: মানুষের মায়ের গর্ভ থেকে একবার জন্ম ও আরেকবার আত্মার জন্ম।

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ان اوليا الله لا يموت

*অর্থঃ আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) বলেন: সাবধান! নিশ্চয় আল্লাহর ওলীগণের মৃত্যু নেই।
*মুসনাদে ফেরদাউস, কৃত: ঈমাম দায়লামী (রঃ)।
*তাফছিরে রুহুল বয়ান, ৫ম খন্ড, ২২৪ পৃ:।
*সেররুল আসরার, কৃত: হুজুর গাউছে পাক আব্দুল কাদের জিলানী (রাঃ); (শাব্দিক ব্যবধানে)।

قال رسول الله (ص) العلماء مفاتح الجنة
*অর্থঃ রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) বলেছেন: আলিমগণই বেহেস্তের চাবি।
*তাফছিরে কবির শরিফ, {কৃত: ঈমাম ফখরুদ্দিন রাজী (রঃ)} ২য় জি: ১৯০ পৃ:।

عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله (ص) ان لكل شئ مفتاح ومفتاح الجنة حب المساكين والفقراء
*অর্থঃ হজরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলে করিম (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) বলেছেন: নিশ্চয় প্রত্যেক জিনিসের চাবি রয়েছে, আর জান্নাতের চাবি হল মিছকীন ও ফকির লোকের ভালবাসা।
*মুকাশাফাতুল কুলুব, ১ম খন্ড, কৃত: ঈমাম গাজ্জালী (রঃ)।

قال رسول الله (ص) انا من نور الله والخلق من نورى
*অর্থঃ হজরত রাসূল পাক (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) বলেছেন: আমি আল্লাহর নুর থেকে সৃষ্টি জগতের সব আমার নুর থেকে।
*তাফছিরে রুহুল বয়ান, {কৃত: আল্লামা ঈসমাইল হাক্বী (রঃ)} ২য় খন্ড, ৩৭১, ৪২৯ পৃ:; ৪র্থ খন্ড, ২৪১ পৃ: আরোও অনেক জায়গায় হাদিসটি সামান্য পার্থক্যের সাথে উল্লেখ আছে।
*মতায়েলুল মুসাররাত শরহে দালায়েনুল খায়রাত।
*ছেররুল আছরার, [কৃত: গাউছে পাক আব্দুল কাদের জিলানী (রা:)] ৪৯ পৃ:;

قال رسول الله (ص) خلق الله ادم على صورة الرحمن
*অর্থঃ রাসূলে করিম (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) বলেছেন: আল্লাহ আদমকে সৃষ্টি করেছেন রহমানী সূরতে।
*তাবারানী মুজামুল কাবির, ৪৩০/১২;
*ইবনে আছিম তাঁর সুনানে, ২২৮/১;
*আ: ইবনে আহমদ তাঁর সুনানে, ২৬৮/১;
*হায়ছামী তাঁর মজমুয়ায়ে, ১০৬/৮;
*তাফছিরে রুহুল মায়ানী, ২য় জি: ৫৭৭ পৃ:;

قال رسول الله (ص) العلماء ورثة الانبياء -
*অর্থঃ আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) বলেছেনঃ আলিমগণ নবীজির ওয়ারিছ (উত্তাধিকারী)।
*আবু দাউদ শরিফ, হাঃ নং ৩৬৪১;
*তিরমিজি শরিফ, ২৬৮২ নং হাঃ;
*ইবনে মাজাহ, হাঃ নং ২২৩;
*মুসনাদে আহমদ, ১৯৬/৫;
*তাফছিরে রুহুল মায়ানী, ১৬ তম খন্ড, ৬২৭ পৃঃ;
*তাফছিরে রুহুল বয়ান, ৫ম খন্ড, ৫৮৫ পৃঃ;
*মুকাশাফাতুর কুলুব, ১ম খন্ড, কৃতঃ ঈমাম গাজ্জালী (রঃ)।

عن ابى هريرة قال قال رسول الله (ص) خلق الله ادم على صورته
*অর্থঃ হজরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) বলেছেনঃ আল্লাহ আদমকে নিজ সূরতে সৃষ্টি করেছেন।
*মেসকাত শরিফ, ৩৯৭ পৃঃ;
*সহি বুখারী শরিফ, হাঃ নং ৬২২৭;
*সহি মুসলীম শরিফ, হাঃ নং ২৮৪১;
*মেরকাত শরহে মেসকাত, ৮ম খন্ড, ৪৫৩ পৃঃ;
*মুসনাদে আহমদ, ৩১৫/২;
*তাফছিরে রুহুল মায়ানী, ৩০ তম খন্ড, ৫০২ পৃঃ;
*তাবারানী আওছাতে, ৬ষ্ঠ খন্ড, ২১ পৃঃ;
*কাশফুল খফা, ১ম খন্ড, ৩৩৬ পৃঃ;
وعن زرارة بن اوفى ان رسول الله (ص) قال لجبرئيل هل رايت ربك فانتقض جبرءيل وقال يا محمد ان بينى و بينه سبعين حجاب من نور لو دنوت من بعضها لاحترقت هكذا فى المصابيح
*অর্থঃ হজরত যুরারা ইবনে আওফা (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) একদা জিব্রাইল (আঃ) কে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনিকি আপনার রবকে দেখেছেন? এই কথা শুনে জিব্রাইল কেপে উঠলেন এবং বললেন ইয়া মুহাম্মদ! আমার ও তাঁর মাঝে ৭০টি নূরের পর্দা রয়েছে। যদি আমি উহার কোন একটির নিকটবর্তী হই, তবে আমি জ্বলে যাইব।
*মেসকাত শরিফ, ৫১০ পৃঃ;
*মেরকাত শরহে মেসকাত, ১০ম খন্ড, ৪১০ পৃঃ;
*মাসাবীহুছ ছুন্নাহ, হাঃ নং ৪৪৫৭;
*আবু নুয়াইম তাঁর 'হুলিয়া' কিতাবে আনাছ (রাঃ) হতে;
*জামেউছ ছাগীর, হাঃ নং ৪৬১০;

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل شئ صقالة وصقالة القلب ذكر الله

*অর্থঃ হজরত রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) বলেছেনঃ প্রত্যেক জিনিসের পরিস্কারক আছে, ক্বাল্বেরন পরিস্কারক হল আল্লাহর জিকির।
*মেসকাত শরিফ, ১৯৯ পৃঃ;
*তাফছিরে মাজহারী, ৪র্থ খন্ড, ৩৪৭ পৃঃ;
*বায়হাক্বী দাওয়াতুল কাবির;
*মেরকাত, ৫ম খন্ড, ১৬৫ পৃঃ;
*মুছান্নাফে ইবনে আবী শায়বাহ;
*ইবনে আবীদ্দ দুনিয়া;
*তাফছিরে রুহুল বয়ান, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৫৪ পৃঃ;
*কানজুল উম্মাল, ১ম খন্ড, ২১৪ পৃঃ;
*জামেউছ ছাগীর,

الا ان فى الجسد مذغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فيد الجسد كله الا وهى القلب
*হজরত নুমান ইবনে বাশির (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) কে বলতে শুনেছিঃ..... নিশ্চয় মানব দেহে এক টুকরা মাংশপিন্ড আছে, যা পবিত্র হলে সমস্থ দেহ পবিত্র হয়ে যায়। যখন ঐ মাংশপিন্ড অপবিত্র হলে সমস্থ দেহ অপবিত্র হয়ে যায়। তোমরা শুনে রাখ ইহা হল ক্বাল্ব।
*সহি বুখারী শরিফ, ১ম খন্ড, ১৩ পৃঃ;
*সহি মুসলীম, ২য় খন্ড, ২৮ পৃঃ;
*মুসনাদে আহমদ, ২৭০/৪;
*মেসকাত শরিফ, ২৪১ পৃঃ;
*ইবনে মাজাহ, কিতাবুল ফিতানে;
*বায়হাক্বী শুয়াইবুল ঈমান, ১ম খন্ড, ৪১৩ পৃঃ;
*দারেমী শরিফ, ২য় খন্ড, ৩১৯ পৃঃ;
*মেরকাত শরহে মেসকাত, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৯ পৃঃ;

قال الله تعالى الانسان سرى وانا سره
*অর্থঃ মহান আল্লাহ তা'লা বলেনঃ আমি মানুষের গুপ্তভেদ ও মানুষ আমার গুপ্তভেদ।
*ছেররুল আছরার, [কৃতঃ হুজুর গাউছে পাক আব্দুল কাদের জিলানী (রাঃ)], ৬১ পৃঃ;

عن ابى هريرة رضى الله عنه فيما اعلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يبعث الى هذه الامة على راس كل مائة سنة من يجدد لها دينها

*অর্থঃ হজরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আমার জানামতে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) বলেছেন: নিশ্চয় আল্লাহ প্রতি শতাব্দিতে একজন সংস্কারক (মুজাদ্দেদ) প্রেরণ করেন ও করবেন, যিনি বা যারা দ্বীনের সংস্কার করবেন।
*আবু দাউদ, ২য় জি: ৫৮৯ পৃ::
*হাকেম, ৮ম খন্ড, ৩০৬২ পৃ::
*কানজুল উম্মাল, ১২ তম খন্ড, ৮৮ পৃ::
*বায়হাক্বী তাঁর মারেফা গ্রন্থে আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে;
*মেরকাত, ১ম খন্ড, ৪৬১ পৃ::
*ফাতহুল বারী, ২৯৫/১৩;
*মেসকাত শরিফ, ৩৬ পৃ::
*দুর্রে মানছুর, ৩২১/১;
*কাশফুল খফা, ২৮২/১;
*ইবনে আদী, ১২৩/১;
*মাকাছিদুল হাছানাহ, ১২১ পৃ::

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اول ما خلق الله القلم
*অর্থঃ হজরত রাসূলে পাক (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) বলেছেন: নিশ্চয় আল্লাহ সর্ব প্রথম কলম সৃষ্টি করেছেন।
*জামেউল মাছানেদেউ ওয়াছ ছুনান, ৭ম জি: ১৮০২ ও ১৮১৪ পৃ::
*আবু দাউদ, কিতাবুছ ছুন্নাহ এর 'আল কাদর' বাবে;
*মুসনাদে আহমদ, ৩১৭/৫;
*মাওয়াহেবুল্লাদুন্নিয়া, ১ম খন্ড, ৭৩ পৃ::
*তাফছিরে রুহুল বয়ান, ৫ম খন্ড, ২২৬ পৃ::
*ছেররুল আছরার, [কৃত: গাউছে পাক আব্দুল কাদের জিলানী (রা:)] ৪৮ পৃ::
*আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া, ১ম খন্ড;

عن عبد الرحمن بن عائش الحضرمي، سمعت رسول الله (ص) يقول رأيت ربي في احسن صورة
*অর্থঃ হজরত আব্দুর রহমান ইবনে আইশ (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন: আমি আমার রবকে উত্তম সূরতে দেখেছি।
*জামেউল মাছানেদেউ ওয়াছ ছুনান, ৮ম জি: ২২২৫ পৃ::
*মুসনাদে আবু নুয়াইম;
*মুসনাদে আহমদ, ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে সহি সনদে বর্ণনা করেছেন।
*তিরমিজি শরিফ, ২য় জি: ১৬৪ পৃ::

*তাফছিরে ইবনে কাছির, ৪র্থ খন্ড, ২৯৫ পৃ: ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে;
*তাফছিরে রুহুল বয়ান, ৯ম খন্ড, ২৫০ পৃ::
*জামেউছ ছাগীর;

عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله (ص) لو كان بعدى نبى لكان عمر بن الخطاب
*অর্থঃ হজরত উকবা ইবনে আমের (রাঃ) বলেন, রাসূল পাক (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) বলেছেন: আমার পরে যদি কেউ নবী হতেন তাহলে খাত্তাবের বেটা উমর হত।
*মুসতাদ্‌রাকে হাকেম, ৫ম খন্ড, ১৬৯৪ পৃ::
*মেসকাত শরিফ, ৫৫৮ পৃ::
*মেরকাত শরহে মেসকাত, ১১ তম খন্ড, ১৯৪ পৃ::
*জামে তিরমিজি শরিফ, হা: নং ৩৬৮৬;
*মুসনাদে আহমদ, ১৫৪/৪;
*আশিয়াতুল লুমআত;

قال رسول الله (ص) ان الشيطان يجرى من ابن ادم مجرى الدم
*অর্থঃ রাসূলে পাক (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) বলেছেন: শয়তান আদম সন্তানের রক্ত চলাচলের শিরা-উপশিরা চলাচল করে।
*ইবনে মাজাহ শরিফ, (باب فى المعتكف يزوره اهله فى المسجد)।
*মুকাশাফাতুল কুলুব, ১ম খন্ড, কৃত: ঈমাম গাজ্জালী (রঃ)।
عن انس قال قال رسول الله (ص) اذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قالوا وما رياض الجنة قال حلق الذكر
*হজরত আনাছ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) বলেছেন: যখন বেহেস্তের বাগানে পৌছবে তখন ইহার ফল ভক্ষন করবে। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, বেহেস্তের বাগান কি? নবীজি বললেন: জিকিরের মজলিস।
*মেসকাত শরিফ, باب ذكر الله عز وجل والتقرب اليه এর الفصل الثانى (দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ), ১৯৮ পৃ:।
*মেরকাত শরহে মেসকাত, ৫ম খন্ড, ১৫৫ পৃ::
*তিরমিজি শরিফ, হা: নং ৩৫৭৭ পৃ::
*মুসনাদে আহমদ, ৬৫/৩;
*জামেউল মাছানেদেউ ওয়াছ ছুনান;
*কানজুল উম্মাল, ১ম খন্ড, ২২৩ পৃ::
*২১ নং নছিহত বই এর ৪৭ পৃষ্টা:

*"সমবেত জেকেরকারীকে আল্লাহর একদল ফেরেস্থা আপন আপন ডানা দ্বারা নিকটতম আসমান পর্যন্ত ঘিরিয়া লন। উক্ত সব ফেরেস্তাদেরকে আল্লাহতা'লা জেকেরকারীদেরকে ক্ষমা করিয়া দেন। শুধু তাই নয়, যে সকল লোক উল্লেখিত জেকেরের মজলিসের আশে পাশে থাকে, অথচ জেকেরকারীদের অন্তর্ভূক্ত নয়, আল্লাহ পাক তাদেরকেও ক্ষমা করিয়া দেন"।

এই হাদিসটি নিম্ন লিখিত কিতাবসমূহে উল্লেখ আছে:

*মেসকাত শরিফ, ১৯৭ পৃ:;
*মেরকাত শরহে মেসকাত, ৫ম খন্ড, ১৪৫ পৃ:;
*সহি বুখারী, হা: নং ৬৫০২;
*সহি মুসলীম, হা: নং (২৬৬৯. ২৫);
*মুসনাদে আহমদ, ৩৮২/২;

عن ابن عباس قال قال رسول الله (ص) انا مدينة العلم وعلي بابها

*অর্থঃ রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) বলেছেন: আমি এলেমের শহর আর হজরত আলী তার দরজা।

*মুস্তাদ্রাকে হাকেম, ৫ম খন্ড, ১৭৪৩ পৃ: (এরুপ আরোও ২টি রেওয়াত রয়েছে):
*হজরত জাবের (রাঃ) থেকেও একটি বর্ণনা রয়েছে (হাকেম, ৫ম খন্ড, ১৭৪৪ পৃ:);
*মেরকাত শরহে মেসকাত, ১১ তম খন্ড, ২৫২ পৃ:;
*কানজুল উম্মাল, ৬০০/১১;
*তাফছিরে রুহুল বয়ান, ৫ম খন্ড, ৩১১ পৃ:;
* তিরমিজি শরিফ, (সামান্য শাব্দিক ব্যবধানে) এভাবে: انا دار الحكمة وعلي بابها অর্থঃ আমি গভীর জ্ঞানের গৃহ আলী তার দরজা।
*মেসকাত শরিফ, ৫৬৪ পৃ:;
*আরেকটি বর্ণনায় আছে এরুপ: انا مدينة العلم وابو بكر اساسها وعمر حيطانها وعثمان سقفها وعلي بابها (মুসনাদে ফেরদাউছ, ৪৩/১, হা: নং ১০৫; মেরকাত, ১১ তম খন্ড, ২৫৩ পৃ: (এই হাদিসটির প্রথম দিক ও শেষের দিক মিলালে উল্লেখিত হাদিসের সাথে হুবহু মিলে যায়)
*মাকাছিদুল হাছানাহ. ৯৭ পৃ:;
*কাশফুল খফা, ১ম খন্ড, ১৮৪ পৃ:;

يا ام المؤمنين انبئني عن خلق رسول الله قالت اليس تقرا القران؟ قال بلى قالت فان خلق نبى الله (ص) القران

*অর্থঃ হে উম্মুল মু'মিনীন! আমাদেরকে রাসূলে পাক (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) এর চরিত্র সম্পর্কে বলুন। মা আয়েশা (রাঃ) বললেন, তোমরা কি কুরআন সম্পর্কে জান? তাঁরা বলল হ্যাঁ। তিনি বললেন, নবীজির চরিত্র হল পবিত্র কোরআনের মত।

*হাকেম শরিফ, ৪র্থ খন্ড, ১৫৮১ পৃ:;
*সহি বুখারী শরিফ, ৬১২৬. ৩৫৬০;
*সহি মুসলীম,
*মুসনাদে আহমদ, ১১৪/৬;
*তিরমিজি শরিফ, ৩৭৪;
*আবু দাউদ শরিফ, ৫৬;
*ইবনে মাজাহ, ১১৫০;
*নাসাঈ শরিফ, ৫৭৪;
*কানজুল উম্মাল, ১৮৩৭৮, ১৮৭১৮;
*তাফছিরে দূর্রে মানছুর, ২/৫;

الا اخبركم بخير اعمالكم وازكاها عند مليككم وارفعها فى درجاتكم وخير لكم من انفاق الذهب والورق وخيرلكم من ان تلقوا عدوكم فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقكم قالوا بلى قال ذكر الله

*অর্থঃ যে আমল সর্বোত্তম, তোমাদের প্রভূর নিকট পবিত্রতম, তোমাদের মর্যাদা উন্নতকরণে উচ্চতম, স্বর্ণ-রোপ্য দানের চেয়েও শ্রেষ্ট এবং শত্রুর মোকাবিলা করত: তোমরা তাদের গর্দানে আঘাত করা এবং তারা তোমাদের গর্দানে আঘাত করার চেয়েও শ্রেষ্ট- সে আমল সম্পর্কে তোমাদের অবহিত করব কি? সাহাবীগণ বললেন: হ্যাঁ ইয়া রাসূল্লাহ! নবীজি বললেন: সে আমল হল আল্লাহর জিকির।

*ইবনে মাজাহ, কিতাবুল আদাব, ২৬৮ পৃ:;
*তিরমিজি শরিফ, ২য় জি: ১৭৫ পৃ:;
*মুসনাদে আহমদ, ৪৪৭০/৬;
*মেসকাত শরিফ, ১৯৮ পৃ:;
*মুস্তাদরাকে হাকেম, ৪৯৬/১;
*তাফছিরে মাজহারী, ৩য় খন্ড, ৩৪৩ পৃ:;
*মেরকাত শরহে মেসকাত, ৫ম খন্ড, ১৫২ পৃ:;
*মুয়াত্তায়ে মালেক শরিফ, ৭৩ পৃ:;
*কানজুল উম্মাল, ১ম জি: ২১৩ পৃ:;

عن ابن عباس قال قال رسول الله (ص) الشيطن جاثم على قلب ابن ادم فاذا ذكر الله خنس واذا غفل وسوس

*হজরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) বলেছেন: শয়তান মানুষের ক্বাবে বাস করে, যখন সে আল্লাহর জিকির করে সে বাগিয়া যায়। আর যখন জিকির থেকে গাফেল হয় তখন অছওয়াছা দেয়।

*মেসকাত শরিফ, ১৯৯ পৃ:;
*সহি বুখারী শরিফ;

*মেরকাত, ৫ম খন্ড, ১৬৩ পৃ:;
*ইবনে আবী শায়বাহ,
*বায়হাক্বী ও আবী ইয়ালা শাব্দিক ব্যবধানে।
*ইবনে আবীদ্ব দুনিয়া, আনাছ (রাঃ) হতে;
*কানজুল উম্মাল, ১ম খন্ড, ২১৪ পৃ:;

قال رسول الله (ص) ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر

*অর্থঃ হজরত রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) বলেছেন: নিশ্চয় রব তাবারুকু তা'লা প্রতি রাতের শেষ ভাগে পৃথিবীর নিকটতম আসমানে অবতরণ করেন।
*কানজুল উম্মাল, ২য় খন্ড, ৪৬ পৃ: এরুপ কয়েকটি হাদিস উল্লেখ রয়েছে হজরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে।
*তিরমিজি শরিফ, ১ম জি: ১০২ পৃ:;
*শিফা শরিফ, ১ম জি: ২৪৩ পৃ:;

قال رسول الله (ص) ما صب الله شيا فى صدرى الا صببته فى صدر ابى بكر

*অর্থঃ হজরত রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) বলেছেন: আল্লাহ আমার ছিনায় যা বাতেনী এলেম দান করেছেন আমি তা আবু বকরের ছিনায় রেখে গেলাম।
*আল হাদীকাতুন নাদীয়া ফি ত্বারিকাতিল নক্সবান্দিয়া কিতাবে হাদিসটি উল্লেখ আছে।
*নূর নবী, পৃ: ১২২;

عن جرير بن عبد الله قال قال رسول الله (ص) انكم ستروں ربكم عيانا و فى رواية قال كنا جلوسا عند رسول الله (ص) فنظر الى القمر ليلة البدر فقال انكم ستروں ربكم كما تروں هذا القمر...

*অর্থঃ হজরত জরীর ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) বলেছেন: অচিরেই তোমরা তোমাদের রবকে স্বচক্ষে দেখতে পাবে। অপর রেওয়াতে আছে, জরীর (রাঃ) বলেন: আমরা রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) এর সাথে বসা ছিলাম, তিনি পূর্ণিমার চাঁদের দিকে তাকিয়ে বললেন: তোমরা অচিরেই তোমাদের প্রভূকে দেখতে পাবে যেমন এই চাঁদকে দেখছ।
*মেসকাত শরিফ, ৫০০ পৃ:;
*মেরকাত, ১০ম খন্ড, ৩২০ পৃ:;
*সহি বুখারী শরিফ, হা: নং ৭৪৩৫;
*সহি মুসলীম শরিফ, ১ম জি: ৯৯-১০২ পৃ:;

*তিরমিজি শরিফ, ২৫৫১ নং হা:;
*আবু দাউদ, হা: নং ৪৭২৯;
*দারেমী শরিফ, ২য় খন্ড, ৪১৯ পৃ:;
*মুসনাদে আহমদ, ১৬/৩;
*ছেররুল আছরার, [কৃত: গাউছে পাক আব্দুল কাদের জিলানী (রাঃ)] ৫৭ পৃ:;

عن ابى ذر قال سالت رسول الله (ص) هل رايت ربك قال نور انى أراه

*অর্থঃ হজরত আবু জর (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) কে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কি আপনার রবকে দেখেছেন? তিনি বললেন: তিনি নুর আমি তাঁকে দেখেছি।
*মেসকাত শরিফ, ৫০০ পৃ:;
*মেরকাত, ১০ম খন্ড, ৩২৫ পৃ:;
*সহি মুসলীম, ১ম জি: ৯৮ পৃ: কিতাবুল ঈমান;
*তিরমিজি, হা: নং ৩২৮২;
*তাফছিরে মায়ালেমুত তানজিল, ৫ম খন্ড, ১৫২ পৃ:;
*তাফছিরে খাজেন শরিফ, ৪র্থ খন্ড, ২০৫ পৃ:;
*তাফছিরে ইবনে কাছির, ৪র্থ খন্ড, ২৯৬ পৃ:;
*তাফছিরে রুহুল বয়ান, ৯ম খন্ড, ২৫০ পৃ:;
*তাবারানী আওছাতে, ৬ষ্ঠ খন্ড, ১৪৩ পৃ:;

عن الشعبى قال لقى ابن عباس كعبا بعرفة فساله عن شئ فكبر حتى جاوبته الجبال فقال ابن عباس انا بنوها هاشم فقال كعب ان الله تعالى قسم رويته وكلامه بين محمد و موسى فكلم موسى مرتين وراه محمد مرتين

*অর্থঃ হজরত শাবী (রঃ) বলেন, ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর সাথে আরাফার মাঠে হজরত কা'ব আহবারের দেখা হলে তিনি এ ব্যাপারে (নবীজি আল্লাহকে দেখেছেন কি-না) জিজ্ঞাসা করলেন, ইহা শুনে হজরত কা'ব (রাঃ) এমন জোরে 'আল্লাহু আকবার' তাকবীর দিলেন ফলে আওয়াজ প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। তখন ইবনে আব্বাস (রাঃ) বললেন: আমরা বনী হাশিমের বংশধর। হজরত কা'ব (রাঃ) বললেন: আল্লাহ তাঁর দর্শন ও কথাকে হজরত মুহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) ও মুসা (আঃ) এর মাঝে বিভক্ত করেছেন। হজরত মুসা (আঃ) এর সাথে আল্লাহ দু'বার কথা বলেছেন, আর মুহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) এর সাথে দু'বার দেখা দিয়েছেন।

*মেসকাত শরিফ, ৫০১ পৃ:;
*মেরকাত, ১০ম খন্ড, ৩৩০ পৃ:;
*সহি বুখারী শরিফ, হা: নং ৪৭২;

*তিরমিজি শরিফ, ২য় জি: ১৬৩ পৃ:;
*তাফছিরে খাজেন শরিফ, ৪র্থ খন্ড, ২০৫ পৃ:

হজরত জাবের (রাঃ) বলেন যে, রাসূলে করিম (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) 'অলাক্বাদরায়াহু নাজলাতান উখরা' এর ব্যাখ্যা প্রশঙ্গে এরশাদ করেন, "আমি আমার প্রভূকে একেবারে ও সামনা-সামনি দেখেছি, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই এবং 'ইন্দা ছিদরাতুল মুন্তাহার' এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, আমি তাঁকে ছিদরাতুল মোন্তাহার নিকটে দেখেছি। এমনকি প্রভূর চেহারার নুর আমার সামনে বিচ্ছুরিত হয়েছে।

*গুনিয়াতুত্তালেবীন, [কৃত: গাউছে পাক আব্দুল কাদের জিলানী (রাঃ] ১ম জি: ৬৫ পৃ:;

عن ابی هريرة قال قال رسول الله (ص) ان الله يقول: من عادى لى وليا فقد اذانى وما تقرب الي عبدى بشئ احب الي مما افترضت عليه وما يزال يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه الذى يسمع به وبصره الذى يبصر به ويده التى يبطش بها ورجله التى يمشي بها فان سالنى عبدى اعطيته

*অর্থঃ হজরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, নিশ্চয় আল্লাহ বলেন: যারা আমার ওলীদের সাথে দুশমনী করবে তারা যেন আমাকে কষ্ট দেয়। বান্দার প্রতি আমি যা ফরজ করে দিয়েছি তা দ্বারা আমার নিকটবর্তী হতে পারবেনা, বরং নফল বন্দেগী দ্বারাই আমার নিকটবর্তী হতে পারবে অতঃপর আমি তাকে ভালবাসতে থাকি। আর যখন আমি তাকে ভালবাসি তখন আমি তার কান হয়ে যায়, যা দ্বারা সে শুনে, আমি তার চোঁখ হয়ে যায়, যা দ্বারা সে দেখে, আমি তার হাঁত হয়ে যায়, যা দ্বারা সে ধরে, আমি তার পাঁ হয়ে যায় যা দ্বারা সে চলে। আর যখনই সে আমার কাছে কিছু চায় তখন আমি তাঁকে তা দিয়ে দেই।
*সহি ইবনে হিব্বান শরিফ, ১ম জি: ২১০ পৃ:;
*সহি বুখারী শরিফ, ২য় জি: ৯৬৩ পৃ:
*তাফছিরে রুহুল বয়ান, ২য় খন্ড, ৪৪৯ পৃ:;
*তাফছিরে কবির শরিফ,
*ইবনে মাজাহ, ২৯৬ পৃ: (আংশিক);
*তাফছিরে রুহুল মায়ানী, ১১ তম খন্ড, ১৯২ পৃ:;

عن ابی هريرة قال قال رسول الله (ص) كل عمل ابن ادم يضاعف الحسنة بعشر امثالها الى سبعمائة ضعف قال الله تعالى الا الصوم فانه لى وانا اجزى به
*অর্থঃ হজরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) বলেছেন: মানব সন্তানের নেক আমল বাড়ানো হয়ে থাকে; প্রত্যেক নেক আমল বাড়ানো হয়ে থাকে ১০ গুন থেকে ৭০০ গুন পর্যন্ত। আল্লাহ তা'লা বলেন: রোজা ব্যতিত। কেননা রোজা আমার জন্য আর আমিই ইহার প্রতিদান দেব।
*মেসকাত শরিফ, ১৭৩ পৃ:;
*মেরকাত, ৪র্থ খন্ড, ৩৮৯ পৃ:;
*সহি বুখারী শরিফ, ১ম জি: ২৫৪ পৃ:, হা: নং ১৯০৪;
*সহি মুসলীম, ৮৭/২;
*তিরমিজি তাঁর সুনানে, হা: নং ৭১৪;
*সুনানে নাসাঈ শরিফ, হা: নং ২২১৫;
*ইবনে মাজাহ শরিফ, হা: নং ১৬৩৮;
*দারেমী শরিফ, ২য় খন্ড, ৪০ পৃ:;
*মুসনাদে আহমদ, ২৬৬/২;
*ছেররুল আছরার, ১২৬ পৃ:;

عن سهل بن سعد قال قال رسول الله (ص) فى الجنة ثمانية ابواب منها باب يسمى الريان لا يدخله الا الصائمون
*অর্থঃ হজরত ছাহল ইবনে সাদ (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) বলেছেন: জান্নাতে ৮টি দরজা রয়েছে। তন্মোধ্যে একটি দরজার নাম 'রাইয়্যান'। রোজাদার ব্যতিত ঐ দরজা দিয়ে আর কেহই প্রবেশ করতে পারবেন না।
*মেসকাত শরিফ, ১৭৩ পৃ:;
*মেরকাত, ৪র্থ খন্ড, ৩৮৭ পৃ:;
*সহি বুখারী শরিফ, ১ম জি: ২৫৪ পৃ:, হা: নং ৩২৫৭;
*সহি মুসলীম, ১ম জি: ৩৬৪ পৃ:;
*ইবনে মাজাহ, হা: নং ১৬৪০;

عن ابن عباس قال حين صام رسول الله (ص) عاشوراء وامر بصيامه قالوا يا رسول الله (ص) انه يوم يعظمه اليهود والنصارى فقال رسول الله (ص) لئن بقيت الى قابل لاصومن التاسع
*অর্থঃ হজরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) আশুরার রোজা রাখলেন ও রোজা রাখার জন্য নির্দেশ দিতেন।

সাহাবীগণ বললেন ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই দিনকে'ত ইহুদী ও নাছারারা সম্মান করে! তখন রাসূল (ছালালাহু আলায়হি ওয়া ছালাম) বললেন: যদি আমি আগামী বছর পর্যন্ত বেচে থাকি নিশ্চয় আমি নবম তারিখেও রোজা রাখব।
*মেসকাত শরিফ, ১৭৮ পৃ::
*সহি মুসলীম শরিফ, ৭৯৮/২;
*মেরকাত, ৪র্থ খন্ড, ৪৬৯ পৃ::
*আবু দাউদ, হা: নং ২৪৪৫;
*তিরমিজি, ১ম জি: ১৫৮ পৃ::

فقال رسول الله (ص) فنحن احق واولى بموسى منكم فصامه رسول الله (ص) وامر بصيامه
*অর্থঃ অতঃপর রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) বলেছেন: আমরা তোমাদের তুলনায় হজরত মূসার অধিকতর আপন ও অধিকতর হক্বদার। অতঃপর রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) আশুরাতে রোজা রাখলেন ও রোজা রাখতে নির্দেশ দিলেন।
*মেসকাত, ১৮০ পৃ::
*সহি বোখারী শরিফ, হা: নং ২০০৪;
*সহি মুসলীম শরিফ, ৭৯৫/২;
*মেরকাত, ৪র্থ খন্ড, ৪৯২ পৃ::
*আবু দাউদ, হা: নং ২৪৪৪;
*ইবনে মাজাহ, হা: নং ১৭৩৪;
*মুসনাদে আহমদ, ৩৫৯/২;
*দারেমী শরিফ, ২য় খন্ড, ৩৬ পৃ::

عن علي قال قال رسول الله (ص) اذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها فان الله تعالى ينزل فيها لغروب الشمس الى السماء الدنيا فيقول الا من مستغفر فاغفرله الا مسترزق فارزقه الا مبتلى فاعافيه الا كذا الا كذا حتى يطلع الفجر
*অর্থঃ হজরত আলী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) বলেছেন: যখন অর্ধ শাবান আসবে ইহার রাত্রে তোমরা নামাজ পড়বে ও দিনে রোজা রাখবে। কেননা এ রাতে আল্লাহ তা'লা পৃথিবীর নিকটতম আসমানে অবতীর্ণ হন এবং বলতে থাকেন: কোন ক্ষমা প্রার্থনাকারী আছ কি যাকে আমি ক্ষমা করে দিব। কোন রিজিক প্রার্থনাকারী আছ কি যাকে আমি ক্ষমা করে দিব। কোন বিপদগ্রস্থ লোক আছ কি যাকে আমি সাহায্য করব। এভাবে আরোও আরোও ডাকতে থাকেন যাবৎ না ফজর হয়।
*মেসকাত শরিফ, ১১৫ পৃ::

*ইবনে মাজাহ, ৯৯ পৃ::
*শুয়াইবুল ঈমান, ৩য় খন্ড, ১৪০২ পৃ::
*মাদারে যুন্নবুয়াত, ১ম খন্ড;
*মেরকাত, ৩য় খন্ড, ৩৪৯ পৃ::
*তাফছিরে কুরতবী, ১৬ তম খন্ড, ১০১ পৃ::
*তাফছিরে রুহুল মায়ানী, ২৫ তম জি: ১৪৯ পৃ::
#এই হাদিস আল্লামা শায়খ আব্দুল হক্ব মোহাদ্দেছ দেহলবী (রঃ) সহি হাদিস বলে দাবি করেছেন।

عن عائشة قالت قال رسول الله (ص) تحروا ليلة القدر فى الوتر من العشر الاواخر من رمضان

*অর্থঃ হজরাত আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) বলেছেন: তোমরা শবে কদর তালাশ করবে রমজানের শেষ দশকের বেজোর রাত্রে।
*মেসকাত শরিফ, ১৮১ পৃ::
*সহি বুখারী শরিফ, হা: নং ২০১৭;
*মেরকাত, ৪র্থ খন্ড, ৫০৮ পৃ::
*সহি মুসলীম, ৮২৮/২;
*আবু দাউদ, হা: নং ১৩৮৫;
*তিরমিজি, ১ম জি: ১৬৪ পৃ::
*মুয়াত্তায়ে মালেক, হা: নং ১০;
*মুসনাদে আহমদ, ১৭/২;

قال رسول الله (ص) كنت نبيا وادم بين الماء والطين
*অর্থঃ রাসূলে পাক (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) বলেছেন: আমি তখনও নবী ছিলাম যখন আদম (আঃ) মাটি ও পানিতে ছিল।
*মাওয়াহেবুল্লাদুন্নিয়া, ১ম খন্ড, ৫৬ পৃ::
*তাফছিরে রুহুল বয়ান, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৪৬৫ পৃ::
*মেরকাত শরহে মেসকাত, ১০ম খন্ড, ৪৩৯ পৃ::
#হাদিসটি সনদগত ভাবে দুর্বল হলেও সহি হাদিসের সাথে মিল রয়েছে।

عن ابى ذر قال سمعت النبى (ص) يقول الا ان مثل اهل بيتى فيكم مثل سفينة نوح من قومه من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق
*অর্থঃ হজরত আবু যর (রাঃ) বলেন, আমি নবী (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) কে বলতে শুনেছি: তোমাদের মাঝে আমার আহলে বাইতের মেছাল

হন নূহ নবীর তরীর মত, যে ইহাতে আরোহন করবে সে নাজাত পাবে আর যে আরোহন করবে না সে ধংশ হবে।
*মুস্তাদরাকে হাকেম, ৫ম খন্ড, ১৭৭৩ পৃ:;
*তাফছিরে রুহুল মায়ানী, ২৫ তম জি: ৪৪ পৃ:;
*তাবারানী তাঁর 'আওছাত' গ্রন্থে ২য় খন্ড, ৩৩৯ পৃ:;
*তাফছিরে কবির শরিফ, ২৭ তম জি: ১৪৮ পৃ:;
*তাবারানী তাঁর কবিরে, ২৬৩৭/৩;
*নশরুত্তিব, কৃত: মাওলানা আশরাফ আলী থানভী সাহেব;

عن ابى هريرة قال قال رسول الله (ص) ....ثم كنومة العروس الذى لا يوقظه الا احب اهله اليه
*অর্থঃ হজরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) বলেছেন:....... (ফেরেস্তারা বলবে) ঘুমাও যেভাবে আশেক ও মাশুক ঘুমায়, যা তার প্রিয়জন লোক ব্যতিত ঘুম ভাঙ্গাইতে পারেনা।
*মেসকাত শরিফ, ২৪ পৃ:;
* তিরমিজি শরিফ, ১ম জি: ২০৪ পৃ:;
*তাফছিরে রুহুল মায়ানী, ২য় জি: ৫৭৬ পৃ:;
*মেরকাত, ১ম খন্ড, ৩২১ পৃ:;
*আশিয়াতুল লুময়াত;

دعا النبى (ص) عليا وحسنا و حسينا و فاطمة وقال اللهم هؤلاء اهلي
*অর্থঃ রাসূলে পাক (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) হজরত আলী, ঈমাম হাছান, ঈমাম হোছাইন, ও মা ফাতেমা (রাঃ) কে ডাকলেন; অতঃপর বললেন: হে আমার আল্লাহ! এরাই আমার আহলে বাইত।
*শিফা শরিফ, ২য় জি: ৪০৭ পৃ:;
*মুসনাদে আহমদ, ১৮৫/১;
*বায়হাক্বী তাঁর সুনানে কুবরায়, ৬৩/৭;
*দূর্রে মানছুর, ৩৯/২;
*কানজুল উম্মাল, ১৩ তম খন্ড, ৭১ পৃ:;
*আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া, ৮ম খন্ড, ৭৭ পৃ:;

عن ابن عباس قال قيل يا رسول الله من اولياء الله؟ قال الذين اذا رؤا ذكر الله تعالى
*অর্থঃ হজরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) কে জিজ্ঞাসা করা হল ইয়া রাসূলাল্লাহ! আউলিয়া কারা? নবীজি বললেন: যাকে দেখলে আল্লাহর কথা স্বরণ হয়।

*তাফছিরে রুহুল মায়ানী, ১১ তম খন্ড, ১৯৪ পৃ:;
*নাসাঈ তাঁর সুনানে, ৩৬২/২;
*ঈমাম হাকেম তিরমিজি তাঁর "নাওয়াদেরুল উছুল" কিতাবে, ৩৯/২;
*হায়ছামী তাঁর 'মজমুয়ায়ে';
*তাফছিরে ইবনে কাছির, ২য় খন্ড, ৫২৪ পৃ:;
*তাফছিরে রুহুল বয়ান, ৪র্থ খন্ড, ৭৬ পৃ:;
*তাফছিরে খাজেন শরিফ, ২য় খন্ড, ৪৫০ পৃ:;
*তাফছিরে আবু ছাউদ, ৩য় খন্ড, ৫১৭ পৃ:;
*তাবারানী তাঁর কবিরে, ১৩/১২;
*ইবনে আবীদ্ব দুনিয়া তাঁর 'আউলিয়া' গ্রন্থে হা: নং ১৬;
*মুসনাদে আহমদ, ৪৫৯/৬;
*তাফছিরে মায়ালেমুত তানজিল, ৩য় খন্ড, ৯৯ পৃ:;
*আবু নুয়াইম তাঁর 'হুলিয়া' গ্রন্থে ২৩১/৭;
*তাফছিরে তাবারী শরিফ, ১১ তম খন্ড, ১৪৫ পৃ:;
*কানজুল উমামাল, ১ম খন্ড, ২১৪ পৃ:;

عن سلمة ابى هريرة قال قال رسول الله (ص) يقول الله تعالى الكبرياء ردائى والعظمة ازارى فمن نازعنى واحد منهما ادخلته النار وفى رواية قذفته فى النار
*অর্থঃ হজরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) বলেছেন: আল্লাহ তা'লা বলেন: অহংকার আমার চাদর এবং শ্রেষ্টত্ব আমার ইযার। সুতরাং যে ইহার যে কোন একটি নিয়ে টানটানি করবে, আমি তাকে জাহান্নামে ঢুকাব। অপর এক বর্ণনায় আছে: আমি তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব।
*মেসকাত শরিফ, ৪৩৩ পৃ:;
*সহি মুসলীম শরিফ;
*মেরকাত, ৯ম খন্ড, ২৯৭ পৃ:;
*ইবনে মাজাহ, হা: নং ৪১৭৪;
*মুসনাদে আহমদ, ৪১৪/২;
*মুকাশাফাতুল কুলুব, ১ম খন্ড, কৃত: ঈমাম গাজ্জালী (রঃ)।

عن انس قال (لما عرج بى جبريل الى سدرة المنتهى ودنا رب العزة جل جلاله فتدلى حتى كان منه قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى

*অর্থঃ হজরত আনাছ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলে পাক (ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) বলেছেন: যখন জিব্রাইল (আঃ) আমাকে মেরাজে ছিদরাতুল

মুন্তাহায় নিয়ে যায় তখন মহান প্রতিপালক আল্লাহ্ আমার নিকটে আসেন এবং মাত্র দুই ধনুকের ব্যবধান ছিল। অতঃপর যা ওহী করার ওহী করলেন।
*সহি বুখারী শরিফ;
*মাওয়াহেবুল্লাদুন্নিয়া, ৩য় খন্ড, ৮৮ পৃঃ;

عن جابر بن عبد الله الانصاري قال قلت يا رسول الله بابي انت وامى اخبرنى عن اول شئ خلقه الله تعالى قبل الاشياء قال يا جابر ان الله تعالى قد خلق قبل الاشياء نور نبيك من نوره فجعل ذلك النور يدور بالقدرة

*অর্থঃ হজরত জাবের আল আনছারী (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে পাক (ছাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) কে জিজ্ঞাসা করলাম আমার পিতা-মাতা আপনার কদমে কুরবানী ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে সংবাদ দিন আল্লাহ সব কিছু পূর্বে কি সৃষ্টি করেছেন? নবীজি বললেনঃ হে জাবের! নিশ্চয় আল্লাহ সব কিছুর পূর্বে তাঁর নুর থেকে তোমার নবীর নুর সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর সেই নুর আল্লাহর কুদরতে পরিক্রমন করতে থাকল......।
*মুছান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক, ১ম খন্ড, ৯১ পৃঃ পুরাতন ছাপা;;
*মাওয়াহেবুল্লাদুন্নিয়া, ১ম খন্ড, ৭১ পৃঃ;
*নশরুত্তিব, ৫ পৃঃ;
*ছিরতে হলভিয়া, ৯ পৃঃ;
*তাফছিরে রুহুল মায়ানী, ১ম জিঃ ৯০ পৃঃ;

اول ما خلق الله روحى

*অর্থঃ রাসূলে পাক (ছাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) বলেনঃ আল্লাহ সর্ব প্রথম আমার রুহ সৃষ্টি করেছেন।
*তাফছিরে রুহুল বয়ান, ৫ম খন্ড, ২২৬ পৃঃ;
*ছেররুল আছরার, ৪৮ পৃঃ;

قال الله تعالى خلقت محمدا من نور وجهى

*অর্থঃ মহান আল্লাহ তা'লা বলেনঃ আমি মুহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) কে আমার চেহারার নুর থেকে সৃষ্টি করেছি।
*ছেররুল আছরার, [কৃতঃ হজুর গাউছে পাক আব্দুল কাদের জিলানী (রাঃ)] ৪৮ পৃঃ;
*হাদিসটি মোতাশাব্বিহাতের অন্তর্ভূক্ত।

عن ابن مسعود عن النبى (ص) انه قال لا يدخل الجنة من كان فى قلبه حبة من كبر

*অর্থঃ হজরত ইবনে মাছউদ (রাঃ) নবী করিম (ছাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) হতে বর্ণনা করেন, যার অন্তরে বিন্দু পরিমান অহংকার আছে সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।
*মুস্তাদরাকে হাকেম, ১ম খন্ড, ৩৪ পৃঃ;
*তাফছিরে দূর্রে মানছুর, ৭৯/৩;
*সহি মুসলীম কিতাবুল ঈমানে,
*মেসকাত শরিফ, ৪৩৩ পৃঃ;
*মেরকাত, ৯ম খন্ড, ২৯৪ পৃঃ;
*আবু দাউদ, হাঃ নং ৪০৯১;
*তিরমিজি শরিফ, হাঃ নং ১৯৯৮;
*ইবনে মাজাহ, হাঃ নং ৪১৭৩;
*মুসনাদে আহমদ, ৪১২/১;
*মুকাশাফাতুল কুলুব, ১ম খন্ড;

قال صلى الله عليه وسلم كنت اول الانبياء فى الخلق واخرهم فى البعث

*অর্থঃ প্রিয় নবীজি (ছাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) বলেন, সৃষ্টি জগতে আমি প্রথম নবী প্রেরিত হয়েছি সবার শেষে।
*শিফা শরিফ, ১ম খন্ড, ২৬৬ পৃঃ;
*এরুপ আরেকটি হাদিস রয়েছে।
*মেরকাত শরহে মেসকাত, ১০ম খন্ড, ৪৩৯ পৃঃ;
*আবু নুয়াইম তাঁর দালায়েলে;
*তাফছিরে রুহুল বয়ান, ৯ম খন্ড, ৬৩ পৃঃ;

قال رسول الله (ص) موتوا قبل ان تموتوا

*অর্থঃ রাসূলে পাক (ছাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়া ছাল্লাম) তোমরা মৃত্যুর পূর্বেই মর।
*এই হাদিস খানা দেওবন্দের সর্ব প্রথম শায়খুল হাদিস, মাওলানা আশরাফ আলী থানভী সাহেবের পীর আল্লামা হাজী এমদাদুল্লাহ মোহাজেরে মক্কী (রঃ) এর "ফিয়াউল কুলুব" কিতাবের ১৫ পৃঃ রয়েছে।

*তথ্য সূত্রঃ

*পবিত্র কুরআনুল কারিম।
*সহি বুখারী শরিফ (ছাপা: দারুল হাদিস ঢাকা)।
*সহি মুসলীম শরিফ (ছাপা: আশরাফি বুক ডিপুট দেওবন্দ)।
*সহি তিরমিজি শরিফ।
*সুনানে নাসাঈ শরিফ।
*ইবনে মাজাহ শরিফ।
*আবু দাউদ শরিফ।
*মেসকাত শরিফ।
*মুসনাদে আহমদ (দারুল হাদিস কায়রু)।
*মুয়াত্তায়ে ঈমাম মালেক (আশরাফি বুক ডিপু দেওবন্দ)।
*মুসনাদে ঈমামে আজম।
*মুসনাদে শাশী।
*মুসনাদে আব্দুল্লা ইবনে মুবারক।
*মুসনাদে সাঈদ ইবনে মানছুর।
*জামেউছ ছাগীর।
*কিতাবুল আযকার।
*মাসাবিহুছ সুন্নাহ।
*মুসনাদে শিহাব।
*কাশফুল খফা।
*মুসনাদে আবু দাউদ ত্বয়ালুছী।
*মুসনাদে শাফেয়ী (আশরাফি বুক ডিপু)।
*মুস্তাদরাকে হাকেম (মাকতাবাতুল নাজারু মুস্তফাল বায়ান, মক্কা)।
*সুনানে দারেমী শরিফ (লিদারিল কিতাবুল আরাবী, বৈরুত)।
*সহি ইবনে খুজাইমা (দারুল উছমানিয়া)।
*শিফা শরিফ (দারুল ফিকর, বৈরুত)।
*মুছান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক (দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত)।
*সহি ইবনে হিব্বান (দারুল মারেফা, বৈরুত)।
*মুসনাদে আয়েশা (রাঃ) {দারুল মারেফা, বৈরুত}।

*মুসনাদে সাদ ইবনে আবী ওয়াক্কাছ (রা)।
*মুসনাদে উমর (রাঃ)।
*সুনানে দারে কুতনী শরিফ (আল রিছালাহ পাবলিছার্চ)।
*মুজামুল কবির, (দারুল কুতুবুল ইলমিয়া)।
*জামেউল মাছানেদেউ ওয়াছ ছুনান (দারুল কুতুবুল ইলমিয়া)।
*দালায়েলুন্নবুয়াত (দারুল হাদিস, কায়রু)।
*মুসনাদে আবু আওয়ানা, দারুল মারেফা।
*মাওয়াহেবুল্লাদুন্নিয়া, কুতুবুল ইলমিয়া।
*কিতাবুল আছার, দারুল হাদিস।
*দায়লামী শরিফ।
*মুজামুল ছাগীর, মু'চ্ছাছিয়াতুল কুতুবুল ছাকাফিয়া।
*আল আদাবুল মুফরাদ।
*শুয়াইবুল ঈমান, দারুল ফিকর।
*কানজুল উম্মাল, ইদারাহু তালিফাতি আশরাফিয়াহ।
*মুছান্নাফে ইবনে আবী শায়বাহ, দারুল ফিকর।
*মুজামুল আওছাত, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া।
*মুসনাদে আবী ইয়ালা, দারুল মারেফা।
*সুনানে কুবরা, দারুল হাদিস।
*তাহাবী শরিফ, ই: ফা: বাংলাদেশ।
*আত্তারগীব ওয়াত্তারহীব।
*মাদারেজুন্নয়াত।
*খাছাইছুল কুবরা, বা: তাজ, কোং।
*গুনিয়াতুত্তালেবীন, ঐ।
*আল বেদায়া ওয়ান্নেহায়া, বা: ই: ফা:।
*তারিখে ইবনে আছাকির।
*তারিখুল কাবির।
*এহওয়াউল উলুমুদ্দিন।
*মুকাশাফাতুল কুলুব।
*দাকায়েকুল আখবার।
*ছিররুল আছরার।
*দালায়েলুল খায়রাত।
*দ্বিয়াউল কূলুব।
*তাম্বেহুল গাফেলীন।
*নশরুত্তিব।
*শুকরুন্নিমা।
*মাজালিছে হাকিমুল উম্মাত।

*যখিরায়ে কেরামত।
*মওজুয়াতুল কাবির।
*তাফছিরে তাবারী শরিফ, মাকতাবাতুল তাওফিকিয়াহ্
*তাফছিরে মাজহারী, জাকারিয়া বুক ডিপু।
*তাফছিরে ছাবী, দারুল গাদ্দিল জাদিদ।
*তাফছিরে মায়ালেমু তানজিল, দারুল ফিকর।
*তাফছিরে বাহারে মুহিত।
*তাফছিরে ফাতহুল কাদির।
*তাফছিরে খাজেন, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া।
*তাফছিরে রুহুল বয়ান, দারুল ফিকর।
*তাফছিরেরুহুল মায়ানী, দারুল হাদিস।
*তাফছিরে আবু ছাউদ, দারুল ফিকর।
*তাফছিরে কুরতবী, মাকতাবাতুল তাওফিকিয়াহ
*তাফছিরে কবীর, ঐ।
*তাফছিরে মারেফুল কোরআন, ই: ফা:।
*তাফছিরে ইবনে কাছির, দারুল হাদিস।
*তাফছিরে ইবনে আব্বাস।
*তাফছিরে খাজাইনুল ইরফান।
*তাফছিরাতে আছরারুল কোরআন।
*তাফছিরে জালালাইন।
*তাফছিরে আহমদিয়া।
*তাফছিরে বায়দ্বাবি।
*তাফছিরে দূর্রে মানছুর, মাকতাবাতুর রিহাব।
*উমদাদুল ক্বারী শরহে বুখারী।
*ফাতহুল বারী।
*ফায়জুল বারী।
*এরশাদুস শারী।
*মেরকাত শরহে মেসকাত।
*আশিয়াতুল লুমআত।
*মেরআতুল মানাজিহ।
*ফাতুয়ায়ে শামী।
*ফাতুয়ায়ে বাহরুর রায়েক।
*হেদায়া।
*ফাতহুল কাদির।
*দূর্রুল মুখতার।
*মালাবুদ্দামিনহু।

*কিতাবুল ফেকহ্ আলা মাজহাবিল আরবা।
*কিতাবুল বাদাউছ ছানায়ে।
*এমদাদুল ফাতুয়া।
*ফাতুয়ায়ে রশিদিয়া।
*ফাতুয়ায়ে কাজী খান।
*ফাতুয়ায়ে রেজবিয়া।
*ফাতুয়ায়ে আলমগীরি।
*বাহারে শরিয়াত।
*ফাতুয়ায়ে মমতাজিয়া।
*শরহে বেকায়া।
*শরহে ফেক্হে আকবর।
*মুখতাছারুল কুদুরী ও শাশী।
*ফাতুয়ায়ে ছিদ্দিকীয়া।
*এলাউছ ছুনান।
*ফাতুয়ায়ে আফ্রিকা।
*জায়াল হক্ব।
*ফায়ছালায়ে হাফতে মাছায়েল।
*ইরফারে শরিয়াত।
*আনওয়ারুছ ছালেক্বিন।
*বারাহিনে ক্বাতিয়া কৃত: কেরামত আলী জৈনপুরী (রঃ)।
*মেরাজুল আশেক্বীন।
*ফাতুয়ায়ে ছালাছিন।
*তাজকেরাতুল আউলিয়া।
*তাজকেরাতুল আম্বিয়া।
*তাছাউফ তত্ত্ব।
*ফাতুয়ায়ে দারুছ ছুন্নাত।
*আল মুলাখ্খাছ।
*শিফাউছ ছিকাম।
*মজমুয়ায়ে জাওয়াহেদ।
*আল হাবী লিল ফাতুয়া।
*মাকতুবাত শরিফ
*মছনভী শরিফ।
*শরহে আকায়েদে নাছাফি।